আদিবাসী বিদ্রোহ

ওয়ারলি কৃষকদের সংগ্রামের কাহিনী

গোদাবরী পারুলেকর

অনুবাদক : প্রভাকর ফদিকার



ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

ইংরাজী সংস্করণ **Adivasis Revolt**-এর বঙ্গানুবাদ

সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন, ১৯৮১

তৃতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৮৩

প্রকাশক

সুনীল বসু

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

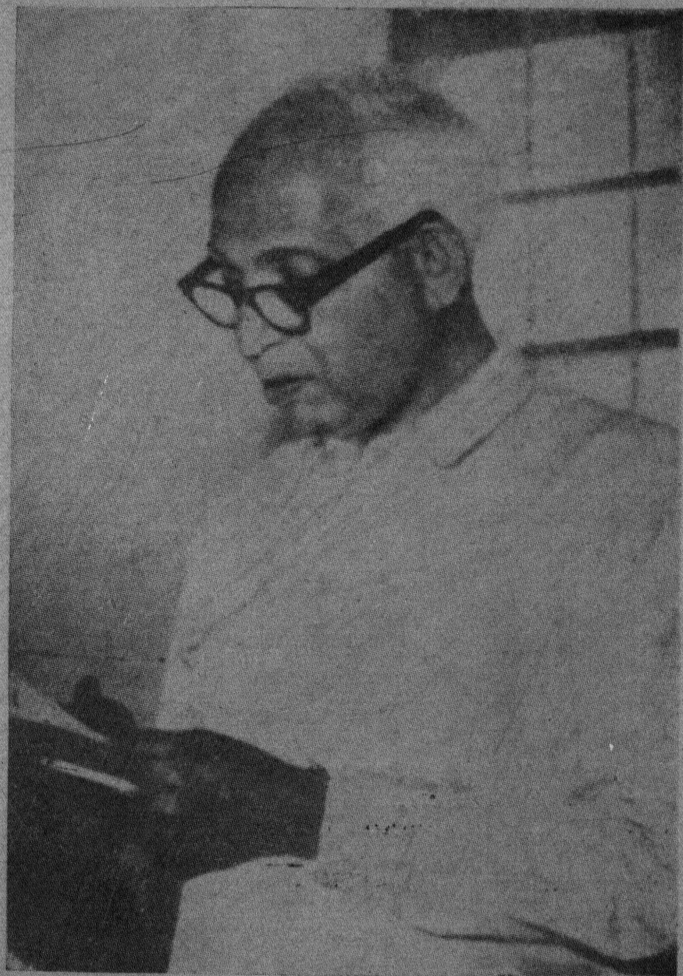
বিজেতা অফসেট প্রিন্টার্স

৩৫৪৫ জাটওয়ারা, দরিয়াগঞ্জ

নিউ দিল্লী-১১০ ০০২

প্রচ্ছদ :

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



শামরাও পারুলেকর

আমার স্বামী

কমরেড শামরাও পারুলেকর-এর

স্মৃতির উদ্দেশে

সূচী

ইংরাজি সংস্করণের ভূমিকা

আমার প্রকাশক মিঃ এস. পি. ভগৎ* প্রস্তাব করেছিলেন তিনি চান যে আমার বইয়ের ভূমিকাটা আমিই লিখে দিই। অনেকবার শুরু করেছিলাম লিখতে। কিন্তু প্রতি বারই অশ্রুজলে ভারাক্রান্ত হয়ে কলম ছেড়ে দিয়েছি। আমার প্রিয় স্বামী প্রয়াত কমরেড শামরাও পারুলেকরের স্মৃতি মনকে আচ্ছন্ন করে দিত। বিষাদে আমার হৃদয় টনটন করত, চোখ বেয়ে নেমে আসত অশ্রু—এক অপরাধ-মনস্কতায় সে বেদনা আরও তীব্র হয়ে উঠত।

১৯৬২-এর নবেম্বরে, যখন আমরা দুজনেই জেলে অন্তরীণ ছিলাম, আদিবাসীদের মধ্যে আমার কাজ ও অভিজ্ঞতার উপর লেখার জন্য কমরেড শামরাও তাগিদ দিচ্ছিলেন। আমার লেখার ক্ষমতার উপর আমার একেবারেই কোন ভরসা ছিল না, কারণ, আমি কখনও কিছু লিখিনি শুধু এই জন্যেই নয়, সাধারণ জীবনেও কিছু লেখার ব্যাপারে আমি ছিলাম অত্যন্ত নিস্পৃহ। এত বড় একটা বিষয়ে লেখার কাজে উদ্যোগ নেবার সাহস আমি কোথা থেকে পাব? আমার মনে হত এ কাজ আমি কখনই করে উঠতে পারব না; এটা হবে নিছকই পণ্ডশ্রম তাই একটা না একটা অজুহাতে লেখার কাজটা ধামাচাপা দিতাম।

কমরেড শামরাও অবশ্য আমাকে দিয়ে লেখাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর কাছে হার মানলাম এবং ১৯৬৪-তে "অরণ্যপ্রান্তরে, পাহাড়ী উপত্যকার ওয়ারলি জীবন" ও "যেভাবে আমরা দিন কাটাতাম" এই শিরোনামায় দুটো অধ্যায় লিখে ফেললাম। এই দুটো অধ্যায় শামরাওয়ের খুব পছন্দ হল এবং সেটাই আমার উৎসাহিত হয়ে উঠা ও মানসিকভাবে তৃপ্ত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সেখানেই আমার লেখার ইতি পড়ল।

আমরা হাইকোর্টে "হেবিয়াস কর্পাস রিট"-এর জন্য আবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। শামরাও সবসময় নিজেই দরখাস্ত মুসাবিদা করতেন এবং স্বয়ং কোর্টে সওয়াল করতেন। এর জন্য তিনি গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়াশুনো চালিয়ে যেতেন। সবচাইতে কুশলী পেশাদার উকিলের চেয়েও ভালভাবে, যথেষ্ট দক্ষতা ও বাগ্মিতার সঙ্গে তিনি মামলার সওয়াল-জবাব করতেন। তাঁর আইন সম্পর্কীয় সওয়ালের নিপুণতা সুপ্রীম কোর্ট ও

* মারাঠি সংস্করণের প্রকাশক।

হাইকোর্ট—উভয় আদালতের বিচারকরা প্রায়শই প্রশংসা করতেন। তাঁর মামলার সাওয়াল-জবাবের জন্য আইনের বইগুলি অধ্যয়নে যখন তিনি ডুবে যেতেন তখন তাকে সাহায্য করতে হত আমাকে। আমাদের সামনে আরো অনেকদিন কারাভোগ রয়েছে এবং আমার লেখা পরে আবার শুরু করা যাবে—এই ভেবে মামলা শেষ হওয়া না পর্যন্ত ব্যাপারটা স্থগিত রাখতে মনস্থ করলাম।

কিছু দিন পরে যারবেদা জেলে যে ডাক্তার শামরাওকে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি জানালেন যে, শামরাও রক্তচাপ ও হৃদরোগে আক্রান্ত। এ কথা জানার পর আমার পক্ষে কোন কিছুতেই মনোনিয়োগ করা বা উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হলনা। তিনিও খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন; জেলের মধ্যেই আমি বইটা লেখার কাজ শেষ করি—তার মনে এরকম প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার মনের অবস্থা উপলব্ধি করে, লেখার জন্য আমাকে আর তিনি তাগিদ দেননি। যে দুটো অধ্যায় লেখা হয়েছিল তা আর ছোঁয়া হল না।

১৯৬৫ সালের নবেম্বরে প্যারোলে ছাড়া পাবার শেষাশেষি সময়ে যারবেদা কেন্দ্রীয় জেলে ফিরে আসার কালে শামরাওয়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলাম। আমি স্থির করলাম ঠিক যেমনটা আমার কাছে মনে হয়েছে, তেমনিভাবেই সব কিছু লিখে ফেলব, বিচারের ভার থাকুক ভবিষ্যতের উপর। ১৯৬৫-র নবেম্বর থেকে ১৯৬৬-র এপ্রিলের মধ্যে জেলে বসে যেটুকু সম্ভব তার সবটাই লিখে শেষ করে ফেললাম। এ ব্যাপারে তথ্যের জন্য বই-পত্রের প্রয়োজন ছিল, যেমন আদিবাসী সেবা মণ্ডলের রিপোর্ট, মিঃ সিমিংটনের লেখা বিবরণ, সংবাদপত্র ইত্যাদি; এ সবের কিছুই জেলের মধ্যে পাওয়া যায়নি, এই কাজটা বাকি রইল। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই আমি এই কাজে ব্রতী হলাম এবং ৩রা আগস্ট ১৯৬৬-র মধ্যে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেল। আমি খুব ভালোভাবেই কল্পনা করতে পারি এই বই সম্পূর্ণ হয়েছে দেখতে পেলে কমরেড শামরাও কতই না সুখী হতেন। এ কথা ভেবে বেদনায় চোখে জল আসে, ব্যথায় ভরে উঠে হৃদয়। সময় মতো এই কাজটা শেষ না করায় নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

এ ব্যাপারে আরও কিছু বলার আগে, আমি এখানে একটা বিষয় ব্যাখ্যা করতে চাই। অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষ ভেবে পান না কেন আমি সব কিছু ছেড়ে দহানুর আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার দায়িত্ব বেছে নিলাম। ১৯৪২ সালে আমরা জেল থেকে ছাড়া পাবার পর, কমরেড শামরাও ও আমি ঠিক করলাম, মহারাষ্ট্রের কৃষকরাই হবে আমাদের কাজের বিশেষ ক্ষেত্র। কৃষকদের সমস্যার ব্যাপারে কমরেড শামরাও সুগভীর পড়া-

শ্বনা করেছিলেন। তিনি খুব সঠিকভাবেই বিশ্বাস করতেন যে, কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত না করলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্ভব। এইভাবে থানা জেলায় কৃষকদের মধ্যে আমাদের কাজ শুরু হয়। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আমরা মহারাষ্ট্রের কৃষকদের মধ্যে কাজ করি। ঐ বছর জানুয়ারি মাসে তিতবালাতে মহারাষ্ট্র কৃষক সভার প্রথম সম্মেলন হয়। সম্মেলনের প্রচারের জন্য আমরা থানা জেলার সমস্ত তালুকে ঘোরার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রধানত ওয়ারলি আদিবাসী অধ্যুষিত দহানু ও তালাসরি তালুকে গেলাম সেই প্রচারকার্যের জন্য। তাদের দারিদ্র্য জর্জরিত অসহায় দাসত্বের জীবন দেখে ওয়ারলি জীবনের উন্নয়নের জন্য কাজ করার তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এইভাবেই আদিবাসীদের সঙ্গে আমার সংযোগ শুরু হয়।

সে সময়কালে এইসব গ্রামের জমিদারদের খাটলাস থাকতো। এই খাটলাসের মজুররা সকাল বেলায় ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কাজে বেরিয়ে যেত এবং দুপুর পর্যন্ত খেটে মরতো। তারপর একজন আদিবাসীকে একজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ধান দেওয়া হত। সেই ধান সে নিয়ে গিয়ে খোসা ছাড়াবার জন্য একটা কাঠের খলের মধ্যে কাঠের মুষল দিয়ে পিষত। খোসা ছাড়ানো সেই চাল রান্না করে একটু নুন দিয়ে খেত। জল গিলে তবে সেই খাবার গলা দিয়ে নামানো যেত, নির্দিষ্ট সময়ে আবার সে কাজে যেত এবং যতক্ষণ না তার কাজের সময় শেষ হয়, সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত খেটে মরতো। ঐ সামান্য পরিমাণ চালটুকুই ছিল তার মজুরি। প্রতি দিন এই ধরা-বাঁধা সময় খেটে যেতে হতো, পুজো-পার্বণ বা ছুটি ছাটার কোন বিশেষ সুবিধা সে পেত না, ঐ শব্দ দুটোই ছিল তার কাছে একেবারে অপরিচিত। তার অসুখ-বিসুখ করাও চলবে না। প্রত্যেক সকালে বোবা জন্তুর মতো তাকে গিয়ে কাজের জোয়ালে জুড়তে হবে এবং এক মুঠো ভাতের বদলে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হবে। রাত্রি নেমে এলে শুধু চোখ বুজে আচ্ছন্ন হয়ে যাবার ক্ষমতাটুকুই তার বাকি থাকতো। সকালে আবার তাকে ফিরে যেতে হত সেই পাথর-ভাঙা-কলে। এ জীবনে কোন আনন্দ নেই, নেই কোন বৈচিত্র্য, নেই কোন স্বাধীনতা, স্বাদ-আহ্লাদ; সেটা ছিল একটা ঠুলিপরা জীবন, গ্রাম ও জমিদার ছাড়া অন্য কিছু সে নজরও করতো না এবং তা ছাড়া কিছু সে জানতও না। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আদিবাসীরা এই জীবনই যাপন করে যেতব কসাইয়ের ছুরি ভেড়ার গলা কেটে ফেললে সে যেমন আর ভ্যাঃ ভ্যাঃ করে ডাকতে পারে না, তেমনি আদিবাসীরাও নিজেদের অস্তিত্বটুক রক্ষার কাজে এমনই জড়িয়ে থাকতো যে তাদের অন্য কিছু ভাবনা-চিন্তায় অবকাশ থাকত না। বস্তুত মনে হয় তাদের সব আবেগ যেন মরে

গেছে। এমন কি যদি তারা অনাহারে থাকে, বা খুন হয়ে যায়, বা তাদের ঘরের বউকে তাদের কাছ থেকে টেনেও নিয়ে চলে যায় তবু তারা সে সব ব্যাপারে মুখ বুজে থাকতো এবং শুধু বেঁচে থাকার খাতিরেই এ সব কিছু সহ্য করে যেত। আমরা যখন তাদের মধ্যে গেলাম তখন এই-ই ছিল অবস্থা। এ সত্ত্বেও, যে ক্ষোভ ও ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ তখনও তাদের জীবনের ছাই গাদায় ধিক ধিক করে জ্বলছিল, সেটাই পরে বিরাট বহ্নি হয়ে ফেটে পড়ল। এই অগ্নুৎপাত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে আমরা সাহায্য করেছিলাম। আদিবাসীদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বোধ জেগে উঠল। আমাদের সমর্থনে সে মানুষের মতো ভাবনা-চিন্তা করতে শুরু করল। সে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হল এবং এই সচেতনতা তাকে বীরের মতো উঠে দাঁড়াতে ও প্রতিরোধ করতে সাহস দিল। এই বইতে আমি একটা বোবা জীব থেকে তার মানুষে রূপান্তর ঘটার কাহিনী বিবৃত করতে চেষ্টা করেছি।

সাধারণভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের প্রতি এবং বিশেষভাবে আমাদের সম্পর্কে যে বিদ্বেষের ভাব আছে, তাতে করে এই বইকে ঘটনার ভ্রান্তি বা অতিশয়োক্তি হিসাবে ধরে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিলপত্র থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছি, যেমন সিমিংটন রিপোর্ট, অন্যান্য রিপোর্ট ও অনুসন্ধানজনিত লিখিত বিবরণ এবং আদিবাসী সেবা মণ্ডলের নেতাদের বিবৃতি। আশা করি এতে করে এ ব্যাপারে কোন ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকবে না।

আমার এই বই লেখার ব্যাপারে শামরাও-ই ছিলেন প্রধান অনুপ্রেরণা। আমি যখন জেলে ছিলাম তখন কমরেড অহিল্যা রঙ্গনেকার, কমরেড বিমলা রণদিভে ও মিসেস প্রেমা ওক-এর মতো সাথী বন্ধুদের নিরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনায় এই বই সম্পূর্ণ হয়। তাঁদের প্রতি খোলাখুলি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আমি তাদের বিব্রত করতে চাই না।

এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে যাবার পর প্রশ্ন দেখা দেয় এখন এটাকে নিয়ে কি করা যায়। প্রকাশের জন্য এটা কারও কাছে পেশ করার মতো সাহস ও দৃঢ়তা আমার ছিল না। এই সময় আমার পা ভেঙে যাওয়ায় আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। হাসপাতালটা ছিল আমার ভাতৃজায়া ডাঃ লীলা গোখেলের, মিঃ বালকৃষ্ণ লক্ষণ গোখেলের স্ত্রী। হাসপাতাল থেকে আমি তাদের বাড়িতে যাই এবং সেখানে দুমাস আরোগ্যলাভের জন্য থাকি। সেখানে থাকার সময়ে বোম্বাই স্যোসাল সারভিস লীগের আমার একজন সহকর্মী কমল পানেমাংগলোর পাণ্ডুলিপিটি পড়েন। মিসেস ও মিঃ বসন্ত পানে-

ম্যাঙ্গালোর তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র সুপরিচিত মারাঠী লেখক মিঃ জ্ঞানেশ্বর নাদকারণির সঙ্গে অবিলম্বে কথা বলেন, তিনি তখনই আমার সংগে দেখা করতে আসেন। তিনি পাণ্ডুলিপিটা আগাগোড়া পড়ে ফেলেন এবং আর দেরি না করে তিনি 'মৌজে'র মিঃ এস.পি. ভগৎকে টেলিফোন করেন এবং পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলেন। আমি তখনও শয্যাশায়ী, আমার আর এক ভাই মিঃ গজানন লক্ষণ গোখেল অধৈর্য হয়ে আমাকে বারে বারে তাগিদ দিতে লাগলো। তাই, একদিন কমরেড পি. বি. রঙ্গনেকারের সংগে গিয়ে ভয়ে ভয়ে পাণ্ডুলিপিটি মিঃ ভগতের হাতে তুলে দিলাম। এ সব ঘটনা দ্রুত ঘটে গেল আকস্মিক ও অপরিকল্পিত দেখা-সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে। কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবার পর মিঃ ভগৎ বললেন যে, তিনি বইটা প্রকাশ করার মনস্থ করেছেন। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মিঃ ভগৎ এই কাজে যে ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়েছেন এবং বরাবর যে সব গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ করেছেন তার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। মিঃ নাদকারণির সাহায্যের জন্য আমি তার কাছেও কৃতজ্ঞ, সরল প্রকৃতির দীর্ঘদিনের উৎপীড়িত ওয়ারলিদের আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসাবে জাগরণের এবং তাদের মৌল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে এ সব কাহিনী মিঃ নাদকারনিকে ছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে দিনের আলোয় তুলে ধরা যেত না। অবশেষে, মৌজ প্রিনটিং ব্যুরোর মিঃ ভগৎ ও তার ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ছাপার প্রুফ দেখা ও সংশোধন করা আর এ বই প্রকাশ সম্পর্কিত অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে অমূল্য সহযোগিতার জন্য কমরেড পি. বি. রঙ্গনেকারের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

আমার সাথী ও সহকর্মীদের স্বেচ্ছামূলক ও উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান ছাড়া আমার মারাঠী সংস্করণের ইংরাজি অনুবাদ দিনের আলো দেখতে পেত না—এটা স্বীকার করার আনন্দ থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করতে পারি না।

মূল মারাঠী সংস্করণের ইংরাজি অনুবাদের জন্য আমি মিসেস সান্তা সাহানে ও কমরেড লীলা সুন্দারাইয়ার কাছে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। মিসেস সান্তা সাহানে কেবলমাত্র ইংরাজি অনুবাদেই সাহায্য করেননি, তিনি ধৈর্য ও আনন্দ সহকারে প্রেসের জন্য টাইপ কপি তৈরি করে দিয়েছেন। এই জন্যও তার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।

কমরেড লীলার কাছে আমি গভীরভাবে ঋণী যে তার অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছে ও অনেক মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছে। ইংরাজি সংস্করণের সব কিছু কৃতিত্ব তাদের উভয়ের প্রাপ্য।

আমার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানোর ব্যাপারে দেরি হওয়া সত্বেও ন্যাশনাল বুক এজেন্সির সুনীল কুমার বসু বইটি ছাপিয়ে যেভাবে সময় মতো প্রকাশ করেছেন তার জন্য তাকে শুধু আন্তরিক ধন্যবাদ জানানোটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মিঃ বসু ছাপার প্রুফগুলি খুব যত্ন নিয়ে দেখেছেন। এর জন্যও তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো ভাষা আমার নেই।

আমি আশা করি দেশের ইংরাজি ভাষাভাষি জনসাধারণ এই বইটি স্বাগত জানাবেন—যেমনভাবে মহারাষ্ট্র, কেরলা ও কর্ণাটকের লোকেরা তাদের ভাষায় এ বইয়ের সংস্করণকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বোম্বাই, জুলাই ১৯৭৫

গোদাবরী পারুলেকর

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

থানা মহারাষ্ট্রের অন্যতম একটি জেলা। উম্বরগাঁও, দহানু, পালঘর এবং জওহর তালুক এই জেলার অন্তর্গত। এই তালুকগুলির অরণ্য-অঞ্চলের বহু এলাকায়, বিশালসংখ্যক উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিবসতি; তাদেরকেই বলা হয় আদিবাসী। এই মানুষগুলিই জমিদার ও জঙ্গলের ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। আদিবাসীদের মধ্যে ওয়ারলি সম্প্রদায়ই মোট আদিবাসী জনসমষ্টির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। বিক্ষোভ ও লড়াই-এর ক্ষেত্রে তারাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

মোটামুটি একশ বছর আগেও, আদিবাসীরাই ছিল এই অঞ্চলের সমস্ত জমির মালিক। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই তারা বাস করত, প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য ফলাত, আর তাই দিয়েই ভরপেট খেত। তারপর, ব্রিটিশ-রাজত্বের সূচনায় শাসক-শ্রেণীর সমর্থন-পুষ্ট হয়ে, বহু বহিরাগত, হিন্দু, মুসলমান ও পার্সী ঐ অঞ্চলগুলিতে অনুপ্রবেশ করল। সবাই তারা শিক্ষিত, ব্যবসায়ী ও বণিক। আদিবাসীদের অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, সরলতা ও সহজ বশ্যতার সুযোগ নিয়ে, ক্রমান্বয়ে তারা আদিবাসীদের জমিগুলি গ্রাস করতে শুরু করল। ক্রমে ক্রমে তাদের বেশিরভাগ জমিই, এই সব নবাগতদের দখলে এসে গেল এবং ক্ষমতাশালী ভূস্বামীরূপে নিজেদের তারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করল। জমির মূল ও আইনসংগত মালিকদের দখলচ্যুত করার জন্য, এই নবাগতরা ঐ ন্যায়সংগত আদি মালিকদের সংগে নানারকম ঘৃণ্য অপরাধমূলক দুর্ব্যবহার করেছিল। এটা তো স্বাভাবিক যে আদিবাসীরা তাদের জমির মালিকানা হারাতে অনিচ্ছুক ছিল। জনশ্রুতি আছে—তাদের কাউকে কাউকে অবাধ্যতার অভিযোগে গুলি করে মারা হয়েছিল, আবার কাউকে বা গাছের সংগে বেঁধে চাবুক চালানো হত, অথবা আরো অন্যবিধ উপায়ে নিপীড়ন করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে, তাদের ঠকিয়ে দলিল তৈরি করে, তাতে তাদের বুড়ো আঙুলের টিপ-সই নিয়ে নেওয়া হত। ১৯৩৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর, বোম্বাই প্রদেশের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র ও রাজস্বমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই, আইন সভায়

"প্রজাস্বত্ব আইনের" উপর ভাষণ প্রসংগে বলেছিলেন,—"খান্দেশ জেলার ভীল অঞ্চলে বা থানা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে…কয়েক বছর আগেও, এই মানুষগুলিই ছিল সমস্ত জমির মালিক। কিন্তু খারাপ সময়ে দুর্ভিক্ষ বা দুষ্প্রাপ্যতার দিনগুলিতে, অভাবের তাড়নায়, সামান্যতম মূল্যের বিনিময়েই জমিগুলো তাদের হাত থেকে 'সাহুকারদের' দখলে চলে গেল। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে—যেখানে কয়েক একর জমি, মাত্র পাঁচ পাউন্ড খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে হাতছাড়া হয়ে গেছে—কোন কোন ক্ষেত্রে একর পিছু পাঁচ টাকা বা এক টাকা, এমনকি আট আনাতেও।" এই সব মন্তব্য থেকে এটা বেশ পরিস্কার বোঝা যায় যে, আদিবাসীদের অসহায়তার সুযোগগুলিকে নিষ্ঠুর-ভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের জমিগুলি বে-আইনীভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বোম্বাই প্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বি. জি. খের ১৯৪১ সালের ২৫শে নভেম্বর "আদিবাসী সেবা মণ্ডলের" পক্ষ থেকে যে আবেদন-পত্র প্রকাশ করেছিলেন, তাতেও অনুরূপ কাহিনীরই সন্ধান মেলে।

১৯৪৫ সালে, যখন আদিবাসীরা বিক্ষোভ ও লড়াই শুরু করেছিল, সেই সময়ে যে সমস্ত কৃষকের সামান্যতম জমিও ছিল, তাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। যদিও শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত বহিরাগতরা আদিবাসীদের জমি দখল করল, কিন্তু তবু চাষ করার জন্যে দরকার হল ঐ আদিবাসীদের মেহনত। আর ওদিকে, সদ্য ভূমিহীন আদিবাসীদের বাঁচার জন্য, কোন রকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, কাজেরও প্রয়োজন ছিল। এই রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জন্ম নিল ঋণ-বন্ধ ক্রীতদাস প্রথা, জমি হস্তান্তরের সংগে ক্রীতদাসও হস্তান্তর প্রথা এবং বাধ্যতামূলক শ্রমদান প্রথা বা বেগার প্রথা। এই সব প্রথার কুফলস্বরূপ—আদিবাসীদের উপর শুরু হল জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার আর নির্যাতন।

সমস্ত আদিবাসী-জমি দখল করার পর, তাদের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখার পরিকল্পনায় কিছু কিছু নিকৃষ্ট-মানের জমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। শর্ত এই যে, জমিদারদের সংগে চুক্তিবন্ধ হতে রাজী থাকতে হবে। চুক্তির নাম "কবুলায়ত প্রথা"। এই চুক্তি অনুযায়ী, কৃষক জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক, কখনও বা অর্ধেকেরও বেশি অংশ জমিদারকে তার প্রাপ্য হিসাবে দিতে বাধ্য থাকত। কার্যত কিন্তু জমিদাররা চুক্তি-স্বীকৃত অংশেরও বেশি পরিমাণ দাবি করত। উৎপন্ন ফসলের জমিদার-প্রাপ্য অংশের নাম "খন্দ" বা 'মক্তা" খাজনা। আর উপরি-উক্ত চুক্তি অনুযায়ী যে কৃষক জমি নিতে সম্মত হত তাকে বলা হত "প্রজা"। এইভাবে নিম্নমানের ভূমিদানের মাধ্যমে মালিকরা আরও বেশি কিছু উপস্বত্ব বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ

করতে চাইল। জমির প্রতিদানে ভূস্বামীর উৎকৃষ্ট জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে সমস্ত কৃষি-কর্ম করতে ঐ আদিবাসী প্রজাকে বাধ্য করা হল। এই পদ্ধতিকেই বলা হয় 'বেঠ' বা 'বেগার-প্রথা'। শ্রীসিমিংটন তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন—এই প্রথা, ক্রীতদাস-প্রথা অপেক্ষা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয়।

ভূমি-ক্ষুধাতুর কৃষক এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডটিকে, তা সে যতই নিকৃষ্ট-মানের হোক না কেন, তার সত্তার অংশ হিসাবেই দেখত। তার কাছে তা হারানোর অর্থই যেন হৃদ্‌পিণ্ড থেকে এক তাল মাংস ছিঁড়ে ফেলা।' এই জমিটুকুই হচ্ছে কোনমতে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। তাই সেটুকুকে রক্ষার জন্য সব কিছু করতে সে প্রস্তুত। এইভাবে, বিবিধ উপায়ে, জমিদার কৃষককে শোষণ করত। নিজের সমস্ত জমি আদিবাসীদের দিয়ে চাষ করিয়ে নিত, তার জন্য কোন মজুরিই দিত না, উৎপন্ন সমস্ত ফসল নিজের দখলে রাখত ; আবার সেই সংগে প্রজার জমিতে উৎপন্ন ফসলেরও অংশ দাবি করত। জমিদারদের শোষণ এখানেই কিন্তু থেমে থাকত না, অন্য অনেক রকমের কাজও প্রজাদের দিয়ে করিয়ে নিত। যেমন ঘাস কাটা, গাছ কাটা প্রভৃতি কাজ। ভূস্বামীরা শুধু কৃষি-জমিরই মালিক ছিল না, প্রায়ই দেখা যেত তাদের বিস্তীর্ণ খাস-জমিও আছে, আবার এলাকার জংগল কিনে নিয়ে ঠিকেদারিও করত। সুতরাং জমিদার, খাস জমির মালিক আর জংগল-ঠিকাদার—এই তিন মূর্তিতে তারা প্রজাদের উপর শোষণের রথ চালাত—যাতে নিজের ভূ-সম্পত্তিতে সমস্ত রকম চাষ-বাস ও অন্যান্য প্রয়োজনে বিনামূল্যে শ্রম-দান প্রথা অব্যাহত রাখা ও চিরস্থায়ী করা যায়। চুক্তিবলে যেটুকু জমি পাওয়া গেছে, তাও পাছে হারাতে হয় এই ভয়ে কৃষকরা নির্বিবাদে এই সমস্ত কাজ কর্ম করত।

১৯৪৫ সালে যখন আমি প্রথম আদিবাসীদের ঘনিষ্ঠ-সংস্পর্শে এলাম, সেই সময় তারা বাস করত নিজেদের সীমাবদ্ধ জগৎটুকুর মধ্যে ; বোম্বাই থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে সেই জগৎ, যার আয়তন এক হাজার বর্গমাইলের বেশি নয়। উম্বরগাঁও, দহানু, পালঘাট তহশীলের জংগল ও উপত্যকা এলাকায় এই সব অর্ধ-উলংগ আদিবাসীরা, তাদের উপবাস-ক্লিষ্ট অস্তিত্বটুকু কোন রকমে টিকিয়ে রাখার সাধনা করে চলছিল। নিজেদের গ্রামের বাইরের জগৎটা তাদের কাছে ছিল অজানা। তাদের এই অবস্থায় বাইরের জগৎ সম্পর্কে ধারণার কথা ছিল অবান্তর। সে সময়ে তাদের কল্যাণের জন্য, না ছিল কোন রাস্তাঘাট, না ছিল ইস্কুল-পাঠশালা, অথবা কোন হাসপাতালের অস্তিত্ব। যা ছিল—তা শুধু মর্মান্তিক দারিদ্র্য, অমানবিকতা, দুঃখদুর্দশা, রোগযন্ত্রণা আর অজ্ঞানতা।

শোষণ ও মৃত্যুর যাঁতাকলে দৃঢ়ভাবে পিষ্ট হয়ে এই ভাগ্যহতরা অবর্ণনীয় ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছিল। সরকার বাহাদুর জনৈক শ্রী সিমিংটনকে তপশীলভুক্ত উপজাতিদের জীবন-যাত্রার অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে বলেছেন—"যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশে, অরণ্যের উপজাতিরা কাজ করে, বসবাস করে, তা অত্যন্ত শোচনীয়; এবং যে রকম অন্যায় অবিচারের তারা নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রশাসন-পর্যায়ে তা কলংকের কালিমা লেপন করে।" প্রয়াত বি. জি. খের মহোদয়ও ১৯৪০ সালের ১লা জুলাই তারিখে 'আদিবাসী সেবা মণ্ডলের' পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রচার-পুস্তিকায়, অনুরূপভাবে বলেছেন, "বোম্বাই থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেই, মনুষ্য-জাতির এক বিশাল অংশ যে এইভাবে ক্রীতদাস অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর জীবন-যাত্রার মধ্যে পচতে পচতে ক্ষয় হয়ে যাবে এবং আমাদের উন্নাসিক নাগরিকবৃন্দ যে তাদের নিঃসীম দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার খিন্ন জীবন-যন্ত্রণা সম্পর্কে আত্মপ্রসাদভরা অজ্ঞতায় উদাসীন হয়ে থাকবেন-এটা নিশ্চিতভাবে খুব লজ্জাকর ব্যাপার।"

১৯৪৫ সালে ওয়ারলিদের বিধ্বস্ত মর্মন্তুদ জীবন সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করা শহুরে মানুষের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ধীরে ধীরে দিন-যাপনের গ্লানি সহ্যের শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছাল। নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের মুক্তি-পণ হিসাবে মৃত্যুও যেন অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হল। এই সময়েই ওয়ারলিরা লড়ায়ের জন্য কোমরের কাপড় কষে বেঁধে তৈরি হল। সম্পূর্ণ সরকারী যোগসাজসে, জমিদার-সাহুকাররা যে অমানুষিক হয়রানি আর নির্যাতনের রথ চালাচ্ছিল, তারই বিরুদ্ধে কঠিন কঠোর মানসিক দৃঢ়তা ও মরণভয় তুচ্ছকরা দুর্বার সাহস নিয়ে তারা যুদ্ধ করেছিল। দু'বছর ধরে চললো সেই লড়াই। ১৯৪৭ সালে বিজয়ী বীররূপে অভ্যুদয় ঘটল ওয়ারলি শ্রেণীর; ভারতবর্ষে বীরত্বপূর্ণ কৃষক-সংগ্রামের ইতিহাসে, এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে বসল তারা। তাদের এই অনন্য সংগ্রামের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি দেখা দিল। ব্যাপক মানুষের দৃষ্টি তাদের সমস্যাবলীর প্রতি কেন্দ্রীভূত হল।

সে সময় অনেকে নানান তত্ত্ব ও বিতর্কের যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন —কেন এই অভ্যুত্থান ঘটল, কীভাবে ঘটল, পশ্চাৎপটে কি তার কারণ, সামনেই বা কোন লক্ষ্য। তাদের তত্ত্বকথার অধিকাংশেরই সারবস্তু হচ্ছে—সমগ্র আন্দোলন সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা ছড়িয়ে দিয়ে আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা। প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় পত্র-পত্রিকা

গ্রুলি অভিযোগ তুলল—কমিউনিস্টদের মারাত্মক, ক্ষতিকর প্রচারই নিরক্ষর, অপরিণত পিছিয়ে-থাকা ওয়ারলি সম্প্রদায়কে হিংসার পথে ঠেলে দিয়েছে ; অভ্যুত্থানের পিছনে আছে কমিউনিস্টরা আর তাদের মিথ্যা অপপ্রচার। শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর মানুষরাও অভিযোগ আনল যে, হত্যাপরাধ ও অগ্নিসংযোগ কার্যে ওয়ারলিদেরকে উদ্দীপিত করার ব্যাপারে কমিউনিস্টরাই পুরোপুরি দায়ী। কংগ্রেস সরকারও ১৯৪৬ সালের ১৩ই জানুয়ারি তাদের রিপোর্টে অনুরূপ অসত্য ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছিল। এই অভ্যুত্থানকে 'রাজনৈতিক পরিবর্তনকামী অর্থাৎ ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট-রাষ্ট্র প্রবর্তনকামী ও হিংসাত্মক পথের উদ্গাতাদের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ' বলে অভিহিত করল। জনগণের একটি সঠিক আন্দোলনকে এই মর্মে বিশ্লেষণ করার অর্থ জনগণ ও তাদের সমস্যাবলীর প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা ও ঘৃণা-প্রকাশেরই নামান্তর। এই সব নিপীড়িত মানুষগুলোকে যারা সংগঠিত করে শক্তিশালী করে তুলল, তাদের প্রতিও, এতে তাদের, ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটল। তা না হলে, কেনই বা একটি সাহসী সংগ্রামকে ঐ রকম নামে অভিহিত করা হল ?

'অস্ট্রেলিয়ন ডেইলি টেলিগ্রাফের' সাংবাদিক, মাইকেল ব্রাউন ঐ একই অভ্যুত্থান-প্রসঙ্গে বলেছেন, "একজন মহিলা কমিউনিস্ট বোম্বাই-এর থানা জেলার গভীর অরণ্যে আদিবাসী ওয়ারলিদের বিদ্রোহ পরিচালনা করছেন।" হ্যাঁ, এটা সত্য, এটা বিদ্রোহ, শত-শত বছরের শৃঙ্খল ভেঙে টুকরো টুকরো করার জন্য আদিবাসীদের বিদ্রোহ। নিপীড়িত মানুষের রক্ষক, মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য, শ্রীনরহরি পারেখ ১৯৪৭ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখের 'হরিজন' পত্রিকার একটি সংখ্যায় বলেছিলেন, "দহানু তালুকে আদিবাসী ওয়ারলিদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার একটি ঘটনায় আমাদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পুলিস, মিলিটারী একদিন এই হাঙ্গামা দমন করবে, শান্তিও ফিরে আসবে। কিন্তু তাতে এটা বোঝায় না যে, সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এ ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা রাষ্ট্র-দেহে গুরুতর রোগের বহির্লক্ষণ মাত্র। যতদিন না ওই ব্যাধির মূল শিকড়টা উৎপাটিত হবে, ততদিন পর্যন্ত ঐ বহির্লক্ষণের উপর ভাসা ভাসা প্রলেপ-চিকিৎসায় কোন ফল হবে না। এই দাঙ্গাকারীরা ভীষণ ভীরু-প্রকৃতির মানুষ বলে পরিচিত। তাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা বর্ণনাতীত। যুগ-যুগান্ত ধরে সমকালীন শাসক শ্রেণীর শোষণ-যজ্ঞের বলি হয়ে এসেছে তারা। জমিদার, অর্থগৃধ্নু মহাজন, রক্ত-চোষা পরজীবী সম্প্রদায় ঘাতকের ভূমিকা নিয়েছে। জমির আদি মালিক ছিল আজকের দাঙ্গাকারীরাই, তারা আজ

নিজভূমে পরবাসী, দায়বন্ধ ক্রীতদাস। তাদের শ্রম-বিনিয়োগেই বিবেক-বোধ অসাড় করে রেখে প্রভূত মুনাফার পাহাড় তৈরি করছে নব-অভিষিক্ত জমিদার ও কুসীদজীবীর দল। এই শোষণ-বঞ্চনার পশ্চাৎপটে উঁকি মারছে ভয়ংকর অত্যাচার ও অবিচারের অবগুণ্ঠিত মুখ। যতদিন না শোষণ-দমন অবিচারের মূলোচ্ছেদ হয়, ততদিন পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রত্যাশা নিরর্থক …। এটা কি একটা বিস্ময়ের ব্যাপার—যদি ব্যর্থতার, হতাশার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় তারা বে-পরোয়া হয়ে ওঠে এবং হিংসার আশ্রয় নেয়? শোষিত নিপীড়িত মানুষের প্রাণশক্তি আজ জেগে উঠেছে। সময় ও পরিস্থিতি—উভয়েরই অন্তিম-লগ্ন এসে উপস্থিত, সেই লগ্নক্ষণ তাদের পূর্ণমুক্তি দাবি করছে। কারও সাধ্য নেই—সেই ধারা-প্রবাহকে স্তব্ধ করে দেয়।"

যে সব কারণ আদিবাসীদের অংকুশাহত করে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের পথে চালিত করল, তা এতক্ষণ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হল। কিন্তু কী সেই চালিকাশক্তি, যা শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে, নির্ভীক সাহসিকতায় তাদের যুদ্ধোন্মাদে উদ্দীপিত করে তুলল? কী সেই প্রত্যাশা, কী সেই অভীপ্সা যা সহজবশ্য ওয়ারলি সম্প্রদায়কে নির্ভীক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকে রূপান্তরিত করল? কোন অনুপ্রেরণায় এত কষ্ট-সহনে ও আত্মোৎসর্গে তারা ব্রতী হয়ে উঠল? এত স্বল্প সময়ের মধ্যে, কিভাবেই বা অজ্ঞ সরলমনা, স্বভাব-ভীরু আদিবাসীরা চিন্তা-চেতনায় বদলে গেল? পরবর্তী অধ্যায়সমূহে ওই সব প্রশ্নাবলীর উত্তর-দানে আমি প্রয়াসী হয়েছি। প্রতিটি জিনিস যা আমি দেখেছি, আর নিজেকে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তুলেছি এবং কিভাবে কমরেড শামরাও পারুলেকরের নৈতিক সমর্থন, উৎসাহ-উদ্দীপনায় এবং বাস্তব-সম্মত নিরলস নির্দেশনায় আমি ও আমার সহকর্মীরা আমাদের অভীষ্ট সাধনে সক্ষম হয়েছিলাম—সেই সব কাহিনী আমার সাধারণবোধ্য অমার্জিত ভাষায় বর্ণনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অরণ্য-প্রান্তরে, পাহাড়ী উপত্যকায় ওয়ারলি-জীবন

মহারাষ্ট্র কিষাণ সভা-আয়োজিত প্রথম মহারাষ্ট্র কিষাণ সম্মেলন থানা জেলার টিটোয়ালায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনের পূর্বে প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে কমরেড পারুলেকর, উম্বরগাঁও তালুকের ডোঙ্গরী গ্রামে একটি জনসভা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণ ওয়ারলিদের মধ্যে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর ফলে তাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর ইচ্ছানুসারে টিটোয়ালা সম্মেলনে যোগদান করেছিল। এই সম্মেলনেই সর্বপ্রথম তারা শুনল সেই স্লোগান—'বেগার প্রথা খতম করো'। এই স্লোগানের মর্মবাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে তারা বাড়ি ফিরল এবং বেগারি খতম করার দৃঢ় সংকল্প নিল। তারপর জমিদারের জমিতে বেগার খাটতে অস্বীকার করতেই, জমিদাররা ক্রুদ্ধ হয়ে দমন-চক্রের আশ্রয় নিল। ওয়ারলিরা বুঝতে পারল না কিভাবে এই অত্যাচারের মোকাবিলা করবে। জমিদারের চাপিয়ে দেওয়া অত্যাচারের রাজত্বের সঠিক জবাব তখন তাদের জানা ছিল না। তক্ষুনি তারা আমায় আহ্বান জানাল। তখন কমরেড পারুলেকর, আমার সহকর্মীরা ও আমি—সবাই মিলে আমরা জমিদারী হামলা প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আদিবাসীদের সম্মিলিত করে একটা বিশাল জনসভা করবো। আর সেই সংগে এলাকায় কি ঘটছে, কি পরিস্থিতি চলছে, স্বয়ং সে সম্পর্কে প্রথমেই মূল্যায়ন করার জন্য আমিও আদিবাসী গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

আদিবাসীদের জীবন-ধারা সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ কোন ধারণাই ছিল না। আমার পাঠ্য-জীবন পুণায় কেটেছে। তারপর সক্রিয় জনজীবনের প্রথম পর্যায়ে কর্মস্থল হল বোম্বাই। আমার আদিবাসী এলাকা সম্পর্কে কোন রকম পরিচিতিই ছিল না। অপরিচিত এলাকায় যাবো, নতুন মানুষের সঙ্গে মিশবো, ভিন্নতর জীবনধারার শরিক হবো—এই সব কিছুর আশায় রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, থানা জেলার উম্বরগাঁও তহশীলের তলাসরীতেই আমাদের প্রথম সভা হবে। তখনকার দিনে একটি ছোট্ট অখ্যাত গ্রাম, তলাসরী, পশ্চিম রেলপথের সঞ্জন স্টেশন থেকে প্রায় দশ

মাইল পূর্বে তার অবস্থান। কমরেড দর্লাভ ও আমি তার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সঞ্জনে নেমেই লক্ষ্য করলাম, বাসে বসার জায়গা পাওয়ার জন্য যাত্রীরা পাগলের মতো ছুটছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাস। ঐ বাসটা না পাওয়ার অর্থই হচ্ছে —সঞ্জন স্টেশনে রাতভোর পড়ে থেকে পরের দিনের বাস ধরা। বাসে প্রচণ্ড ভীড়, যাত্রীরা পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করছে। ভাবতেই পারছিলাম না, কেমন করে আমরা বাসের মধ্যে একটু জায়গা পাবো। বাসে কয়েকটা মাত্র সারি-লাগানো বেঞ্চ, তাতে বসে আছেন বিত্তশালী, প্রভাবশালী আমীররা। মাঝখানে ফাঁকা জায়গায়, যতদূর ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ানো যায়, তেমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে আদিবাসী আর গরিব মানুষগুলো। ঠেলাঠেলির চাপে আমরাও কখন কীভাবে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

তলাসরী কোথায় বা সেখানে যেতে হলে কোথায় নামতে হবে—এসব কিছুই জানতাম না। নতুন জায়গা, তাই বেশ কিছুটা ভাবনায় পড়ে গেলাম। মোটামুটি ভেবেই রেখেছিলাম—তলাসরীতে বাসটা পেঁছালেই কণ্ডাক্টর 'তলাসরী' বলে নিশ্চয় হাঁক দেবে, সুতরাং তার চিৎকারের উপর নির্ভর করতে হবে, অথবা অন্যান্য যাত্রীর মধ্যে তলাসরীগামী কোন যাত্রীকে খুঁজে পেলে তার সংগেই বাস থেকে নেমে পড়বো। একবার সেখানে পেঁছাতে পারলে তারপর কোন কৃষকের বাড়ি খুঁজে চলে যাবো। আর তারও পর ঘটনা স্রোত যেদিকে বইবে আমরাও সেদিকে গা ভাসিয়ে দেবো। স্বীকার করতে লজ্জা নাই—সম্পূর্ণ অপরিচিত এলাকায় প্রথম যাচ্ছি তাই খুব ভাবনায় পড়েছিলাম। তখন কিন্তু কিছুই জানতাম না যে টিটোয়ালা সম্মেলন আদিবাসীদের মনের মধ্যে কত গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। তলাসরীতেই আমি প্রথম দেখেছিলাম নিপীড়িত মানুষরা সামান্যতম অবলম্বন পেলেই তা কেমন ব্যগ্রভাবে আঁকড়ে ধরতে চায়। কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হতেও কেমন তারা প্রস্তুত, বন্ধু বলে, আপন বলে একবার যাদের ভেবে নেয়—তাদের প্রতি কতখানি তাদের আনুগত্য। পরবর্তী বছরগুলোতে বার বার এমনতর অভিজ্ঞতা প্রচুর পরিমাণে অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

তলাসরীর একটু আগে, রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ প্রচুর বটগাছ। বাস এগিয়ে চলেছে, দেখতে পেলাম দলে দলে আদিবাসীরা আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য বটগাছের তলায় ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছে। নিজেকে নিজেই বলে উঠলাম—এবার নিশ্চয়ই তলাসরীতে পেঁছে গেছি। বাসটা ঠিক জায়গায় আসতেই তারা তা থামাল, তারপর উষ্ণ অভিনন্দনে অভিষিক্ত করে আমাদের তলাসরীতে নিয়ে চলল।

ওয়ারলিদের সাধারণ অনগ্রসতার কথা বিচার-বিবেচনা করে বৈঠকের জন্য যে ব্যবস্থা তারা নিজেদের হিসেবমত করেছিল, তা সত্যই হৃদয়গ্রাহী। একটা গাছের তলায় একটা ময়লা শতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়েছে—নিশ্চয়ই সেটা কোন দোকানদার বা জমিদারের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছে। তার উপরে পেতেছে একটা ছেঁড়া গালিচা। খাওয়ার জল রেখেছে একটা বিরাট ধাতুর কলসীতে আর দু'তিনটে পোড়ামাটির পাত্রে। তখনকার অবস্থায় এ সব ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে আমাদের শত্রুপক্ষ তখনও পর্যন্ত জানত না আমাদের সভার ফলাফল তাদের স্বার্থে কতখানি ঘা দেবে। প্রচারাভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে এমন ঢালাও ব্যবস্থাপনা প্রশ্নাতীত। তখন কোন জমিদারের কাছ থেকে শতরঞ্চি বা গালিচা পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাস থেকে নামার সংগে সংগেই আদিবাসীরা আমাদের চারিদিকে সমবেত হয়েছিল—তাদের অভিপ্রায় ওখানেই একটা জনসভা আমরা করি।

সবেমাত্র তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ৯৩ ধারামতে সরকার তখন ক্ষমতায়। জনসভা নিষিদ্ধ। সভা করার জন্য কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি, তা সত্ত্বেও সভা করার জন্যে ওয়ারলিরা খুবই অধীর আগ্রহী। তখন যদি সেখানে সভা করি—তাহলে সেটা হবে আইন বিরুদ্ধ। আর যদি না করি, তাহলে তাদের হতাশ করা হয়। কঠিন পরিস্থিতি। আমাদের চতুর্দিকে সমবেত ওয়ারলিদের এমনি বললাম—"লাল ঝাণ্ডার গরিব মানুষের সভার জন্য এমন এলাহি ব্যবস্থা করার কথা কে তোমাদের বলেছে?" একজন বলে উঠল যে, এখানে একবার বি. জি. খের সভা করেছিলেন, তখনও ঠিক এই ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। তাদের বুঝিয়ে বললাম যে, "লাল ঝাণ্ডার মিটিং গরিবের জন্য, কাজেই এসব ব্যবস্থার কোন দরকার ছিল না। গদি, কার্পেট ওসব কি দরকার? বরং আরও সঠিক হবে যদি কারুর ঝুপড়িতে বৈঠক হয়।" তখন সবাই মিলে এগিয়ে চললাম, মণ্ডলপাড়ায় একজনের একটা বড়ো কুটিরে এলাম। ইংগিত করলাম—নেতারা আর বয়স্করা যোগ দেবে বৈঠকে, কিন্তু দেখি—সবাই আমাদের সংগে সংগে আসছে। গৃহ ও গৃহাঙ্গন আদিবাসীতে উপচে উঠল। কেউ দাঁড়ালো বারান্দায়, কেউ বা দরজায়। রীতি অনুযায়ী বয়স্করা বসলেন সামনের দিকে, বাকিরা তাদের পিছনে। আমাদের জন্য বিছানো ছিল বাঁশের দেওয়াল ঘেঁষে একটা খেজুর পাতার চাটাই, তাদের দিকে মুখ করে আমরা বসলাম।

প্রথম সমস্যা দেখা দিল, কিভাবে লাল পতাকাটা টাঙানো যায়। আমাদের

ইচ্ছে ছিল সভারম্ভের পূর্বেই সেটা করে ফেলবো। আলপিন বা পেরেক আমাদের সংগে ছিল না। একজন আদিবাসী দ্রুত সমস্যাটার সমাধান করে দিল। ব্যবস্থাটা আমাদের শহুরে মনে বেশ ভালোই লাগল। চারটে কাঁটা তুলে এনে তাই দিয়ে চার কোণ ভাল করে আটকে দিল। বৈঠক শুরু হতে চলেছে, কি হয় কি হয় ভাব—আসন্ন প্রত্যাশায় ঘরের মধ্যে একটা বেশ থমথমে পরিবেশ, এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত জটিল অবস্থার সৃষ্টি হল। স্থানীয় জমিদারের চৌকিদার (Bhaiyya)—তার আবির্ভাব ঘটল দৃশ্যপটে—হাতে একটা মোটা লাঠি, সংগী তার একজন গ্রাম্য তহশীলদার (Talathi), সে তখন জমিদার-গৃহেই থাকত। তাদের বসার জায়গা করে দিল ওয়ারলিরা, কিন্তু এরা সোজা চলে এল আমরা যেখানে বসেছিলাম। মাটিতে সজোরে লাঠিটা ঠুকে, সামনে সেটাকে রেখে, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল চৌকিদার। অস্বস্তিতে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল ওয়ারলিরা। অনধিকার প্রবেশকারীদের মুখে যেন একটা প্রতিস্পর্ধীর ছাপ—যেন বলতে চাইছে, "এবার দেখা যাক কী কর তোমরা এখানে।" তখনকার দিনে, জমিদারের লোকেদের আর সরকারী কর্মচারীদের আচরণ ছিল, ঠিক যেন রাজার মতো। মাথা তুলে তাদের মুখের দিকে তাকানো সাধারণ কৃষকের পক্ষে দুঃসাহসের কাজ। আমাদের বৈঠকে তাদের উপস্থিতি ওয়ারলিদের অসুবিধা ঘটাল। কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়ল তারা। বুঝতে পারলো যে, জমিদারই ওদের পাঠিয়েছে—বৈঠকে কী হয়, কে কে উপস্থিত, কে কী বলল—এই সব কার্যকলাপের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য। তাদের আসার সংগে সংগেই সমগ্র পরিবেশটা বদলে গেল—একটা প্রাণখোলা উদ্দীপনা চাপা উত্তেজনার রূপ নিল। এখন, আমরা তো চাই ওয়ারলিরা তাদের সমস্যা সম্বন্ধে খোলামনে আলোচনা করুক; কাজেই আমাদের ঐ অনাহূত অতিথিদের বিদায় করার ব্যাপারটা বিশেষ জরুরী হয়ে পড়ল। তাই আমি তহশীলদারকে জানিয়ে দিলাম, "রাজস্ব বিভাগের সরকারী কর্মচারী হিসাবে, আমাদের বৈঠকে উপস্থিত থাকার কোন সরকারী নির্দেশ নিশ্চয়ই আপনার উপর নাই। সুতরাং, আমাদের গোপন বৈঠকে যোগ দেওয়ার কোন এক্তিয়ার আপনাদের থাকতে পারে না।" চৌকিদারকেও বললাম, বিনা আমন্ত্রণে, একজনের ব্যক্তিগত অংগনে, গোপন বৈঠকে, উপস্থিত থাকার কোন অধিকার নাই তার। চৌকিদার আর তহশীলদার হতভম্ব ভাবে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। সেই অবস্থার সুযোগে আরও জোর দিয়ে বললাম, "আমি জানি—কেন আপনারা এখানে এসেছেন। আমার অনুরোধ—আপনারা আপনাদের কাজে যান, আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন। আর, এমন ভয়ংকর লাঠি-সোটা এনেছেন কেন? আতঙ্কগ্রস্ত

হয়ে আত্মরক্ষার জন্য, না, অন্যকে ভয় দেখানোর জন্য ? জানেন তো—লাঠি দেখিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জমানা এখন চলে গেছে ?" এই সব ক্ষুদে রাজারা, এমনতর কথা কস্মিনকালেও শোনেনি—বিশেষ করে আবার ওয়ারলিদের সামনে। ঐ পশ্চাৎপদ এলাকায়, এই অত্যাচারীরা যাদের উপর অত্যাচার চালাত. তাদেরি মতো তারাও পশ্চাৎপদ্। আমার কথার জবাব তারা খুঁজে পেল না। হতভম্ব হয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলতে লাগল, "না. এমনি. কি হচ্ছে একটু দেখবো, শুনবো শুধু, সেই ইচ্ছেটুকু নিয়েই এসেছিলাম—তা আপনারা যদি না চান, তবে থাকবো না. চলেই যাচ্ছি।" শেষের অংশটুকু খুব দ্রুত সংযোজন করল। অতঃপর রক্তচক্ষু ঘোরাতে ঘোরাতে, লাঠি হাতে ক্রুদ্ধ চৌকিদারের প্রস্থান ; আর তার পিছনে পিছনে অবনত মস্তক তহশীলদারের অনুগমন।

যেই না তারা চলে গেল, তার সংগে সংগে যারা এতক্ষণ বোবা হয়ে বসেছিল, সেই ওয়ারলিরা, তখন উত্তেজনায় কোলাহল মুখর হয়ে একেবারে ফেটে পড়ল। সবাই এক সংগে কথার তুবড়ি ছুটাল। চরম বিশৃংখলা শুরু হয়ে গেল। কি তারা বলছে. মাথামুণ্ডু কিছুই তার বুঝতে পারছিলাম না। শুধু এইটুকুই পরিষ্কার হল যে. যে ভাবে, চৌকিদার আর তার সংগী পাটোয়ারীকে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে. সেই দৃশ্য দেখেই তারা খুশিতে ভরপুর। তাদের সামনেই যে দালালদের পিছু হটতে বাধ্য করা হল! এমন লোকও আছে, যে আইন জানে, বোঝে, আর সেই আইন দেখিয়েই দালালগুলোকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়, একেবারে বাক্-শক্তিহীন্ করে দেওয়া যায়—এই সত্যটা তাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম তারা দেখতে পেল যে, জমিদারের বিশ্বস্ত অনুচরেরাও অন্যকে ভয় করে। এই আবিষ্কারের আনন্দ কূল ছাপিয়ে উঠল, বৈঠকের রূপ-রং গেল বদলে। আপন আপন দুঃখকে ভাষা দেওয়ার উদগ্র কামনায় আদিবাসীরা সবাই একসংগে কথা বলতে চাইল। কেউ কেউ বলার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল, কেউ বা হাঁটুতে ভর দিয়ে অর্ধদণ্ডায়মান অবস্থায়. বাকিরা যে যেখানে বসেছিল, সেখান থেকেই বলা শুরু করে দিল। এই আনন্দোচ্ছ্বাস ও কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহ দেখে আমরাও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। বলুক, মনের আনন্দে কথা বলে নিক। শেষকালে একজন বলে উঠল. "এখন আমরা বহেনজির কথা শুনবো। আমাদের জন্যই এতদূর পথ তিনি এসেছেন"। আমি কিন্তু জেদ করে বললাম, "না, না, তোমরাই বল, একে একে বল, আমিই বরং তোমাদের কাহিনী শুনি।" তারপর যা তারা বলে চলল তা শুধু জমিদার, কুসীদজীবী ও তাদের অনুচর

বাহিনী এবং পুলিশ, জংগল ও রাজস্ব বিভাগের অফিসার ও কর্মচারী আর অন্যান্য সরকারী বিভাগের প্রতি তাদের অসহ্য ক্রোধের জলন্ত বহিঃপ্রকাশ। তাদের প্রতি ওয়ারলিদের ঘৃণা, তাদের অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই যেন অগ্নি-শলাকার মতো জ্বলজ্বল্ করছে। এই সব দালাল আর সরকারী অফিসারদের কাঁধে ভর দিয়ে তাদেরি সাহায্যে জমিদার আর মহাজনরা আদিবাসীদের উপর অমানুষিক দমন-পীড়ন চালাত। সেই বর্বর দানবগুলোর দু'টোকে এমনভাবে পরাজয় স্বীকার করে, তাদেরি সামনে রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে দেখে তারা তাদের অভ্যস্ত মৌনী স্বভাব ভুলে গিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। দুঃখ সমুদ্রের অতলান্ত গভীরতার কথা আমাদের বোঝানো এখন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের মতো সহানুভূতিশীল শ্রোতা পাওয়া তাদের জীবনে এক অভিনব ঘটনা! উচ্ছ্বাসের আবেগে তাই ছোট ছোট আপাতঃ অনুল্লেখ্য ঘটনাকেও অতিরঞ্জিত করে ফেলল।

প্রারম্ভিক পর্যায়ের সেই উদ্বেলিত আনন্দের জোয়ারে ধীরে ধীরে ভাঁটা পড়তেই নানান সন্দেহের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল। ভাবতে লাগল তারা—এই দিদিটি চলে গেলেই, সেই চৌকিদার ও তহশীলদার যদি তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে আসে, তাহলে? আশ্বস্ত করলাম তাদের—যদি তাদের উপর কোন হয়রানি বা অত্যাচার চলে, তাহলে তক্ষুনি আমরা তাদের সাহায্যার্থে ছুটে আসবো। এতে আতংক ভাবটা একটু কাটল, শান্ত হল কিছুটা। এসবের পর, যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় একটি বক্তব্য রাখলাম। বোঝাতে লাগলাম লালঝাণ্ডা ও কমিউনিস্ট পার্টির তাৎপর্য, তার উদ্দেশ্য। ওখানেই প্রথম তারা "কমিউনিস্ট পার্টি" শব্দটি শুনল। শব্দগুলো বারবার তাদের অনুবৃত্তি করালাম। শুধু নিজেরাই শিখল না, অপরকেও শেখাতে লাগল। কিন্তু "কমিউনিস্ট পার্টি বিজয়ী হও'—(Communist Partycha Vijay aso") এই শ্লোগান ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে বা অভ্যস্ত হতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল তাদের। তাই আরও সহজ করে বলতে শেখালাম--"কমিউনিস্ট পার্টি কি জয়!" আচার্য আত্রে কিছুদিন পরেই যখন ঐ অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, তখন বহু ওয়ারলিকে বলতে শুনেছিলেন, "আমরা কমিউনিস্ট পার্টির লোক"। লালঝাণ্ডা ও কমিউনিস্ট পার্টিই তাদের কাছে, গরিবের একমাত্র পথ-প্রদর্শক ও মুক্তিদাতা। মনের গভীরে শব্দগুলো খোদাই হয়ে গিয়েছিল। যে বিশেষ আইনগত দিকটির উপর ভিত্তি করে চৌকিদার ও পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে প্রথম ধাপের যুদ্ধে জিতেছিলাম, আমার ভাষণে আমি তা ব্যাখ্যা করলাম। বুঝলো তারা ব্যাপারটা—গরিব মানুষরাও আইন ব্যবহার করতে পারে; আর আইনের লাগামে শত্রুকেও

সংযত রাখা যেতে পারে এবং আইনকে আয়ুধ হিসাবে প্রয়োগের মাধ্যমে জমিদারী অত্যাচারের যবনিকা টেনে দেওয়া কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার। আমার ভাষণের আর কী মর্মার্থ তারা করেছিল তা বলা মুস্কিল। ভাষণ শেষ হওয়ার সংগে সংগেই আবার তারা হৈ-চৈ শুরু করে দিল। বক্তব্য বিষয় তখনো সেই চৌকিদার ও পাটোয়ারীর অসম্মানজনক পশ্চাদপসরণ। নানা মন্তব্যের সাধারণ সুরটা ছিল—"ঠিক করা হয়েছে, উচিত শিক্ষা হয়েছে।" চলে আসার আগে বললাম, আমাদের উদ্দেশ্য গ্রামের পর গ্রামে আমরা যাবো, মানুষকে বোঝাবো, একতাবদ্ধ করে একটি পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করে একটা বিশাল জনসভা করবো। তারপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

আসল কাজ হল আরও পরে—যখন আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষ হওয়ার পর তাদের সংগে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করতে লাগলাম তখনই সত্যিকার লাভ হল। ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণার কাহিনী বুকে নিয়ে এসেছে তারা অনেকেই। আপনজন হিসেবেই ধরে নিয়েছে আমাদের। চলে আসছি আমরা, তখনো চলছে বার বার, অনুরোধ-উপরোধের প্রবাহ—"আবার আসতে হবে, আবার আসবেন··· তা না হলে ওরা আমাদের মেরেই ফেলবে।" কেউ কেউ বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিতে এল। বাকিরা তখনো দলে দলে ভাগ হয়ে, সারাদিনের ঘটনাবলীর মূল্যায়ন করে চলেছে। এমন কি যারা এতদিন পর্যন্ত, আমাদের কার্যাবলী-সম্পর্কে অনুৎসুক ছিল, তারাও এখন 'লালঝাণ্ডা" প্রসংগে কথাবার্তা বলতে লাগল। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে, এ ধরনের ঘটনা হয়তো উন্নাসিক লোকের কাছে মামুলি সাধারণ ঘটনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এই দিয়েই আমরা আদিবাসীদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলাম। তলাসরীতে গিয়ে তাদের জীবনের ভাসা ভাসা এক ঝলক চিত্রকল্প আমরা ধরতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমরা এই সন্তোষ নিয়ে ফিরে এলাম যে, অন্ততঃ একটা ছাপ ফেলে আসতে পেরেছি—ওয়ারলিদের এতদিনকার চেনা-জানা, শিক্ষিত, অভিজাত মানুষগুলো থেকে আমরা ভিন্ন ধাতের, ভিন্ন শ্রেণীর। তারা অনুভব করেছে যে আমরা ভিন্ন সুরে কথা বলি, আর তাদের জন্য অন্ততঃ 'কিছু না কিছু' করার অকৃত্রিম সংকল্প আছে আমাদের। বিশ্বাস করতে, ভরসা রাখতে শুরু করেছে আমাদের উপর। 'সূচনা-পর্ব শুভ'—এই উপলব্ধি নিয়েই বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিলাম।

সকালে বোম্বাই থেকে বেরুনোর সময় শুধু চা খেয়েছিলাম। সারাদিনে ঐটুকুই খাদ্য বা পুষ্টি হিসেবে পেটে গিয়েছে। ওয়ারলিদের কাছে

সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুক বলে খাওয়া বা চা-এর ব্যবস্থার কথা তাদের বলিনি। পরে পরে ঘটনা-স্রোত কিন্তু ভিন্ন-মুখী হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া, চা-জলপান প্রভৃতি ব্যাপারে পরম আন্তরিকতার সংগে তারা অতিথি আপ্যায়ন করত। কিন্তু সেই প্রথমবারে আমরা যখন তলাসরী ছেড়ে চলে আসছিলাম, তখন মনে আমাদের প্রবলতম কামনা·· কখন সঞ্জন স্টেশনে ফিরে গিয়ে এক কাপ চা খাবো। পরবর্তী কর্মসূচীর পরিকল্পনা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করার ব্যাপারও খুব জরুরী। তাই, তাদের সংগে কথোপকথনের প্রলোভন সংবরণ করে প্রায় কিছুটা তাদের নিরাশ করেই তক্ষুনি রওনা দিলাম।

"ডোঙ্গারী গ্রামে চায়ের আসর"

জাতী সম্মেলনের প্রচারাভিযান উপলক্ষে উম্বরগাঁও তহশীলের অনেক গ্রামেই আমরা ঘুরেছি, ছোট বড় অনেক সভা, বৈঠক করেছি, কখনও কখনও কোন জায়গায় রাতও কাটিয়েছি। সঞ্জন স্টেশন থেকে তিন-চার মাইল পূর্বে ডোঙ্গরী গ্রাম। এখন সেখানে বড় রাস্তা হয়েছে, বাস-সার্ভিস্ চালু হয়েছে, কিন্তু তখন কিছুই ছিল না। সঞ্জন স্টেশনে চা-জলখাবার কিছু খেয়ে নিয়ে একটা সংকীর্ণ পাকদণ্ডী পথ ধরে ডোঙ্গরী গ্রামের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিলাম, সকাল ন'টার কাছাকাছি ঐ গ্রামের একটা পাড়ায় হাজির হলাম।

দশ-পনেরটি ছোট ছোট ঝোপড়ি বা ঘর নিয়ে একটা পাড়া। সাধারণতঃ গড়ে উঠেছে উঁচু জায়গায়, সারিবদ্ধ গাছের ছায়ায়।

যে পাড়ায় প্রথম ঢুকে পড়লাম, তার নাম "সালকর" পাড়া। বাঁশ-কঞ্চি দিয়ে তৈরি। কাদা আর গোবরের প্রলেপ দিয়ে মসৃণ করা দেওয়াল এমন কয়েকটা গাদাগাদি করে থাকা কুঁড়ে-ঘর আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। আদিবাসী-ঝোপড়ি তৈরি করতে কাঠ খুব কমই ব্যবহার করা হয়। শুধু খুঁটি, কাড়ি বা চৌকাটের জন্য কাঠ লাগত, আবার কোন কোন ঘরে কাঠের নামগন্ধও নাই। সাধারতঃ ঘরগুলো এত নীচু যে, ভিতরে ঢুকতে হলে মাথা ঝুঁকিয়ে নীচু হয়ে ঢুকতে হয়। আমাদের কর্মী শ্রীলক্ষ্মণ সাপটার ঘরটা এত নীচু যে প্রতিবারে ভিতরে ঢোকা ও বেরুনোর সময়, সর্বদাই বিশেষ খেয়াল রাখতে হত আমায়। বেশিরভাগ ঝোপড়িতেই একটি মাত্র কামরা, দরজাও মাত্র একটি, দেওয়ালের কয়েকটা কঞ্চি ভেঙে দিয়ে জানালার কাজ। বর্ষার হাত থেকে রক্ষার জন্য মাথায় ধান-খড় বা পলাশ (Palas) পাতার ছাউনি। খোলার ছাউনি কদাচিৎ এক-আধটা চোখে পড়ে। ঘরগুলো এমন নড়বড়ে যে ভাঙার জন্য একটি পদাঘাতই যথেষ্ট। কিন্তু কীই বা আছে তাদের, নিরাপদে রাখার মতো যার জন্য আরও পোক্ত করে ঘর করতে

হবে ? কোন প্রয়োজন বোধ করত না তারা। প্রতিটি কুটীরের চারপাশে ছ' থেকে আট ইঞ্চি উঁচু পাথরের ধারি দেওয়া, গোবর দিয়ে মসৃণ করা বেদী। গিয়ে বসলাম একটা বেদীতে। ঘরের সামনে থাকে বাঁশ-কাণ্ড দিয়ে তৈরি—টেবিলের মত দেখতে মাচান। তার উপরে রাখা আছে পানীয় জলভর্তি মাটির কলসী। মাটিতে কতগুলো গর্ত খোঁড়া আছে, সেগুলো জলভর্তি থাকে—মুরগী জল খায়। মুহূর্তের পর মুহূর্ত টিক্‌টিক্ করে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু কোন মানুষের চিহ্ন নাই, কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। আমরা কে, কেনই বা এসেছি—কেউ তা জানতেও এল না। শুধু একটি শব্দ—পাখির চিৎকার আর মুরগীর ডানা-ঝটপটানী—জায়গাটায় কবরের নৈঃশব্দ মাঝে মাঝে ভেঙেগ দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়লাম। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলাম একদল উলঙ্গ, চরম ভাগ্যাহত শিশু। কাছে দাঁড়িয়ে একটু বেশি বয়সের কয়েকটা ছেলে, ছোটগুলিকে দেখাশুনার জন্য তারা থেকে গেছে। পরনে এক টুক্‌রো ছেঁড়া কাপড় লাঙ্গোটির মতো করে পরা। আর মেয়েদের সিকি থেকে আধ গজ পর্যন্ত কাপড়ের টুকরো—হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। ওদের উপস্থিতি আর কুকুরের চিৎকার জনবসতির একমাত্র পরিচয় ঘোষণা করছিল।

একটা ঝোপ্‌ড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা মর্মান্তিক। কামরার এককোণে ত্রিকোণাকারে তিনটে পাথর সাজিয়ে "চুল্লী" হয়েছে, তার ভিতরে ও চারদিকে একগাদা ছাই। দীর্ঘ ব্যবহারে তলায় কালি-পড়ে যাওয়া একটা এ্যালুমিনিয়মের প্যান, কয়েক জোড়া মাটির পাত্র, দু'একটা মাটির থালা—এই হচ্ছে ঘরকন্নার যা কিছু বাসন-পত্র। একটা হাঁড়ির মধ্যে পড়ে আছে কয়েক-মুঠো চালের দানা, কড়ি থেকে ঝুলছে একটা শিকে—তাতে ঝুল্‌ছে একটা হাঁড়ি—তার মধ্যে আচার জাতীয় জিনিস 'আম্বিল' (ambile), একটা মাটির রেকাবিতে কয়েক টুকরো হলুদ, তার সংগে আছে কয়েকটা পেঁয়াজ আর রসুনের খোসা, দেওয়ালে লাগানো বাঁশ থেকে ঝুল্‌ছে বিড়ি তৈরির জন্য 'আপ্‌তা' পাতার বাণ্ডিল, ফুট খানেক লম্বা। একদিক বন্ধ, একটা ফাঁপা বাঁশ দিয়ে তৈরি চোঙার মতো জায়গায় আছে বিড়ির তামাক, সেটা দেওয়ালে ঝুলছে। বাঁশের চোঙাটা (Jar) জঙ্গলের মধ্যে বোতলের কাজ দেয়।

ঝুপড়ির ভিতরটা দেখে আবার বাইরে বেরিয়ে এলাম, কেউ তবু দেখতে এল না, কিছু জিগ্যেসও করল না। কোন খেয়ালই নেই আমরা কে, কেনই বা এসেছি—সে সব জানার ঔৎসুক্য কারও নেই। মুমূর্ষু অচেতন মানুষের মতো পাড়াটা আমাদের চারদিকে পড়ে রইল। এমন দারিদ্র্য আর পরিত্যক্ত অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এক ধরনের অদ্ভুত ভয় আমার মনের মধ্যে জাগল

জায়গাটা সম্বন্ধেও মারাত্মক একটা আতংক পেয়ে বসল। এমন শূন্য আর নির্জন, যে মনে হল যেন আমায় গিলে খেয়ে ফলবে, কেউ রক্ষা করতে আসবে না, মনটা কেমন ভগ্নোদ্যম হয়ে গেল। সংগে সংগে নানান সন্দেহ মনের মধ্যে থাবা বসাতে লাগল। মনকেই জিগ্যেস করলাম কেমন করে, প্রথম জায়গাতেই এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম, আর তার ফল হবে কি ? লক্ষ্যপূরণ হবে না পরাজয় বরণ করে নিতে হবে ? মাইল তিনেক হেঁটে এখানে এসেছি, কিছু কাজ অন্ততঃ করতে না পারলে আবার সেই সপ্তান স্টেশনে পয়দলে ফিরে যেতে হবে, এখন আবার রোদ্দুরের তাপ বেড়ে গেছে। সর্বোপরি সপ্তানে না ফেরা পর্যন্ত এক কাপ চায়েরও কোন আশা নেই। সময়ে চা ছাড়া চলতই না আমার। চোখে প্রায় জল এসে গেল কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা আর গরিবের জন্য অকৃত্রিম মমতায়, আমি নিজেকে যেন টেনে তুললাম—সামলে নিলাম। মনে মনে বললাম—এক্ষুনি বা একটু পরে, বয়স্করা কেউ কেউ নিশ্চয়ই ফিরে আসবে—তখন দেখা যাবেখন কি করা যায়। এই বলে বসে পড়লাম একটা গোবর নিকানো মাটির উঁচু বেদীর উপর। আর কাছাকাছি একটা খেজুর গাছ থেকে কমরেড দলভির আনা কাঁচা খেজুর তার কাছ থেকে নিয়ে চিবতে শুরু করলাম।

আমরা যে এখানে আছি সে সংবাদ, ধীরে ধীরে, যারা ছাগল আর গরু চরাতে গিয়েছিল, সেই ছেলেদের কাছে ছড়িয়ে পড়ল। বেশ কিছু ছেলে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল দেখার জন্য, কেউ কেউ থুতনিটা হাতের লাঠির এক-প্রান্তে ঠেকিয়ে রেখে, দেখতে লাগল, বাকিরা শুধু দাঁড়িয়ে রইল—চোখে তাদের সাগ্রহ জিজ্ঞাসা। বয়স্করা সব কোথায় গেছে—প্রশ্ন করতেই, তারা বলল—বড়ো মানুষরা সব জমিদারের কাছে বেগার খাটতে গেছে (Vethias) কয়েকটা ছেলের চোখে মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ, তাদের বললাম, "যাও, বড়োদের গিয়ে বল যে টিটোয়ালা সম্মেলনের লাল ঝান্ডার লোক এসেছেন— তারা ডেকে পাঠিয়েছেন। হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু, তাদের না নিয়ে ফিরবে না।" খানিকক্ষণ নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ আলোচনা করে ধীর কদমে বেরিয়ে গেল। নিশ্চিত করে বুঝতে পারছিলাম না—আমাদের সংবাদ, গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে কি না শুধু অপেক্ষা ছাড়া আর কিই বা করা যেতে পারে! এতক্ষণ যে ছেলেগুলো নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, তারাও ক্লান্ত হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল, তাদের ঔৎসুক্য-ভরা দৃষ্টি-ক্ষুধা থেকে মুক্তি পেলাম। অনেকক্ষণ কেটে গেল। কারো ফিরে আসার কোন চিহ্ন নাই। সেই নির্জন জায়গায় প্রতিটি মিনিট মনে হচ্ছিল যেন এক

একটি ঘণ্টা। অবাক্ হয়ে ভাবছিলাম—আমাদের সংবাদ-বাহকরা গেল কোথায়? গ্রামের লোকেদের নিয়ে ফিরে আসবে—না আমাদের কথা বেমালুম ভুলেই মেরে দিয়েছে? কিছুই জানি না, অনুমানও করতে পারছি না। অপেক্ষা ছাড়া আর কোন উপায়ই নাই—শুধু উঠ্‌ছি, বসছি; আবার উঠছি, আবার বসছি। চায়ের নেশাটা তীব্র হয়ে উঠতে লাগল। আর তো কিছুই করার নেই, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধটাও তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে লাগল। ধীরে ধীরে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে চলেছে, তবুও উত্তেজনা-দমন করে, মুখে একটা নির্ভীক্ ভাব ফুটিয়ে, কমরেড দত্তভি ও আমি সেখানে বসেই রইলাম, যেন কিছুই হয়নি, পরিস্থিতির আদৌ কোন ব্যত্যয় বা ছন্দপতন ঘটেনি।

ধৈর্যের শেষ সীমায় ঠেলে দিল ওয়ারলিরা। ঠিক যখন ভাবছি—না, আর নয়—দিন শেষ হয়ে আসছে, এবার বাড়ি ফিরবো, তখন দেখতে পেলাম—আমাদের বার্তাবহ দুটি ছেলে, দু-তিন জন ওয়ারলিকে সংগে নিয়ে ফিরে আসছে। দেখতে পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, যন্ত্রণার অবসান ঘটতে চলেছে। লোকগুলোর পরনে লেংটি, লম্বা লম্বা চুল গিঁট দিয়ে বাঁধা। জমিদারের সর্দার কাজ থেকে ছাড়তে চায়নি বলেই তারা আরো তাড়াতাড়ি ফিরতে পারেনি। শুধু "টিটোয়ালা সম্মেলনের লাল ঝাণ্ডার লোক" এসেছেন জানতে পেরেই, তারা বিপদের ঝুঁকি নিয়েও সর্দারের সংগে কথা কাটাকাটি করে চলে এসেছে। মুখে তাদের নির্বিকার ভাব—ভাবাবেগের চিহ্ন নাই। কাছে এসেই, তাদের প্রথানুযায়ী ডান হাতের কনুইটা বাঁ হাতের তালুতে রেখে নাক বরাবর হাতটা তুলে আমাদের অভিনন্দন জানালো। তারপর, নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করে আমাদের নিয়ে চলল গ্রামের স্কুলের দিকে। বাঁশের দেওয়াল দেওয়া আয়তাকার একটি বাড়ি। আমাদের সংগে একটা কথাও আর তারা বলল না। পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, নীরবে তারা কাজে লেগে গেল। একজন ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে দিল, আরেকজন আমাদের জন্য একটা চাটাই পেতে দিল। এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে সংগে সংগেই দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। ইতিমধ্যে একজন ওয়ারলি, একটা চারপায়া নিয়ে এল। সেটাকে বাইরে একটা গাছের নীচে রাখতে বললাম। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, গ্রামের সবাই, অন্ততঃ-পক্ষে বয়ীয়ানরা যাতে সেখানে সমবেত হয় সেই ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু এ অনুরোধ পূরণ করা তো মোটেই সম্ভব নয়, কারণ সবাই তো জমিদারের জমিতে "ভেটীর" কাজ করতে গেছে অর্থাৎ বেগার খাটতে গেছে। সবাই সংবাদ পেয়ে স্কুলে এসে জমায়েত হতে হতে নিশ্চয়ই

বিকেল গড়িয়ে যাবে। যারা এসে পৌঁছেছিল, একে একে সবাই দেওয়াল ঘেঁষে বসে পড়ল, একজন গিয়ে 'চুল্লী' থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নিয়ে এল, আর একজন নিয়ে এল এক তাড়া 'আপ্তা' (apta) পাতা। উপস্থিত প্রত্যেককে একটা করে পাতা দিয়ে দিল। তৃতীয় একজন বাঁশের চোঙা থেকে তামাক নিয়ে হাতে হাতে দিল। তারপর ওয়ারলিরা বিড়ি পাকিয়ে, আগুন ধরিয়ে বসে বসে মৌজ করে টানতে লাগল। দেশের প্রথামতো, অতিথিকে তো একা একা ফেলে রাখা যায় না তাই সামাজিক সৌজন্যে, পাশে বসে থেকে চুপ-চাপ মৌজ করতে লাগল। বাকি সবাই না আসা পর্যন্ত কোন কাজই হবে না। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত কি কথা যে বলবে আমাদের সংগে, তা বুঝে উঠতে পারছিল না। আর আমাদের কাছেও এটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল—কি করা যায় এখন। কমরেড দলভি ও আমি বসে বসে এটা ওটা নিয়ে ইংরাজীতে কথা বলছিলাম। এক ফাঁকে ভাবছিলাম—'এক কাপ চা পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখলে হয়, মিলবে কি ?' একজনকে ডেকে বললাম—'এই যে দাদুভাই, এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে কি ? তোমরা যেমন তাড়ির ভক্ত, আমারো তেমনি চায়ের নেশা। কি মনে হয়, ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে ?" শুনে খুব চিন্তায় পড়ে গেল তারা। কারণ চা তৈরির সাজ সরঞ্জাম কিছুই তাদের নাই। একজন বলে উঠল "আচ্ছা দিদি। চায়ের বদলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবো ?" খুব সত্যি কথা—তাদের কাছে চা বানানোর থেকেও খানা বানানো সহজ সাধ্য প্রস্তাব। রাজী হয়ে গেলাম, তবে এই শর্তে যে তারা যা খাবে তাই তাদের সংগে ভাগ করে খাব। বলে উঠল "আমরা গরিব মানুষ, জংগলে খাওয়ার মতো বেশি কিছু পাওয়া যায় না।" এই বলে তারা কাজে লেগে পড়ল আর আমিও চা এর বদলে খানার প্রস্তাবের কাছে শান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করলাম। কিন্তু হিসেবে আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। মনে হল, তারা যেন দুটোরই ব্যবস্থা করছে। স্পষ্টতঃ, চা তৈরি করা তাদের কাছে খুব সমস্যাবহুল ব্যাপার। চিনি নাই তাদের। কারণ চিনি তারা প্রায় ব্যবহারই করে না। তখন রেশনে ছাড়া অন্য কোথাও চিনি মিলত না, কাজেই চিনি বাজার থেকে কেনাও অসম্ভব। চায়ের পাতাও কারুর বাড়িতে ছিল না, আর দুধও মিলবে না কারণ গরু বা মহিষ কারুর আছে, এ গর্ব গ্রাম করতে পারত না। নিজেদের মধ্যে এই সব সমস্যা আলোচনায় তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রথম ওয়ারলি—চা কি করে তৈরি করতে হয় রে ?

দ্বিতীয় ওয়ারলি—চা। হ্যাঁ হ্যাঁ—ওতো খুব সোজা। কিন্ত চিনি পাবে কোথায় ?

তৃতীয় ওয়ারলি—আমাদের নেই, তবে পাতিলের বাড়িতে কিছু থাকতে পারে।

দ্বিতীয় ওয়ারলি—না, না, তারও চিনি ফুরিয়ে গেছে। তবে তার কাছ থেকে গুড় মিলতে পারে? আর যদি তার কাছে নাও থাকে, তো এক পয়সার কিনে নিলেই চলবে।

প্রথম ওয়ারলি—কি দিদি, চিনির বদলে গুড়ের চা, চলবে তো?

আমার সম্মতি পেয়ে একজন একটা বাচ্চাকে ডেকে তাকে এক পয়সার গুড় কিনতে পাঠিয়ে দিল। তারপর চা-এর গুঁড়ো কারুর কাছ থেকে ধার পাওয়া যাবে কি না এ নিয়ে কিছু কথাবার্তার পর আর একটা বাচ্চাকে দোকান থেকে চা কিনে আনার জন্য পাঠানো হল। জিগ্যেস করলাম—"কদ্দুরে দোকান?" বলল, "ওই তো কাছেই, লম্বা লম্বা পা ফেলে কয়েক পা গেলেই। বাচ্চা এক্ষুনি চলে আসবে।" একটু পরেই আবিষ্কার করলাম—সব থেকে নিকটতম দোকানটা সেখান থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। দূরত্ব তাদের কাছে তেমন মাথা ব্যথা নয়। মনে মনে বললাম—একজন ওয়ারলির "কয়েক পা" মানে তিন মাইলের ধাক্কা। চা আর চিনির বাধা-বিপত্তি তো পার হওয়া গেল, কিন্তু দুধ! সবচেয়ে বড় বাধা। কি করে পার হওয়া যায়? অবাক হয়ে ভাবছিলাম—দুধের কথাটা আদৌ ওদের মনে আছে কিনা। কারণ খুব কম ক্ষেত্রেই ওয়ারলিরা চা খায়। আর যদিও খায় দুধ ছাড়াই খায়। দুধ খাওয়া তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা ব্যাপার। তাই কেউ কেউ, আবার দুধের চা খেতেই পারে না। সত্যি সত্যি, দুধ যেন তাদের দুর্বল করে দেয়। যাই হোক্—চা তৈরির ব্যাপারটাই তাদের কাছে একটা অপ্রচলিত ঘটনা। এমনই দুরবস্থা যে, চা তাদের কাছে স্বপ্নের ব্যাপার। বাস্তব জীবনে যদি সত্যিই জোটে, তো আরো ভাগ্যবানের কপালেই জোটে। চা যে তাদের জন্য নয়—এটাই তারা ধরে নিয়েছিল। আশ্বাস দিলাম তাদের—দুধ বিহীন চা খেতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তারা তা বুঝতে চাইল না। আর একটা ছেলেকে ডেকে বলল "যা তো। একটা ছাগল খুঁজে দেখ তো।" গ্রামের সব ছাগল চরানোর জন্য মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তা এই পাঁচটা শব্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে, পরিষ্কার তিনটে নির্দেশ যথা, ছাগল ধরতে হবে, দুধ দুইতে হবে এবং বাড়িতে দুধ আনতে হবে। ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই যথা-আদেশ শিরোধার্য করেই তক্ষুনি আদেশ-পালন করতে চলে গেল ছেলেটা। চা-এর সমস্যা সমাধান করে এবার খানার সমস্যা নিয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই অনেক কিছুই যোগাড়-যন্ত্র করতে হবে। বুঝতে পারলাম—এবার খানার জন্য মাল-মশলা সংগ্রহ করা, তারপর রান্নাবান্না—

ইত্যাদি সব মিলে বেশ কিছুটা সময় লাগবে ; তাই গাছের তলায় চার পায়াটায় শুয়ে পড়লাম, আর কমরেড দলভিও সেই গাছেরই তলায় নিজেই চাটাইটা বিছিয়ে নিল। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, ঠাণ্ডা বাতাস ঘুম পাড়াতে লাগল, সংগে সংগে ঘুমিয়েও পড়লাম।

ইতিমধ্যে চা-এর জন্য বেশিরভাগ জিনিসই সংগ্রহ করে ফেলেছে। গাছের পাতায় করে, এক পিণ্ড গুড় নিয়ে প্রথম ছেলেটি ফিরে এসেছে, আরেকটা পাতায় মুড়ে চায়ের গুড়ো নিয়ে দ্বিতীয়জন। আনা হয়েছে, এক কলসী পরিষ্কার টাটকা জল, পরিষ্কার ঝক্ ঝকে মাজা একটা প্যান। তিনটি বড় পাথরের টুকরো সাজিয়ে চুল্লী তৈরি হয়েছে, আগুন জ্বালিয়েছে তাতে। এইসব ব্যবস্থাপনার পর চা তৈরি করে নেওয়ার জন্য ঘুম থেকে আমাদের জাগাল। ওদের একটা ভুল ধারণা ছিল—ওদের তৈরী চা বোধ হয় আমরা খেতে চাইবো না। কিন্তু যখন আমরা জোর দিয়ে বললাম, "না, তোমাদের তৈরী চা-ই খাবো" তখন খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তারা। তাদের মধ্যে একজন 'মাতব্বর' এগিয়ে এল চা তৈরি করতে। তাই দেখার জন্য তার চার-পাশে সব ঘিরে দাঁড়াল। প্যানের তিনের চার ভাগ জল ভর্তি করে আগুনের উপর চাপিয়ে দিল। তারপর কিনে আনা সব গুড়টা আর চায়ের গুড়ো ছেড়ে দিল তাতে। দুধ আনতে যাওয়া ছেলেটা তখনো পর্যন্ত ফেরেনি। তার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে আছি সব, ওদিকে গুড়-চা-জল সোঁ সোঁ করে ফুটছে আগুনে। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পাতার ঠোঙায় করে দুধ নিয়ে ফিরল সে। দুধটাও ফুটন্ত জলে ঢেলে দেওয়া হল। এতক্ষণে চা-এর রং এল। মহামান্য অতিথিদের আগেই দেওয়া উচিত—তাই পিতলের ছোট্ট বাটি করে চা দেওয়া হল আমাদের। আমরা চাপ দিয়ে বললাম—"এক সংগে সবাই খাবো।" তখন সবাই পাতা দিয়ে ঠোঙার মতো করে পাত্র তৈরি করে ফেলল, আর তাতে, যে চা তৈরি করছিল, সে একটু একটু করে চা ঢেলে দিল। এইভাবে এক আনা পয়সায় আমাদের সকলের বেশ মজাদার একটা চা-পার্টি হয়ে গেল।

আমাদের মতো ইংরাজী পড়া-জানা ভদ্রলোকের সংগে একত্রে চা-পান-এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতায় ওয়ারলিরা অভিভূত হয়ে পড়ল। চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। দারুণ খুশী হয়ে কমরেড দলভি ও আমাকে অনেকখানি চা ঢেলে দিল। এত চেষ্টা করে, এত কষ্ট করে তৈরি হল চা, গভীর আবেগে আমাদের দেওয়া হল ; যদিও সেটা চা-এর মতো অর্থাৎ চা-এর গন্ধযুক্ত গরম জল,—তবুও তাই চুমুক দিতে দিতে বেশ চনমনে হয়ে উঠলাম—যেন প্রাণশক্তি ফিরে পেলাম। সে সময়ে ওদের ওখানে গেলেই

প্রতিবারেই ঐ ধরনের চা (গুড় জল) খেতাম। কোন গ্রামে গিয়েই যার বাড়িতে উঠতাম তাকে চা তৈরি করতে বলতাম, আর যোগাড়-যন্ত্র করে চা তৈরির ফাঁকে, স্বল্পকালীন নিদ্রাপর্ব সেরে নিতাম, কোন সময় ঘুরতে ঘুরতে যদি দুবলা (Dubla) বা ধোড়ী (Dhodi) জাতীয় আদিবাসীদের বাড়ি গিয়ে উঠতাম, সেখানে শ্রান্ত, পিপাসার্ত হয়ে পড়লে, আর এক বিচিত্র ধরনের চা খেতাম। তারা চা-পাতার বদলে লম্বা ঘাসের মতো "সবুজ চা", যার নাম "ঘাসের চা" তাই ব্যবহার করত। এ রকম চা গলা দিয়ে কিছুতেই নামতে চাইত না। পরে যখন তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারল, যে "সবুজ চা" আমাদের ভাল লাগে না, তখন তারাও (দুবলা বা ধোড়ী), যেখান থেকেই হোক, আমাদের জন্য পাতা-চা সংগ্রহের ব্যাপারে নজর দিল, এখন অবশ্য পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমি তো চা খেয়ে খাটিয়ার উপর শুয়ে ছিলাম। অন্য সব ওয়ার্লিরা তখনো এসে পৌঁছায়নি। শুয়ে শুয়ে, অবাক হয়ে কত কথাই ভাবছি— যে আমি এতদিন চা খেয়ে এসেছি "লিপটন অরেঞ্জ পিকোই"-চা টাটকা দুধে তৈরি, সুন্দর টি-পট থেকে ঢেলে দেওয়া চা—সেই আমি এই মাত্র গরম 'গুড়-জল-চা বেশ মৌতাত করে পান করলাম। বিস্ময়ের উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন হল না। জীবনে যদি কোন লক্ষ্য থাকে, আদর্শ থাকে, তাহলে সেই লক্ষ্য-পূরণের পথে, ব্রত-উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে, যতই দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন, সবই হাসিমুখে মহানন্দে সহ্য করা যায়। বিরক্তির পরিবর্তে একটা গভীর সন্তোষ জাগে মনের মধ্যে।

চা তৈরি করার সময়ই ওয়ার্লিরা খাওয়া-দাওয়ার প্রস্তুতিও আরম্ভ করে দিয়েছিল। তাদের সংগেই আমরাও খানা খাব—এই কথা শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিল তারা। উচ্চ-শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা তাদের সংগে খোলামনে মিশছে, তাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে এসেছে এবং তাদের সংগে আপনজনের মতো ব্যবহার করছে—এমন ভদ্র-শ্রেণীর সাক্ষাৎ দর্শন তাদের জীবনে এই প্রথম। সমাজে নিষ্ঠুরভাবে অবহেলিত তারা—তাদের মধ্যে আমাদের উপস্থিতি, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তারা। আমাদের জন্য যা কিছু করা দরকার তাই করতে তারা প্রস্তুত, এই তাদের অন্তরের অভিলাষ। নিজেরা তারা প্রায় অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। নগ্নতা ঢাকার জন্য এক টুকরো ছেঁড়া-কাপড় যাদের সম্বল, তারাই দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠল—কিভাবে, কোথায়, আমরা একটু আরামে সেই রাত্রিটা ঘুমাতে পারব! সত্যি কথা বলতে কি, তখনো পর্যন্ত, কিছুই আমরা তাদের জন্য করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এই যে তাদের

সংগে সমব্যথীর মতো ব্যবহার করছি—সেটাই যেন তাদের আস্থা, তাদের ভালবাসা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট। সারা জীবন ধরে যে মানুষগুলো শুধু অবজ্ঞা পেয়ে এসেছে, অপমান-সূচক ব্যবহার পেয়ে এসেছে, তারাই আজ সামান্যতম মানবিক সমমর্মিতার স্পর্শ পেয়ে যেন জীবন ফিরে পেয়েছে। আনন্দে, গর্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তারা।

খানা-বানানোর বন্দোবস্ত চলতে চলতে বিকেল তিনটে বেজে গেল। ইতিমধ্যে অনেক ওয়ারলি এসে জমায়েত হয়েছে। দূরে দূরে যাদের বাড়ি, তারা তখনো এক এক করে আসছে, সমস্ত স্কুল-বাড়িটা ভরে গেল—একটা বহু বৈচিত্র্যময় সমাবেশ ঘটল। কারো কোমরে শুধু লাঙ্গোটি, কারো কারো গায়ে আছে মলিন, কাজ-করা-কালো রং-এর জ্যাকেট, কারো মাথায় চৌকো রুমালের মতো কাপড়-বাঁধা, কারোর মাথায় লম্বা লম্বা চুল গিঁট দিয়ে বাঁধা। বিড়ি ধরানোর জন্য একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো হাতে হাতে ফিরছে, কেউ কেউ চকমকি পাথরও ব্যবহার করছে।

জমিদারের প্রথম পশ্চাদপসরণ

শুরুতেই কমরেড দলভি দেওয়ালে পিন দিয়ে 'লাল ঝাণ্ডা' টাঙিয়ে দিল, তারপর ছোট্ট বক্তব্য রাখল। তার শেষ হওয়ার পর শুরু করলাম আমি। সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করলাম—বেগার প্রথা—"ভেটি ও বেগার (Vethi and Begar) কেন বে-আইনী। বোঝাতে চেষ্টা করলাম—যেন কেউ বিনা মাইনেতে, বিনা পারিশ্রমিকে জমিদারের কাজ না করে। জমিদার কীভাবে বিভিন্ন উপায়ে অত্যাচার নিপীড়ন চালাচ্ছে তাদের উপর, তারা মুখ বুঝে সেই যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে—এ সব বর্ণনা করলাম ; ভরসা দিলাম সমস্ত-রকমের শোষণ আর নিপীড়নের অবসান ঘটাতে 'লাল ঝাণ্ডা' তাদের পাশে থেকে সাহায্য করবে. ওয়ারলিরা আমায় ভাষণ শেষ করতে দিল না, তার আগেই একের পর এক দাঁড়িয়ে উঠে তিক্তকণ্ঠে বলতে লাগল—লাঞ্ছনা আর অত্যাচারের কাহিনী, দুঃখ-যন্ত্রনার ইতিহাস, আর ক্রমবর্ধমান হতাশা ও অসহায়তার কথা। বাকা স্রোত বইছে—যেন বাঁধ ভেঙে গেছে, গোলমাল, চিৎকার ক্রমশ বেড়েই চলল। রাত্রিটা গ্রামেই কাটাবো তাদের সংগে এ কথা জানতে পেরেই তারা আরও উৎসাহিত হয়ে তীব্র আবেগের তরঙ্গ লহরী সৃষ্টি করে হৃদয়-দুয়ার মুক্ত করে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ডালি উজাড় করে দিল। কিছুক্ষণ পরে একজন বলল, "বহিনজী, পুরানো কাহিনী কী আর বলবো, আজকের ঘটনায় আসা যাক্। এখনো পর্যন্ত আমাদের কেউ কেউ জমিদারের বাড়িতে গরুর গাড়ি নিয়ে বসে

আছে। বেগারে কাজে লাগিয়েছে, সেই জন্য তাদের এখানে আসতে দেয়নি। সেই ব্যাপারে কিছু তো করুন ?"

যারা এখনো সেখানে আছে, এ সংবাদ আমাদের কাছে পাঠিয়েছে তারাই। কয়েকজন ওয়ারলিকে সংগে নিয়ে তৎক্ষণাৎ কমরেড দলভি জমিদারের খামার-বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল। জমিদার নিজে উপস্থিত রয়েছে—গাড়ির ব্যবস্থা ঠিক্ ঠাক্ করতে আর খামারের কাজ দেখাশুনা করতে। কমরেড দলভি জমিদারকে বাইরে আসতে অনুরোধ জানালো, কিন্তু তিনি আসতে অস্বীকার করলেন তার পরিবর্তে কমরেড দলভি ও অন্যান্যদের ভিতরে আসতে বললেন। এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করার জন্য ওয়ারলিরা কমরেড দলভিকে আগেভাগেই সতর্ক করে দিয়েছিল। কারণ তাদের বহু অভিজ্ঞতা আছে যে, ভিতরে জমিদারের অঙ্গনে ঢুকলেই প্রহারের ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং কমরেড দলভি জমিদার-কক্ষে প্রবেশের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বাইরেই থাকল, অথচ জমিদার বাইরে না এসে ভিতরেই থেকে গেলেন।

অপেক্ষমান গরুর গাড়িগুলোতে জ্বালানি-কাঠ বোঝাই করা হয়েছে, বেগার কাজের অংগ হিসেবে কাঠগুলো কেটে, ভেঙে টুকরো টুকরো করেছে ওয়ারলিরাই। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়, তাই দেখার জন্য গাড়োয়ানরাও অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—সেখান থেকে পাঁচ-ছ' মাইল দূরে খাত্তলওয়াড় গ্রামে জ্বালানি-কাঠ নিয়ে যেতে হবে এবং খালাস করে জমিদার বাড়িতে ভালো করে সাজিয়ে রেখে, তারপর খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে আসবে। সমস্ত কাজ ভেটি দিয়ে করানো যাবে। কমরেড দলভি তাদের যেতে নিষেধ করল এবং জমিদারকে সংবাদ পাঠাতে বলল, যে মাল বহনের জন্য যদি ভাড়া দেয়, তবেই তার মাল নিয়ে যাবে। প্রত্যুত্তর এল জমিদার-পক্ষ থেকে গরুর গাড়ির জন্য কোন ভাড়া দেওয়া হবে না। কমরেড দলভি তখন গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে বাড়ি চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল তাদের। এ সব কাজের পর কমরেড দলভি ও তার সংগীরা যারা স্কুল থেকে এসেছিল সবাই আবার স্কুলে ফিরে এল। দু-তিন জন গাড়োয়ান খালি গাড়িগুলো নিয়ে বাড়ি চলে গেল। বাকিরা সবাই তাদের কার্যাবলীর প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে ভেতরে ভেতরে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিল—তাই পরবর্তী ঘটনাস্রোত কোন দিকে যায় তা দেখার জন্য স্কুল বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। কেউ কেউ দোলাচিত্ত বৃত্তি হয়ে পড়ল। কেউ বা শংকিত। জীবনে এই প্রথম তারা জমিদারের আদেশ অমান্য করল। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, আমরা সেখানে ছিলাম বলেই—এমন দুঃসাহসী কাজ তারা করতে পারল।

তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে কমরেড দলভির প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানানো হল। সবাই জানতে চাইল, কি ঘটল সেখানে, কমরেড দলভি যখন ঘটনাবলী বিস্তৃত ব্যাখ্যায় ব্যস্ত, এমন সময় একটা ছোট্ট ছেলে দৌড়ে এসে সংবাদ দিল যে, জমিদার তার ঘোড়ার গাড়িতে করে স্কুলের দিকেই আসছে, যাদের ভয় খুব বেশি তাদের মধ্যে কয়েকজন কাঁপতে কাঁপতে চলে যেতে চাইল। যখন আমরা তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছি, সাহস দিচ্ছি, কয়েকজন দেখতে পেল জমিদারের টাংগাগাড়ি তীব্র গতিতে স্কুল-বাড়ি পার হয়ে চলে গেল। তাদের আশংকা ছিল নিশ্চয়ই একটা গুরুতর অঘটন ঘটে যাবে, অন্তঃপক্ষে সেই চিরাচরিত প্রথায় গালমন্দ ও প্রহার পর্ব তো আছেই। জমিদারের মোকাবিলা আমরা করতে পারব, না, হার স্বীকার করতে হবে—তাই দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। বিনা বাধায়, বিনা যুদ্ধে জমিদারকে ঢুকতে দেওয়া হবে, এমন ঘটনা দেখার জন্য নিশ্চয়ই তারা প্রস্তুত ছিল না। বিশ্বাসই করতে পারল না যে, জমিদার সত্যিই সেখান থেকে পালিয়েছে। জীবনে এ এক অভূত-পূর্ব অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বিস্ময়ে যেন মূক হয়ে গেছে সব। অবিশ্বাস্য ঘটনা। তারপর, হঠাৎ আনন্দের বিপুল তরঙ্গে ভেসে গেল সবাই, সীমাহীন সেই আনন্দস্রোত। উদ্ভিন্ন-যৌবন ছেলেরা আর বাচ্চারা তো পাঠশালার বাইরে এসে খুশিতে চীৎকার করতে করতে নাচতে শুরু করে দিল। বয়োবৃদ্ধরা হাসি-ভরা চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল—দৃষ্টিতে তাদের নতুন আলোর ঝলকানি।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলতে দিলাম—আনন্দোচ্ছ্বাসটা একটু থিতিয়ে আসুক। তারপর সেই সুযোগে যথাসাধ্য সহজ-সরল করে, তাদের কাছে বিশ্লেষণ করলাম—সেদিনের ঘটনার বিশেষ আইনগত দিকটির কথা। বারবার বোঝালাম যে বেগার-প্রথা বেআইনী এবং এভাবে শোষিত হওয়ার ব্যাপারটা মোটেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। পরিবেশটা সুদীর্ঘ ভাষণের বিন্দুমাত্র উপযোগী নয়, তাই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করলাম। জমিদারের এহেন পশ্চাদপসরণে সবাই তখন বিজয়-তরঙ্গে দোল খাচ্ছে। অনেক কিছু বলার মতো স্তূপীকৃত হয়ে আছে মনের মধ্যে, বলতে চায় সব। জমিদারের উপর দিয়ে এক প্রস্থ বিজয় অভিযান চালিয়ে দিয়ে তারা শিশুসুলভ আনন্দে মেতে উঠল। সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য তখনো ঠিক তারা ধরতে পারেনি। একজন বলে উঠল, "এই ব্যাটা জমিদার, চিরটা কাল মদমত্ত আচরণ করে এসেছে, কিন্তু আজ দেখ কেমন চুপিসারে কেটে পড়ল।" আর একজন বলল, "কই, আজ তো রাগে গোঁ গোঁ করতে বা গালিগালাজ করতে মোটেই শুনলাম না, লজ্জায় ছুটে পালাতেই তারা মহাব্যস্ত।" এই কথায় সবাই উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ল।

হট্টগোল শুরু করে দিল, আর পুনরায় জমিদারের পলায়ন-দৃশ্যের কৌতুক অভিনয় করতে লাগল। তাদের আনন্দের সংক্রামক টানে পড়ে আমরাও তাদের শরিক না হয়ে পারলাম না।

বাস্তবিক পক্ষে, পুরো ঘটনাটা খুবই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। তাৎপর্য শুধু এই যে, এর ফলে ওয়ারলিদের মনের মধ্যে দৃঢ় আস্থার সঞ্চার হল। কারণ তখনো পর্যন্ত তাদের ধারণা ছিল যে, জমিদারকে কেউ কোন দিন তাচ্ছিল্যভাবে উড়িয়ে দিতে পারে না, জমিদার-প্রদত্ত শাস্তি-দণ্ড থেকে কেউই মুক্তি দিতে পারে না। ঘটনাটা এই জন্যেই গুরুত্বসম্পন্ন যে, এর দ্বারা ওয়ারলিদের আস্থা অর্জনের সূত্র সৃষ্ট হল। তারা ভেবেছিল যে, নিশ্চয়ই আমাদের কাছে কোন বিশেষ শক্তিশালী আইন আছে, যার দ্বারা স্বয়ং ভূস্বামী মহারাজেরও লেজ মুচড়ে দেওয়া যায়। যে আইনের দ্বারা আমরা ঘটনাটাকে নিয়ন্ত্রিত করলাম বা যে আইন প্রয়োগ করলাম সেটা যে দেশেরই আইন— এ কথাটা তারা বুঝতে পারল না। তাদের রাজনৈতিক চেতনার অগ্রগতি যে পর্যায়ে, তাতে করে ঘটনাটার আইনগত তাৎপর্য তাদের বিশ্বাস করানোর প্রচেষ্টা একেবারে নিরর্থক। কারণ, তাদের অভিজ্ঞতা যে অন্য রকম বলে! শুধু একটা জিনিস তারা নিশ্চিত করে বুঝতে পারল যে, 'লাল ঝাণ্ডা' জমিদারের মনেও আইনের আতংক সৃষ্টি করতে পারে এবং তাকেও পিছু হটতে বাধ্য করানোর ক্ষমতা রাখে। এর বাইরে কিছু বোঝার মতো সামর্থ্য তাদের নাই, আর বোঝার আগ্রহও নাই। বরং সেই মুহূর্তে তারা বার বার জমিদারের পরাজয়ের কাহিনী রোমন্থনে আরও বেশি বেশি করে বেশ স্বচ্ছন্দেই মগ্ন হয়ে পড়ছিল। এই করতে করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল আর আমরাও বহুপ্রতীক্ষিত ভোজন-পর্বের জন্য গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম।

বড় 'পলাশ' (palas) পাতা বিছিয়ে তার উপর খানা সাজানো হয়েছে— তাতে ছিল মোটা দানার লালচে চালের ভাত, লাল লংকা, লবণ আর কাঁচা আমকে ছোট ছোট করে কুঁচিয়ে তাই দিয়ে তৈরি চাটনি। ঘন ডাল তখনো উনুনে অল্পে অল্পে ফুটছে। আমরা অতিথি বলে আমাদের বসতে দেওয়া হয়েছে চওড়া কাঠের পিঁড়িতে। আমাদের জন্যে কী করবে আর কী না করবে, এই নিয়েই তাদের নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি লেগে গেল। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করার জন্য উদ্‌গ্রীব। কেউ হাত ধোয়ার জন্য হাতে জল ঢেলে দিল, কেউ বা বসার পিঁড়িটার আবার ধুলো ঝেড়ে দিল, অন্যেরা খাবার দিচ্ছে, এটা সেটা বেশি বেশি করে খাওয়ার জন্য অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল। সেই সকালে স্টেশনে সামান্য কিছু খেয়েছিলাম, তারপর থেকে

এই সন্ধ্যা পর্যন্ত খাদ্যবস্তু বলে কিছুই প্রায় পেটে পড়েনি, প্রচন্ড খিদেও লেগেছিল। পরিবেশটা তখন মোটামুটি আনন্দ আর উৎসাহে ভরপুর, বিরাট যেন একটা কিছু লাভ করা গেছে। এই আনন্দ-স্পর্শে আমরাও মেতে উঠেছিলাম। সত্যিই একেবারে ভরপেট খানা খেলাম। আজ পর্যন্ত সেই খানার স্বাদ যেন মুখে লেগে আছে, এখনো ভুলতে পারিনি। মনে হচ্ছিল ইতিপূর্বে যে সব খানা খেয়েছি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটা মিষ্টি-স্বাদ, কেমন নতুন ধরনের রাজকীয় আস্বাদ।

আমাদের আহার পর্বের পর অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ওয়ারলিরা প্রত্যেকেই একটু একটু করে ভাগ করে খেল। আমাদের অতিথি সেবকের বাড়ির বাইরে চারপায়া ফেলে বসে পড়লাম আমরা। সচরাচর কোন ওয়ারলির ঘরের ভিতরে ঘুমানোর ব্যাপারটা আমি এড়িয়ে যেতে চাইতাম। কারণ ঘরের মধ্যে যে ছাগল বা পশু-পক্ষী থাকে তার গন্ধে ঘুম আসতে চায় না, জাগিয়ে রাখে সারারাত। আবার সবাই মিলে সেখানে জমায়েত হল। মনের মধ্যে তাদের অনেক প্রশ্ন, জানতে চায় সব; অনেক না-বলা একান্ত গোপন কথা, সব বলতে চায়। দিনের বেলার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের থেকেও সেই রাত্রির সাধারণ মামুলি কথোপকথন আরও মূল্যবান। রাত্রিতে আলাপ-আলোচনার সময় পুনরায় আমি জোর দিয়ে, গুরুত্ব দিয়ে বললাম—তারা যেন বিনে-পয়সায় জমিদারের কোন রকম কাজকর্ম না করে। আর বললাম—জমিদার যদি একজনকেও মারধোর করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে দৈহিকভাবে বাধা দেওয়ার অধিকার তাদেরও আছে, তা সেই জমিদার যত বড় মাতব্বর বা গণ্যমান্য তালেবর লোক হোক না কেন। আঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার সকলের আছে, তাদেরও আছে। আঘাত করতে এলে তাকে আটক করে পুলিসে দেওয়ার অধিকার তাদের আছে, তাতে বে-আইনী কিছুই নেই। এই সব করার পর ব্যাপারটা তারা আমাদেরও জানাতে পারে। জারী সম্মেলনে তাদের প্রত্যেকের যাওয়া উচিত। কারণ ওয়ারলিদের একতাবদ্ধ করার জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনের মধ্যে তখন তাদের যে সন্দেহটা সবচেয়ে তুঙ্গে, তা হচ্ছে আমি চলে যাওয়ার পর তাদের কপালে কী ঘটবে? জমিদার যদি ভয় দেখাতে শুরু করে, মারধোর করে, তখন তারা কী করতে পারে, তাদের কী করতে হবে? যে মারতে আসবে তার হাত পাকড়ে তাকে বাধা দেবে—এ কথা মুখে বলা খুবই সহজ ব্যাপার; কিন্তু শত-শতাব্দী ধরে জমিদারী নিগ্রহের কাছে যারা মাথা নত করে এসেছে, তারা হঠাৎ এইভাবে বাধা দেওয়ার সাহস পাবে কোথা থেকে? যখন বললাম যে, অন্ততঃপক্ষে আরও কয়েকটা দিন আমরা এদিক ওদিক আশপাশের গ্রামে থাকছি, তখন তারা আশ্বস্ত হল।

তারা বলে উঠল "বহিনজী লড়াই করার যথেষ্ট সাহস আমাদের দিয়েছেন। এবার বেগার-প্রথার কবর আমরা দেবোই।"

আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে তারা কী সব কথাবার্তা বলে চলল। পরের দিন দুজন লোক আমাদের সংগে করে পাশের গ্রামে পৌঁছে দিয়ে গেল। বিদায়কালে বাকিরা সব দৃষ্টির বাইরে আমরা চলে না-আসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে লাগল।

ডোংগরীতে আমাদের অবস্থানের পর থেকে কমরেড দলভি ও আমি প্রায়ই কোন সংগী না নিয়েই ঘুরে বেড়াতাম। কারণ ঐ এলাকায় আমাদের উপস্থিতির সংবাদ খুব দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পথে কোন ওয়ারলির সংগে দেখা হলে সে যেন সহজাত প্রবৃত্তির বশেই চিনতে পারত— "আমরা কে?" তারপর একবার যদি নিশ্চিত করে আমাদের চিনতে পারে, তাহলে যেখানেই আমরা যেতে চাইতাম মহানন্দে আমাদের সব পথঘাট দেখিয়ে দিত। সাধারণতঃ খুব ভোরের বেলায় অথবা সন্ধ্যার দিকে কোন গ্রাম থেকে আমরা বেরিয়ে পড়তাম। সকালে বেরুলে গ্রামের সবাই কাজে চলে যাওয়ার আগেই আমরা সে গ্রামে পৌঁছে যেতাম, সকলকে ডাকতাম, তারপর বৈঠক করে সন্ধ্যায় আবার সেখান থেকে পাশের গ্রামে চলে আসতাম। কিন্তু একবার যদি কোন গ্রাম থেকে ফিরে আসতে দেরী হয়ে যেত অথবা খুব সকালেই যদি বেরুতে না পারতাম তাহলে অন্য গ্রামে গিয়ে দেখতাম গ্রাম শূন্য—সবাই তখন কাজে বেরিয়ে গেছে।

কাজলীতে স্নান

সেই নির্জন, জনবিরল গ্রামে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে কোন রকম করে সময় কাটানোর চেষ্টায় খুবই হতাশ বোধ করতাম; সামান্য কিছু খেয়ে যে নিজেকে তাজা করে তুলব, তার উপায় নাই, এমন কি এক কাপ চা পাওয়াও দুষ্কর। এমত অবস্থায় গ্রামবাসীরা কাজ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে বসে অলসভাবে আঙুল নিয়ে খেলা করা বা আঙুল মট্‌কে মট্‌কে সময় কাটানো ছাড়া অন্য কিছু করার মতো থাকত না। শহরে কারুর জন্য প্রতীক্ষা করার বেলায় সময় কাটানো খুবই সহজ ব্যাপার। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই, ট্রানজিস্টার রেডিও, সামনে কাঁচ-দেওয়া শো-কেসে রুচিসম্মতভাবে সাজানো নানারকম সৌখীন জিনিস অথবা, চলমান জনতা— কত কি আছে আনন্দ বিধানের জন্য। কিন্তু এই ঝোপড়ির মধ্যে এক টুকরো কাগজ বা একটা ছোট্ট পেন্সিলের টুকরো পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাহলে সেখানে মনোরঞ্জনের আর কি-ই বা উপায় থাকতে পারে। দুপুরের

সূর্য মাথার উপর উঠলে ঘরের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। প্রাঙ্গণ থেকে উঠে কাছাকাছি কোন একটা ঘরের ঝুলন্ত পরচালার ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিতাম। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে আশপাশের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত রূপ একদৃষ্টে দেখতে দেখতে মনের নৈরাশ্য আর হতাশার ভাবটাকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম।

যদি একেবারে সকালেই বা সন্ধ্যায় কোন গ্রামে হাজির হতে পারতাম, তাহলে কিন্তু ঘটনাবলী সম্পূর্ণ অন্যরকম দাঁড়াত। তখন মনে হত, প্রকৃতি দেবী যেন আমাদের স্বাগত জানানোর সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে তার অসীম সৌন্দর্য-সম্ভার চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই প্রসংগে একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে যে. ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই কেন বই-পত্র, সংবাদপত্র নিয়ে বেরুতাম না। সত্যি কথা বলতে কি, শুধু এক কাপ চা-এর ওপর নির্ভর করে এক হাঁটু ধূলি-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ছ-সাত মাইল পদযাত্রার পর, অপর প্রান্তে পৌঁছে ধূলি-ধূসরিত দেহ নিয়ে কোন সমাচার পত্র পড়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও আর জাগত না। তা, যাই হোক, একটা সংবাদ-পত্র যদি সংগে নিতামও, তাতে হয়তো একদিনের মতো কাজ চলতে পারত, কিন্তু তারপর? আর বই-পত্রের কথা? তা সংগে নিলে তো পদযাত্রার শেষে মনে হত, এক টন ইট বয়ে নিয়ে এলাম। কারণ. ঐ সময়ে এক সংগে ছ-সাত মাইল হাঁটার অভ্যাস তখনো পর্যন্ত রপ্ত হয়ে ওঠেনি। মূল লক্ষ্য থাকত তখন শুধু কোনরকমে ধুলো আর প্যাচপেচে গরমের মধ্যে পরবর্তী বিশ্রামের জায়গায় গিয়ে পেঁছানো। নিজেদের জিনিসপত্র নিজেদেরই বইতে হত, তাতেই অস্বস্তি বোধ হত। কমরেড দলভির কাছে থাকত একটা কাপড়ের ব্যাগ, আর আমার কাছে একটা ছোট্ট স্যুটকেশ। আমাদের জিনিসপত্র কোনদিন ওয়ারলিদের বইতে দিতাম না, পাছে তারা ভাববার সুযোগ পায় যে, আমরাও জমিদারের মতই বেগার প্রথাকে চিরস্থায়ী করছি। স্বভাবতঃই, এই পরিস্থিতিতে মাল-পত্রের বোঝা যতদূর সম্ভব হাল্কা রাখারই চেষ্টা করতাম। সূর্য যখন খাড়া মাথার উপর উঠে তীব্র কিরণ ছড়াত, তখন সেই ক্ষমাহীন রৌদ্রকিরণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাথার উপর স্যুটকেশটা রেখে হাঁটতাম। এই অবস্থায়, নিতান্ত জরুরী জিনিসপত্র ছাড়া অতিরিক্ত বোঝার মতো বই-পত্তর ইত্যাদি কী করে নিয়ে যাওয়া যায়!

কাজলী গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় আমাদের একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। সূর্য মাথার উপর উঠছে এবং ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান উত্তাপের প্রখরতা তীব্রতর হয়ে উঠছে। কপালে কষ্ট আরও বাড়ল—আমরা পথ ভুল করলাম, যাত্রাপথ আরও কয়েক মাইল দীর্ঘতর করে ফেললাম। হাঁটছি তো

হাঁটছি, যাত্রাপথে পড়ল একটা বিরাট বাড়ি, দেখে মনে হল বাড়িটা করতে বেশ খরচ হয়েছে। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম —বাড়িটা একজন জমিদারের, আর সে সময় তিনি বাড়িতে নেই। দেখলাম—চাকর-বাকররা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ-কর্ম করতেই ব্যস্ত। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার আশায় ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ওয়ারলি চাকররা খাওয়ার জল দিল। এমন কি একটু পরে দুধ-বিহীন চাও তৈরি করে নিয়ে এল। অনুমানে ধরে নিয়েছিল আমরা কে। তবুও কিন্তু, আমাদের যে চিনতে পেরেছে তার বিন্দুমাত্র চিহ্নও প্রকাশ করল না, ভয়ে আমাদের সংগে একটা কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল না। যাই হোক্, চা খেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম, গতি দ্রুততর হল, খুব শীগ্গিরই কাজলীতে এসে পেঁছালাম।

সেই সময়ে স্নান করার সমস্যাটা ছিল আমার বৃহত্তম সমস্যা। দুদিন পর একবার, কখনো বা টানা তিনদিন পরে স্নান করার সুযোগ ঘটত। এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত। কোন কোন ক্ষেত্রে চুলে চিরুনিও পড়ত না। যখন নিজের ঘিনঘিনে নোংরা ভাবটা আর কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না, তখন এক মগ জল নিয়ে কোন রকমে হাত, পা, মুখ ধুয়ে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সহজাত প্রবৃত্তিটাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা পেতাম। দু-তিন দিন ধরে গ্রামের চারদিকে পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘোরার প. এমনভাবে ধূলিধূসরিত রুক্ষমূর্তি হয়ে উঠতাম যে, উঁচু শ্রেণীর কোন আত্মাভিমানী মানুষ হয়তো আমাদের কাছাকাছি কোন জায়গায় আসতেও লজ্জা পেতেন। অবশ্য এমন নয় যে স্নান করলে, চুল আঁচড়ে নিলে, মারাত্মক একটা ফারাক্ পড়বে, ওতে কিছু যেত-আসত না, কেননা পরের দিনের দীর্ঘ ভ্রমণেই আবার গোটা দেহটা ঘামে ভিজে উঠত আর চুলের ওপর কয়েক পর্দা ধুলোর আস্তরণ পড়ত। সেদিন পথ ভুল করে আমাদের ভ্রমণপথ আরো দীর্ঘতর, আরো ধূলিমলিন আর অন্যান্য বারের থেকে আরো বেশী ক্লান্তিকর হয়ে পড়ল। তাই মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলাম—যে কোন উপায়েই হোক্, কাজলীতে স্নান করতেই হবে। সেই স্নান-পর্বের স্মৃতি আজও পর্যন্ত জ্বলজ্বল করছে—যেন মাত্র গতকালকার ঘটনা।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটায় কাজলী গ্রামের একটা পাড়ায় গিয়ে পেঁছালাম। দরদর্ করে ঘাম ঝরছে, হাতের চামড়ায় এমন পুরু হয়ে ময়লা জমেছে যে, একটু হাত দিয়ে তার উপর ঘষলেই কালো ছোট ছোট গোলার মতো বেরিয়ে আসছে, শাড়ির প্রান্তে ধুলো এমনভাবে ঢুকে পড়েছে যে, কোন মতে ঝেড়ে নিয়ে মুখের ঘামটা একটু মুছে নেবো তারও সম্ভাবনা নেই, কারণ তা এমন চটচটে হয়ে গেছে যে ঘাম শুকিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। কাপড় জামা থেকে অনেকক্ষণের জমে যাওয়া ঘামের বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে,

শরীর থেকে যেন গরম ভাপ উঠছে আর এমন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি যে, মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে পা দুটো যেন খসে পড়ে যাবে। মন মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে, দেহ অবসাদে ভরে গেছে, সামর্থের একেবারে শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম যদি কোন ঝোপড়ি থেকে কোন মেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে বা চোখে পড়ে। একজনকে দেখতে পাওয়ার সংগে সংগেই তাকে বলে ফেললাম, "আমি স্নান করতে চাই"; মেয়েটি বলল, "কাছেই এক জায়গায় জল আছে দিদি, চলুন সেখানে।" স্বভাবতঃই সে ধরে নিয়েছিল যে স্নানের জন্য আমার অনেক জলের দরকার, কয়েক পাত্র জলে কুলোবে না। সুতরাং সেখান থেকে জল এনে দেওয়ার পরিবর্তে একেবারে জলাধারে যাওয়ারই ইঙ্গিত করল। তক্ষুণি আবার বেরিয়ে পড়লাম, সামনে চলেছে সেই মেয়েটি, আর আমি অধীর আগ্রহে ঠিক পিছনে পিছনে চলেছি, হাতে রয়েছে ধোয়া কাপড়-জামা, তোয়ালে আর সাবান। কথাবার্তা বলতে বলতে দু'তিন ফার্লং হেঁটে আমরা জলের কাছে হাজির হলাম। ও! জলের কথা বললাম না কি? হ্যাঁ জলই দেখলাম বটে। অনেকটা জায়গা জুড়ে এতো কাদাভর্তি আবদ্ধ জল যে ওপরটা সবুজ শ্যাওলায় পুরো ঢেকে গেছে। বোকার মতো কত আশাই না মনের মধ্যে পোষণ করছিলাম—পর্যাপ্ত, স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ ধরে পরিষ্কার করে স্নান করব! চোখে প্রায় জল এসে গেল, সেই সবুজ জলাধারটার দিকে হাঁ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। তবুও অবিশ্বাসীর মতো মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি গো! এখানে এই জলেই আমাকে স্নান করতে হবে নাকি? ঠিক বলছ তো?" উত্তরে, ঘাড় নাড়ল সে, তারপর নীরবে একটা ছোট্ট লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে জলের ওপরের শ্যাওলার আস্তরণটা সরাতে লাগল। তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সে ধরেই নিয়েছিল যে, কাদামাখা শ্যাওলার পর্দাটা সরিয়ে দিলেই নীচে স্বচ্ছ জল পাওয়া যাবে, আর সেই জল পাত্রে ভরে নেবে। আমি ভয়ে তীব্রভাবে শিউরে উঠলাম। স্নান তো দূরের কথা, সেই জল স্পর্শ করার কল্পনাও করতে পারলাম না। যতই হোক—সুসজ্জিত, সুপ্রশস্ত স্নানাগারে পর্যাপ্ত গরম জলে স্নান করা সারা জীবনের অভ্যাস। আমার ইতস্ততঃ ভাবটা মেয়েটি বুঝতে পারল, আর একটা বিকল্প প্রস্তাব দিল। ঐ জলাশয় থেকে কিছুটা দূরে, একটু নীচে সমতলভূমিতে আর একটা গর্ত আছে। এই জল চুইয়ে চুইয়ে ঐ গর্তে জমা হচ্ছে। এইভাবে ফিল্টার হয়ে যাওয়ায় সেই জলটা একটু পরিষ্কার। সেখানেই স্নান করার কথা মেয়েটি বলল। একটু একটু করে জল তুলে পাত্রটা ভর্তি করতে অনেক সময় লাগল, রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মেয়েটি জল ভরার সময় আমরা অনর্গল কথা বলে চললাম। শেষকালে পাত্রটা

ভর্তি হল। গায়ে, মাথায় জল ঢালার জন্য সংগে কোন মগটগ নিয়ে আসিনি। একটা পাথরের ওপর হেঁট হয়ে বসে, একটুখানি জল পাত্র থেকে নিয়ে সাবান লাগালাম। তারপর ঝুঁকে পড়ে শরীরটাকে প্রায় দুভাঁজ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর মেয়েটি পাত্র থেকে একটু একটু করে জল গায়ে ঢালতে লাগল। এইভাবে তিন দিনের সঞ্চিত ঘাম আর ময়লা এক পাত্র জলেই ধুয়ে ফেলা হল। পরিষ্কার, ধোয়া জামা-কাপড় পরলাম। নিজেকে বেশ তাজা লাগল—মনে হল আবার যেন পৃথিবীর অগ্রভাগে এসে দাঁড়িয়েছি। সেখান থেকে ঠিক চলে আসার সময় মেয়েটি সেই জলাশয়ের জলের উপর থেকে ভাসমান শ্যাওলার পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে নীচের জল পাত্রে ভরে নিল। আমার রোমকূপগুলো আবার খাড়া হয়ে উঠল। কিন্তু এই হতভাগ্য মানুষগুলো শিউরে উঠতেও জানে না। আর জেনেও কোন উপায় নেই, পাড়ার কাছাকাছি অন্য কোন জলাধার নেই। শুধুমাত্র পানীয় হিসাবে ছাড়া, অন্য যে কোন প্রয়োজনেই ঐ জলই তারা বংশপরম্পরা ধরে ব্যবহার করে আসছে। দূরের এক ঝরনা থেকে পানীয় জল নিয়ে আসতে হত।

কন্দমূলের আহার্য

স্নান সেরে যখন ফিরলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। অভিজ্ঞতা থেকেই জানতাম যে, দুপুরের আহার্য প্রস্তুত হতে অনেক সময় লাগবে। কারণ প্রস্তুত-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেই ধান কুটে চাল তৈরী করার কাজ থেকে, আবার কোন কোন সময় অতিথিসেবকের বাড়িতে ধান না থাকলে, ধার করেও আনতে হত। ঘরের মধ্যে যখন ঢুকলাম, দেখি কতগুলো ছেলেমেয়ে মাটির পাত্র থেকে ঝোলের মতো সাদা তরল মাড় দারুণ খিদেয় গোগ্রাসে গিলছে। অবিশ্বাস্য মনে হয়—এই হচ্ছে এদের দুপুরের খাওয়া। আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছি সেই বাড়িতে মধ্যাহ্নকালীন আহার্যের মধ্যে থাকে—ভাত, ডাল, গৃহ-প্রস্তুত খাঁটি গাওয়া ঘি, লেবুর রস, দু রকমের সবজি, চাপাটি, তার সংগে থাকে কলা বা দুধ, চিনি দিয়ে তৈরি বিশেষ মিষ্টি-ভোজ্য, ফলের জ্যাম, পাঁপর জাতীয় কিছু ভাজা, আর এক বাটি ভাল দই। এই ধরনের আহার্য বস্তু দিয়ে উদরপূর্তি করতে শৈশবকাল থেকেই যে অভ্যস্ত, যার কাছে ভাত আর দই ছাড়া কোন দিন কোন খাদ্য-তালিকা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনেই হয় না, ভাত আর দই দিয়ে খাওয়া শেষ করে যে—সেই আমি কী করে ভাবতে পারি—ঐ যে ছেলেমেয়েগুলো মাড় জাতীয় তরল পদার্থটি যার নাম 'আম্বিল' সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় চেটেপুটে খেয়ে গেল—তাকেই বলে 'লাঞ্চ' অর্থাৎ দুপুরের প্রধান খাদ্য। শব্দটা তাহলে নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া অন্য

কিছুই নয়। এই দৃশ্য দেখে মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'আম্বিল' (লপ্‌সী) সাধারণত তৈরি হয় রাগি (Raggy) বা বারি (Vari) নামক নিকৃষ্ট মানের চালের দানা থেকে। এই চাল আটার মতো করে গুঁড়িয়ে জলে ভিজিয়ে মাটির পাত্রে রাতভোর ফেলে রাখা হয়। পরদিন সকালের মধ্যেই ঐ জলে ভেজা গুঁড়ো গেঁজে ওঠে। তাতে আরও জল দিয়ে বেশ পাতলা মসৃণ করে নেয়, গুঁড়ো যেন কোথাও এক জায়গায় জমে তাল বা গুটলি মতো হয়ে না থাকে! তারপর সেটাকে ফুটিয়ে সিদ্ধ করে নিয়ে মাটির পাত্রে ঢেলে রেখে দেওয়া হয়। দুপুরের কাজ সেরে যখন সবাই বাড়ি ফেরে, তখন গৃহিণী ঐ আম্বিল বাড়ির পুরুষ ও ছেলেমেয়েদের খেতে দেয়। যে হাতায় করে পরিবেশন করে, সেটা তৈরি করেছে নারকেলের আধখানা মালার মধ্যে একটা কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে দিয়ে—সেটা হাতলের কাজ করে। ছোট ছোট মাটির থালায় তারা খায়। এই হচ্ছে তাদের দুপুরের আহার। প্রায়ই দেখেছি—ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েগুলো তাদের 'আম্বিলের' থালাগুলো চেটেপুটে খেয়ে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলেছে। আবার অন্যত্র শহরে, এও দেখেছি যে, অতি দয়াবতী মায়েরা জোর করে তাদের বাচ্চাদের গলার মধ্যে দুধ বা মিষ্টি স্বাদের বলকারক পানীয় ঢেলে দিচ্ছে। হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। দারিদ্র্যের সেই ঘৃণ্য, বীভৎস চেহারা দেখে, সেই দৃশ্য থেকে দৃষ্টি দূরে সরিয়ে রাখার জন্য জোর করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

আস্বাদ করার জন্য পাতার ঠোঙায় করে অল্প একটু আম্বিল নিলাম। জিগ্যেস করলাম, "এতে কি সত্যিই তোমাদের খিদে মেটে?" উত্তর দিল, "পেট যে এতে ভরে না, একথা বলে লাভ কি? এমন সময় আসে যখন এই আম্বিলও পেটে দেওয়ার মতো যথেষ্ট জোটে না। তখন গাছের পাতা ও শিকড় খেয়ে বেঁচে থাকি।"

"কি! সত্যিই তোমরা গাছের পাতা খাও না কি?"

"হ্যাঁ। যেমন ধরুন, আম্বাড়ি পাতা [এক ধরনের টক-স্বাদের পাতা]। তেঁতুল পাতা। যখন গাছে আম হয়, তখন কাঁচা আম খাই। তা না হলে বোর [এক ধরনের রসাল ফল], মহুয়ার ফুল, আরবি [arbi] শিকড়—যা পাই তাই দিয়ে পেট ভরাই।"

অভাবের দিনে তাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান হল "কন্দ" নামের [ওল জাতীয়] এক ধরনের তিক্তস্বাদের শিকড়। সেগুলো পাহাড়ে জন্মায়। ওয়ার্লিরা এই কন্দের জন্য এদিক ওদিক লতার সন্ধান করে বেড়ায়। লতার [বেল] সন্ধান মিললে সেটাকে খুঁড়ে মোটা মোটা শিকড় বা মূলগুলো বের

করে ; দেখতে অনেকটা শকরকন্দ আলুর [মিষ্টি আলু] মতো। কোন কোন কন্দ বেশ বিশাল আকারের কিন্তু তার স্বাদ খুব তেতো। ওয়ারলিরা পাতলা পাতলা করে ওগুলো টুকরো করে কেটে কাপড় জড়িয়ে নদী বা ঝর্নার ধারে জলের মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দেয়। এতে করে তিক্ত স্বাদটা কিছুটা কমে যায়। তারপর টুকরোগুলো ভাল করে ছাই দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেয়। তারপর সিদ্ধ করে। যে জলে সিদ্ধ করা হল সেটা ফেলে দেয়—যাতে তিক্তস্বাদের স্পর্শটুকুও না থাকে। তারপর সেটাকে ভাল করে রান্না করে খায়। অধিকাংশ ওয়ারলির বাড়িতে এই তিক্ত 'কন্দমূল' দেখা যায়।

বর্ষাকালে সমস্ত পাড়ায় প্রচুর পরিমাণে আরবি [arbi] পাতা গজায়। বড় বড় রসালো আরবি পাতা দেখে শহরাগত অতিথিরা লালায়িত হয়ে পড়ত। আরবি পাতা মশলা দিয়ে ঠেসে ভিতরে ভরে আরবি-রোল বানানোর কল্পনায় মুখে তাদের জল এসে যেত। গ্রাম পরিক্রমাকালে, মাঝে মাঝে আমার কোন শহুরে বন্ধু সংগে এলে বলে উঠতো, "কী সুন্দর আরবি পাতা দেখ। বাড়ি ফেরার সময় কিছু সংগে নিয়ে যাব, অবশ্য দাম দিয়েই নিয়ে যাব।" আরবি পাতা সম্বন্ধে, তাদের মনযোগানো কপট প্রশংসায় ওয়ারলিরা খুব আনন্দিত হয়ে উঠত ; কিন্তু পয়সা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথায় কষ্ট পেত। চরম দৈন্য-দশা, তবুও কিন্তু এইভাবে কয়েকটা পয়সা রোজগার করার জন্য তাদের বিন্দু-মাত্র লোভ জাগত না। যে জিনিস উৎপাদনের জন্য তাদের মোটেই পয়সা লাগত না এমন বস্তুর জন্য অতিথিদের কাছ থেকে তারা পয়সা নেবে তেমন অর্থসর্বস্ব মানুষ তারা ছিল না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে—যারা অর্থদানের এমন সদাশয় প্রস্তাব দিতে পারেন, সেই অর্থ-লিপ্সু শহরবাসীদের জন্য আমি এক ধরনের অনুকম্পা বোধ করতাম।

ওয়ারলিরা আরবি পাতা বা ডাঁটা খাদ্য হিসাবে কখনো ব্যবহার করত না। আরবি পাতা থেকে সুস্বাদু তরকারি বা 'আরবি-রোল' বানানোর মাল-মশলা কোথায় পাবে তারা? তাদের রান্না করার জন্য বাড়িতে রান্নার তেল কখনো এক ফোঁটাও মিলত না। এমন কি আমাদের জন্য ডাল বানানোর সময়, আমরা যেমন মশলা ভেজে নিয়ে ডাল সাঁতলে নিই সুস্বাদু হবে বলে, তা তারা করত না। শুধু হলুদ, নুন আর লংকা দিয়ে ডাল তৈরী হ'ত। আরবি লতার মূলটুকুই তারা খেত। সেই জন্যই লতাগুলো তুলে আনত। তা, যদি কেউ শুধু পাতা বা ডাঁটা চায়, তো দিতে অসুবিধে কি? খুশী হয়েই দিত। ওয়ারলিদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অপরিচিত শহর-বন্ধুরা অবজ্ঞা-ভরে বলত, "কী অজ্ঞ দেখ! এত সুন্দর উপাদেয় সব্জিগুলো ফেলে দিচ্ছে!" আপাতঃদৃষ্টিতে যেটা অপচয় মনে হচ্ছে—তার পিছনে যে কারণ

আছে—তা তারা বুঝবে কি করে? বুঝতে গেলে তাদের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে নিজেদের মিশিয়ে দিতে হবে। জুতো যে পরে, সেই একমাত্র বলতে পারে কাঁটাটা কোথায় বিঁধছে?

মধ্যাহ্ন ভোজের আগের সময়টা নানান কথাবার্তায় কেটে গেল—যেমন ওদের খাদ্যাভ্যাস, উপবাস-অনশনের সংগে নিরন্তর সংগ্রাম, জারী সম্মেলন ইত্যাদি আরও অনেক কথা। আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় মোটা চালের গুঁড়ো থেকে তৈরী মোটা গরম গরম ভাজা পিঠে। খেতে বেশ ভালোই লাগলো। কিন্তু মনের মধ্যে, সংগে সংগে, একটা চিন্তা চোরের মতো চুপিসারে এসে আবার মিলিয়ে গেল—যদি একটু মাখন বা খাঁটি ঘি দেওয়া হতো তাহলে আরও সুস্বাদু লাগত! কিন্তু ঐ পরিবেশে এসব জিনিস অশ্রুতপূর্ব ভোজন-বিলাসিতার নামান্তর। তাই লাল লংকার চাটনি দিয়ে গরম গরম পিঠে সহ আহার-পর্ব শেষ করে তাড়াতাড়ি পরবর্তী গ্রামের পথে রওনা হলাম।

সাওয়াইতে ছুরির রুটি

সেদিন সাওয়াইতে অবস্থানের ইচ্ছা সত্যিই আমাদের ছিল না। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতেই বেশ রাত্রি হয়ে গেল। আর বেশ কয়েক মাইল হেঁটে আমরাও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সংগী পথপ্রদর্শক ওয়ারলিরা সে রাত্রিতে আর বেশি দূরে যেতে নিষেধ করল,—কারণ অত রাতে ওসব জায়গায় পায়ে হেঁটে যাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। ঠিক করলাম, সংগী ওয়ারলিদের কারুর কোনো পরিচিত লোকের বাড়িতে রাত্রিটা কাটাবো। আমাদের হঠাৎ উপস্থিতি তো অপ্রত্যাশিত! আমাদের হবু অতিথিসেবক তখন বাড়িতে ছিল না। অভ্যাস মতো বারান্দায় একটা চাটাই পেতে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর গৃহস্বামী ফিরল। সে আর আমাদের সংগী একজন ওয়ারলি নৈশ-ভোজনের ব্যবস্থাপনায় লেগে পড়ল। আরেকজন সাওয়াইতে আমাদের উপস্থিতির সংবাদ প্রচার করতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমাদের অতিথিসেবকের ঝোপড়িটা এত নীচু যে ঝুঁকে পড়ে দেহটাকে প্রায় দু-ভাঁজ করতে না পারলে ভিতরে যাওয়া সম্ভব নয়। বাইরে তাদের সংগে কিছুক্ষণ বার্তা বিনিময়ের পর ভিতরে ঢুকলাম। প্রথম যে কামরাটায় ঢুকলাম, সেটা খুবই সংকীর্ণ। একটা পরিষ্কার ঝকঝকে মাজা প্যানে করে আমাদের জন্য ভাত হচ্ছে। পাশে গৃহস্বামী দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছে। ভিতরের কামরায় ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলাম তা যেন ছুরির মতো মনটাকে চিরে ফালাফালা করে ফেলল। সেখানে বসে আছে গৃহস্বামীর

স্ত্রী, তাকে ঘিরে রয়েছে উলংগ, হাঁড়ির মতো পেট-সর্বস্ব তিনটে বাচ্চা। পাশে একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে আছে এক ধরনের তরল খাদ্যবস্তু ; এক মুঠো মোটা চাল, কোনরকমে এবড়ো-খেবড়ো করে কাটা কয়েক টুকরো পেঁয়াজ, সামান্য লবণ আর প্রচুর জল দিয়ে ফোটানো হয়েছে সেই খাদ্যবস্তু। মেয়েটি নারকেলের মালা দিয়ে তৈরী হাতায় করে পোড়া মাটির থালায় বাচ্চাগুলোকে ঐ খাদ্যবস্তু পরিবেশন করছে। এক থালা শেষ হলেই আবার থালা ভর্তি করে দিচেছ আর বাচ্চারা সর্বগ্রাসীর মতো চেটেপুটে খাচেছ। মাঝে মাঝে পেঁয়াজের টুকরো বা চালের দানা যদি পায় তাহলে বিশেষভাবে তার পরম আস্বাদ গ্রহণ করছে। পেটে যখন আর ধরল না, তখন থালা সরিয়ে দিয়ে যেখানে বসেছিল, সেখানেই কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল ; ধীরে ধীরে ঘুমিয়েও পড়ল। মাঝে মধ্যে কখনো-সখনো 'শুকনো মাছ' মিলে গেলে তারই মাংস ফুটিয়ে নিত যাতে সেটা আরও পুষ্টিকর হয়। বাচ্চারা যেটা খাচ্ছিল তার মধ্যে মাছ দেখতে পেলাম না। আমার উপস্থিতির জন্য মেয়েটি সংকুচিত হয়ে সেই-খানেই সেইভাবে বসে রইল। জিজ্ঞেস করলাম, "বাচ্চাদের পেট ভরল তো? তারা তো ঘুমিয়েই পড়ল।"

মেয়েটি বলল—"এইভাবে আধপেটা খেয়ে ওদের ঘুমানো অভ্যেস হয়ে গেছে। কী আর করবো ?"

আমি বললাম—"এই তো গেল রাত্রির খাওয়ার বহর! কাল দুপুরে কি হবে? 'আস্বিল' তো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও ?"

সে বলল—"কিছু ভুষি আছে। আজ সকালে ভুষির রুটি বানিয়েছিলাম, তার কয়েকটা আছে এখনো। কাল সকালে আর কয়েকটা বানিয়ে নেব।"

আমি একটা ভুষির রুটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

তাদের এই মর্মন্তুদ জীবনযাত্রা দেখে এমন বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে চোখের জল লুকোতে বাইরে চলে আসতে বাধ্য হলাম। ঐ এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর সময় প্রায়ই শুধু লবণ দিয়েই ভুষির রুটির টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাচ্চাদের চিবোতে দেখেছি। মনটা ফিরে গেল শৈশবের দিনগুলোতে। আমরা তখন টিনের পর টিন বিস্কুট আর চকোলেট নিয়ে ছোটাছুটি করতাম। কী নিষ্ঠুর অবিচার! আমরা তো সবাই মানুষ। এরা আমাদেরই লোক। একই দেশের মানুষ আমরা। কিন্তু কীরকম পৃথক দুনিয়ায় বাস করি। ভাই-এ ভাই-এ এত বৈষম্য থাকবে কেন ?

বেশ কিছুক্ষণ পরে, কমরেড দলভি ও আমি নৈশ ভোজনে বসলাম। গৃহস্বামী বা অন্য কোন ওয়ারলি আমাদের সংগে খেতে বসত না। এটা যেন

রুটিনের মত নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব সময়েই প্রথমে আমাদের খেতে দেওয়া হত; আমাদের শেষ হলে পর, যা কিছু অবশিষ্ট থাকত, নিজেরা সবাই মিলে তা ভাগ করে খেত। তারা যে পেট ভরে খেয়েছে সব, এ ভাবটা তারা সর্বদাই দেখাত। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে, ভরপেট খেতে পাওয়ার অধিকার যে তাদেরও আছে, এটা তারা বোধের মধ্যেই আনত না। আধ-পেটা খাওয়া যেন তাদের কাছে প্রকৃতিগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মোটা চালের ভাত বা ভুষির রুটি বা পাতলা মাড় বা ফেন, এমন কি আম্বিল—এসব সত্যিই পেট ভরে খেয়েছে, এমন কোনো ওয়ারলির সাক্ষাৎ আমরা কদাচিৎ পেয়েছি। আদিবাসী আন্দোলনের প্রারম্ভ পর্যায়ে, অনেক সময়ই যখন ছ' সাতজন লোককে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতে হতো, তখন সর্বদাই প্রথমে খেয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হতো। তার কারণ কি, তা বিলক্ষণ জানতাম; আর এও খুব ভাল করেই জানতাম আমাদের খাওয়ার পর কী ব্যাপারটা দাঁড়াবে। তবুও কিন্তু, পাছে তারা মনে মনে আঘাত পায়, এই আশংকায় সবার আগেই খেয়ে নিতে রাজী হয়ে যেতাম।

সেদিন ঠিক করলাম, ভুষির রুটি কেমন লাগে খেয়ে দেখব। কিন্তু বাঁশের দেওয়াল-ঘেরা রান্নাঘরে, অনাবৃত অবস্থায় পড়ে থাকা রুটির কথা ভাবতেই মনটা যেন কেমন একটু আঁতকে উঠল। গরম গরম খাবো এই অছিলায় আগুনে রুটিটাকে আবার এপিঠ-ওপিঠ সেঁকে নিলাম। মনকে আশ্বস্ত করলাম—এবার নিশ্চই আগের মতো আর রোগ-জীবাণু নাই, সংক্রামক-জীবাণু মুক্ত হয়ে গেছে, তারপর সেটা খেতে লাগলাম। ভুষির রুটিতে মাঝে মাঝে ধানের খোসা থেকে যায়, সেগুলো মুখে লাগে, চিবোতে বা গিলতে গেলে অসুবিধে হয়। ক্ষণস্থায়ী সন্দেহের ছায়াও একটা মনকে ছুঁয়ে গেল। ঐরকম কোন খোসা অন্তর্নালীতে জমে গিয়ে দুর্বিপাক ঘটাবে না তো? তক্ষুণি সে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আবার ভাবলাম—আচ্ছা! ঐ ছোট ছোট বাচ্চাগুলো তো খায়, তাদের যদি কোন ক্ষতি না হয়ে থাকে তো আমি খেলে কী এমন আর ক্ষতি হতে পারে? এই ভেবে, আগের থেকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম—যা হয় হবে, রুটি খাবোই। রুটিটা সবটাই খেয়েও ফেললাম। আহার-পর্ব শেষ করতে, বেশি দেরি করলাম না আর। অর্ধাশন-ক্লিষ্ট মানুষগুলোকে দেখে, বিশেষ করে ছেলেগুলোকে দেখার পর থেকে, আমাদের জনাই বিশেষ ব্যবস্থা করা সেই ভাত আর ডাল গলা দিয়ে ভিতরে নামানো খুব কঠিন হয়ে পড়ল। আমরা যদি আবার ঐ বিশেষ ব্যবস্থা মোটেই না মেনে নিই, না খাই, তাহলে তারা মনে মনে গভীর কষ্ট পাবে। আমাদের আহারের জনাই তারা সজ্জনের কারুর কাছ থেকে চাল, ডাল আর

কয়েকটা বেগুন চেয়ে এনেছে। হয়তো তারা ভাববে যে, এত কষ্ট করে ব্যবস্থা করলাম, সব বৃথাই গেল ; আমাদের ভালোই লাগল না সেই ভোজ্য। সুতরাং খাওয়া খুবই দরকার, খাওয়া উচিত ! কিন্তু খুব অল্পই খেলাম। বুঝিয়ে বললাম তাদের—"আমরা তো তোমাদের মতো কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করি না, তাই আমাদের খিদেটাও তুলনামূলকভাবে কম। আর, ঐ অল্প যা খেলাম তাতেই পেট ভর্তি হয়ে গেছে।"

আমি ভুষির রুটি খাবো বলে নিয়ে এসেছি, এ কথাটা জানাজানি হয়ে যেতেই ওয়ারলিরা কেউ কেউ ভিতরে ঢুকে পড়েছিল স্বচক্ষে দেখার জন্য। কেউ কেউ এক পলক দেখেই দৃষ্টি নত করে তক্ষুনি পিছিয়ে গেল। একজন বলে উঠল, "আপনি কেন ভুষির রুটি খাবেন ? কেন এত কষ্ট করবেন আমাদের জন্য ? ও আমাদের কপাল !" বয়স্করা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে, মাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল, কারো কারো চোখের পাতা ছলছল করতে লাগল। হৃদয়-বিদারক সেই দৃশ্য ! ভুষির রুটিই যাদের নিত্য-খাদ্য হিসাবে ভাগ্য-নির্দিষ্ট, তাদের এইরূপ প্রতিক্রিয়ায় আমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমিও সেই রুটি খাচ্ছি দেখে তারা মনে খুব ব্যথা পেল। কী বলবো তাদের ভেবেই পাচ্ছিলাম না। একটা জিনিস কিন্তু বেশ স্পষ্ট ভাবে প্রকট হয়ে উঠল। আমার এই রুটি খাওয়ার ঘটনায়, আমরা ওয়ারলিদের মধ্যে আরও কাছের মানুষ হয়ে উঠলাম। এ কথা তারা অনুভব করল যে, তারা যা খায় আমিও যদি তা খেতে পারি তাহলে আমিও তাদেরই একজন। তাদের সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে আরও অতিরিক্ত অনুভূতির উষ্ণতা প্রতিভাত হয়ে উঠল।

খাওয়া সেরে বাইরে পরিষ্কার তক্‌তকে উঠোনে গিয়ে বসলাম। তাদের সংগে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল, তারপর, একে একে, যে যেখানে বসেছিল, সেখানেই সব ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। আমিও শুয়ে পড়লাম। সাধ্য মতো চেষ্টা করলাম ঘুমোতে, কিন্তু পারলাম না। চোখের সামনে শুধু ভেসে বেড়াতে লাগল সেই ক্ষুধার্ত শিশুগুলোর প্রতিচ্ছবি—গোগ্রাসে সেই তরল খাদ্য খাচ্ছে যাতে চালের গন্ধটুকু হয়তো আছে, কিন্তু চাল নেই। এরা তাদেরই সন্তান, যারা অহোরাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, মাটির বুক চিরে, পরের জন্য সোনার ফসল ফলায়, অথচ নিজেদের সন্তানের মুখে তুলে দেওয়ার মতো কিছুই নেই তাদের। ভাবতে লাগলাম—আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ কি এদের অবস্থার কোন রূপান্তর ঘটাতে পারবে, না, যা ঘটছে, তাই চিরদিন ঘটতে থাকবে ? সেই দিনগুলোতে দেখা সেই ভয়ংকর দৃশ্যগুলো এখনো পর্যন্ত হঠাৎ মাঝে মাঝে স্মৃতিপথে ভীড় জমায়। আজ শুধু এইটুকু তফাত যে,

সেই সব দৃশ্যের স্মৃতি, আজ আর সন্দেহ-বিষে জর্জরিত হয় না। কারণ, পরিস্থিতি এখন অনেক বদলে গেছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে, অরণ্য রাজ অবশেষে জেগে উঠেছে।

ভাতের সংগে অম্ল-জাতীয় শাক-পাতা

একদিনের এক ঘটনা---জংগলের মধ্যে পায়ে হাঁটাপথে একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। দহানু তালুকের পূর্বদিকে পাহাড়ের পাদদেশে পাকদণ্ডী সেই পথ। দেখা হল এক রাখাল ছেলের সংগে, সে আমাকে জারালী গ্রামের পিছনের দিকে পাহাড়ে ওঠার পথটা দেখিয়ে দিল। হাতে একটা লাঠি নিয়ে তার উপর ভর দিয়ে পাহাড়টার ওপর কোনরকমে যখন পেঁছিলাম, তখন গোধূলি নেমে এসেছে। সেখানে দেখা হল, বছর তের বা ঐ রকম বয়সের এক ছেলের সংগে। সে বলল, খুব কাছেই তাদের গ্রাম, সেখানেই তাদের বাড়ি। ঠিক করলাম সে রাত্রিটা ওদের ওখানেই কাটাবো। পাহাড়ী চটী থেকে নেমে তাদের গ্রামে যখন হাজির হলাম তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে আগুন জ্বালা হয়েছে। ছেলেটির নাম বিঠু কারবটু; সাদর অভ্যর্থনায় সে আমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। তার বাবা বাড়িতে ছিল না, মা ছিল। আমার বসার জন্য একটা চারপায়া আনতে বিঠু ছুটে ভিতরে চলে গেল, আর একটি ছেলে বিঠুর বাবাকে আমার আসার সংবাদ দিতে ছুটল। একটু পরে চারপায়া নিয়ে এল, তার উপর একটা চাটাই বিছিয়ে দিল, আমি বসে পড়লাম। বিঠুর বাবা ফিরে আসতেই সবাই মিলে রাত্রির আহারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অনেক রাত হয়ে গেছে, সে সময় গ্রামের অন্যত্র সন্ধান করে আহারের উপকরণ সংগ্রহ করা বেশ একটা অসুবিধেজনক ব্যাপার। দেখলাম তারা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি মৃদুস্বরে কথা বলছে। সমস্যা কি হতে পারে, সেটা অনুমান করেই আমি বেশ জোর দিয়ে বললাম "আমার জন্য বিশেষ বা অতিরিক্ত কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না। তোমাদের নিজেদের জন্য যা ব্যবস্থা আছে তাতেই ভাগ বসাব।" এইভাবে চাপ দিয়ে বলায়, তাদের একটা কুণ্ঠিত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, মহিলাটিও ঘরের মধ্যে চলে গেল।

বিঠু আর তার বাবার সংগে বাইরে বসে কথা বলছিলাম। বিঠু পাঁচের মান পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। তখনকার দিনে ওয়ারলি ছেলেরা কেউ পড়তে বা লিখতে পারে, এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যেত না। কাজেই বিঠু সেই দুর্লভদের মধ্যে একজন। তারা বলল, "আজ এখানে আপনার আগমন যেন ভগবানের আগমন, তিনিই আপনাকে আজ আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।" এমন মন্তব্যে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম, ঐ যে ভদ্রলোকেরা সব

পরস্পর বলাবলি করেন, "আমাদের গৃহাঙ্গনে আপনার পদধূলি পড়ল, আমরা ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম, ইত্যাদি ইত্যাদি"—এও হয়তো সেরকম একটা আনুষ্ঠানিক আপ্যায়ন। কিন্তু অনুমানে আমার ভুল হয়েছিল। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই আমার আসাটাকে ওরা এক রকমের ঈশ্বর-প্রেরিত বিপম্মুক্তির নির্দেশিকা বলেই ধরে নিয়েছিল; কেন না ওরা তখন খুবই অসুবিধেয় পড়েছিল। জানা গেল, জমিদারের প্রতিভূ হিসাবে পটোয়ারী বা (Talathi) তহশীলদার তাদের উপর অন্যায় জুলুম চালাচ্ছিল। চুক্তিমতো উৎপন্ন ফসলের ভাগ বিঠুর বাবা জমিদারকে দিয়ে দিয়েছে। অথচ জমিদার অভিযোগ তুলেছে যে ভাগ কম দেওয়া হয়েছে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিঠুর বাবা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে জমিদারকে বুঝিয়ে বলার; যতটুকু প্রাপ্য —তার শেষ দানাটুকু পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে, বাকী বকেয়া কিছুই আর নেই। কিন্তু জমিদার তা মানতে রাজী নয়। যেদিন আমি গিয়েছি, ঐ দিনই পটোয়ারী হঠাৎ আক্রমণ করে, বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে বকেয়া মেটানোর অংশ হিসাবে বাড়িতে যেটুকু শস্য ছিল, সব নিয়ে চলে যায়। এত কিছুর পরও, যাবার সময় আবার শাসিয়ে যায় যে, বকেয়ার বাকী অংশটুকু শীগগির না দিয়ে এলে আবার তাদের বাড়ি চড়াও করা হবে, আর তাদের যা কিছু আছে—হাঁড়ি-কুড়ি, ঘটি-বাটি, কলসী, লাঙল, ঘরের কাঠের কড়ি-বর্গা ইত্যাদি হাতের কাছে যা পাওয়া যাবে বাকীর দায়ে সব ক্রোক করে নেওয়া হবে। বাড়ির সবাই খুব শংকিত হয়ে পড়েছিল, চরম বিষণ্ণতায় ডুবে গিয়েছিল। আমার যাওয়ার আগে বিঠুর বাবা গ্রামের বয়স্কদের সংগে পরামর্শ করতে গিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে, ঘটি-বাটি, হাঁড়ি-কড়া, লাঙল ইত্যাদি ক্রোক করা বে-আইনী। কিন্তু জমিদার ও সরকারী আমলারা বেশ ঠান্ডা মাথায় এ সব আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাত। এ সব অঞ্চলে অবিচার, স্বেচ্ছাচার নির্বিবাদে চলত। জমিদার যা বলবে—সেটাই আইন। তিনিই রাজা!

এবার আমি বুঝতে পারলাম কেন ঐ যথাযথ মুহূর্তে আমার যাওয়াটাকে ওরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে ধরে নিয়েছিল। বিঠু পড়ালেখা একটু শিখেছে, হিসেব-নিকেশও সে সঠিকভাবেই রেখেছিল। কিন্তু তাতে আর কী কাজ হবে? জমিদার, রাজস্ব আদায়কারী ও পুলিস অফিসার—এদের সমবেত শক্তির সামনে একটা ছোট্ট ছেলে তার হিসেব নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে? দুর্নীতি-জুলুমবাজির রাজত্ব যেখানে কায়েম হয়েছে, সেখানে গরিব মানুষের লেখাপড়ার মূল্য একটা পচা ডুমুরের থেকেও বেশি নয়। ঘটনাটা সম্পর্কে সোজাসুজি খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ জানার পর নিশ্চিত বুঝলাম বিঠুর বাবার হিসাব সঠিক। তার ওপর ভিত্তি করে বেশ চোখাচোখা শব্দ প্রয়োগ

করে কড়া সুরে পটোয়ারীর উদ্দেশে একটা চিঠি লিখলাম। সেটা পটোয়ারীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ওদেরকে দিলাম। আমি তাদের এই পরামর্শ দিলাম যে, আমার চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও যদি জোর করে জিনিসপত্র দখল করার চেষ্টা চলে, তাহলে কয়েকজন গ্রামবাসী যেন সমবেতভাবে পটোয়ারীকে ঘরে ঢুকতে বাধা দেয়। তারা যেন এটাও শুনিয়ে দেয় যে, এইভাবে অনধিকার-প্রবেশ ও বলপূর্বক মালপত্র দখল সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং তারা তা করতে দেবে না। আমি বললাম, যদি কোন কারণে এতেও কাজ না হয় তাহলে তক্ষুনি তারা যেন আমাকে খবর দেয়—কাছাকাছি এলাকায় কোথাও আমি নিশ্চয়ই থাকবো। এই আশ্বাস ছোট্ট সংসারে যেন কিছুটা প্রাণশক্তি সঞ্চার করল। ইতিমধ্যে অন্যান্য গ্রামবাসীরাও এসে হাজির হয়েছে। বিঠু আর তার বাবাকে যে কথা বলছিলাম তাদের কাছেও সেই বক্তব্যই বেশ গুছিয়ে ব্যাখ্যা করলাম। পটোয়ারীকে ঐভাবে আইন-যুদ্ধে আহ্বান জানানো তাদের কাছে একটা অশ্রুতপূর্ব ঘটনা ; তারা কিছুটা সন্ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ল। কী করতে হবে, তা ঠিক করার জন্য তারা পরস্পর উদ্বিগ্নভাবে নীচুস্বরে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল।

ঠিক তখনি আমাদের জানানো হল—খানা প্রস্তুত। আমি ও বিঠু ঘরের মধ্যে উঠে গেলাম। ঘরটা খুবই নীচু, সত্যিই প্রায় আক্ষরিক অর্থেই, বসে পড়ে না ঢুকলে ভিতরে যাওয়া যায় না। ঘরের ভিতরটাও খুবই ছোট। এককোণে রান্নার জন্য আগুন জ্বালা হয়েছিল। তাই ঘরটা চুল্লীর মতো বেশ গরম। বাইরে বসে খেলে তবুও একটু আরাম লাগবে, তাই বাইরেই খাবো ঠিক করলাম। খাবার আনা হতে দেখলাম একটা থালার মোটা লাল রঙের চালের ভাত, ওপরে ঢেলে দিয়েছে অম্ল-জাতীয় শাক-পাতার তরকারি। তরকারিটা বানানো হয়েছে এক ধরনের অম্লস্বাদের পাতা, প্রচুর পরিমাণ লাল লংকা সহযোগে একটুখানি লবণ দিয়ে জলে সিদ্ধ করে ; এমন টক আর ঝাল হয়েছে যে, দেখলাম, আমার পক্ষে তা খাওয়া অসম্ভব। তবুও কিন্তু আমায় খেতেই হবে। কারণ অশ্রুসজল কণ্ঠে আমায় যখন জিজ্ঞেস করেছিল, "কি, আপনার এই খানা পছন্দ হবে তো ? আপনি কি খেতে পারবেন ?" আমি তখন হ্যাঁ বলেছিলাম। এখন না খেলে তাদের মনে আঘাত দেওয়া হয়। তার এই হীন দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থার জন্য যে এর থেকে ভাল আহারের ব্যবস্থা সে করে উঠতে পারেনি, এ কারণে সে খুব লজ্জা পাচ্ছিল। বাতাসেই যেন তরকারির টকটক গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। থালার প্রতিটি ভাতেই তরকারির ঐ টক রস মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। "অনেকগুলো ভাত দেওয়া হয়েছে, এত খেতে পারব না"—এই অছিলায়

বেশিটাই ফিরিয়ে দিলাম। যে কোন ভাবেই হোক তাদেরকে সন্তুষ্ট করতেই হবে, তাই বহু কষ্টে কোন রকমে অবশিষ্ট যা ছিল তার থেকে একটুখানি ভাত-তরকারি গলা দিয়ে ভিতরে চালিয়ে দিলাম। "যথেষ্ট হয়েছে"— এই বলে উঠে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে ফেললাম। কিন্তু তবুও যেন টক গন্ধ যায় না। তাদের বাড়িতে খেলাম, তারা যা খায় তাই খেলাম—সেই জন্য সবাই খুব খুশী হয়ে উঠল। আমার খাওয়ার ফাঁকে শেষ পর্যন্ত তারা একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছিল। বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিবেচনা করে তারা ঠিক করেছে যে, আমার চিঠিটা তারা পটোয়ারীর কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং তার ফলাফল যাই হোক না কেন, তার মুখোমুখি তারা দাঁড়াবে। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। তারপর খাটিয়াটায় আমি শুয়ে পড়লাম, তারাও সেখানেই মাটিতে শুয়ে পড়ল, আর সংগে সংগে ঘুমিয়েও পড়ল।

তখনকার দিনে কারো ঘরে আলো জ্বলতে দেখা যেত না। লণ্ঠনের প্রশ্ন তো অবান্তর, মাঝে মধ্যে কোথাও এক-আধটা চিমনি-বাতি বা লম্প দেখা যেত, অথবা পুরানো বোতলে পলতে লাগিয়ে আলোর ব্যবস্থা হতো। ওয়ারলিদের বাড়িতে বেশিরভাগ কাজই রান্নার উনোনের আগুনে বা ঘর গরম রাখার জন্য যে কাঠের আগুন জ্বালা হত সেই আলোতেই গৃহস্থালীর কাজকর্ম চলত। শীতকালে উঠোনে আগুন জেবলে সেই আগুনের উত্তাপের চারদিকে লোকজন সব শুয়ে পড়ত। যদি কোন কারণে ঘরের ভিতরে যাওয়া বা আলো জ্বালার দরকার পড়ত, তাহলে সেই আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নিয়ে ভিতরে যাওয়ার পথ আলোকিত করে নিত এবং এইভাবে কাজ সেরে ফেলত। বাড়িতে বাড়িতে জ্বালানি কাঠের কোন অভাব ছিল না, জংগল থেকে তা সংগ্রহ করত।

সে রাত্রে, হঠাৎ কোন কারণে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেখি খাটিয়ার পিছনে বিঠুর মা ঘুমাচ্ছে। তার পরনের শাড়িটা তেমন বড় নয়, আর শাড়ির প্রান্তে কোন 'পাল্লা' [Pallav] বা আঁজলা নেই। অনেক ওয়ারলি রমণীর পরিধেয় শাড়িতে কোন রকম "পাল্লা" দেখিনি। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে, কেউ বলেছে তাদের শাড়ি মাত্র চার গজ লম্বা, কেউ বলেছে পাঁচ গজ, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই, তাদের দেহ ঢাকা যায় এমন ন' গজ কাপড়ের মতো লম্বা শাড়ির কথা কেউই বলে না। ব্যাপারটা আমাকে খুব অবাক করেছিল। মহারাষ্ট্রের শাড়ি দৈর্ঘ্যে এক একটা হয় ন' গজ, দুই প্রান্তেই থাকে দুটো "পাল্লার" সীমানা; কী ভাবে তাহলে শাড়ির দৈর্ঘ্যে এত তারতম্য ঘটতে পারে? খাত্তালওয়াড় [Khattalwad] গ্রামের বাজারে ঘুরে বেড়ানোর সময় এক দোকানদারকে এ প্রসংগে জিজ্ঞাসা

করেছিলাম। তিনি বললেন—"বেশিরভাগ ওয়ারলি মেয়েরা পাল্লা আর কিনারা দেওয়া ন' গজ শাড়ি কেনার পয়সা জোটাতে পারে না। তাই আমরা দুই দিকেই কিনারা বা পাড় দেওয়া শাড়ি কাপড়ের থান বিক্রি করি। সেই থান থেকে যার যত গজ কেনার প্রয়োজন থাকে ততটুকুই আমরা কেটে দিয়ে দিই। ওয়ারলি মেয়েরা নিজের সুবিধে মতো কেনে।" বিঠুর মাকে দেখার পর দোকানদারের সেই মন্তব্য আবার মনে পড়ে গেল।

দহানু স্টেশনের রেলগাড়ির শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দূরবর্তী কোন জায়গা থেকে শব্দটা ভেসে আসছিল। একদিকে ঐ শব্দ আর অপর-দিকে ঘন অরণ্যময় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়। চারিদিকে গভীর নৈঃশব্দ বিরাজমান। চারিপাশে উঠোনে শুয়ে আছে ওয়ারলিরা। তাদের অনাবৃত দেহ আর শিশুদের নগ্নতা দেখে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। "এরই নাম জীবন। মানুষ মানুষকে কেমন করে নারকীয় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিতে পারে!" এই সব নানান চিন্তায় নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটছিল—কিছুতেই ঘুমাতে পারলাম না। এত যে খাটছি, তার ফলশ্রুতি কী হবে? জানি না, কত কষ্টের সম্মুখীন এখনো হতে হবে? এই নিষ্পাপ গরিব মানুষ-গুলোর কোনদিন কি কোনো উন্নতি ঘটবে? কিন্তু এই সব বিপর্যয়কর চিন্তার মধ্যেও এই ভেবে কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত এক ধরনের বিস্ময়ানুভূতি আমার মনের মধ্যে দেখা দিল যে, আমার জীবন কত সব বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

পর্যটনের এই সব কাহিনী যখন কমরেড পারুলেকরকে গিয়ে বলব, তখন কেমন লাগবে তার—ইত্যাদি কথা শুয়ে শুয়ে বিস্ময়ভরে গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে প্রায় ভোর হয়ে এল, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল।

পরদিন সকালে উঠেই হাত মুখ ধুয়ে পরবর্তী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। অনেকদূর পর্যন্ত ওয়ারলিরা আমার সংগে সংগে এল; বার বার করে জানতে চাইল, আশ্বস্ত হতে চাইল, আমাকে ডেকে পাঠালে আমি আবার আসবো কিনা। আশ্বাস দিলাম তাদের। দুদিন পরে জানতে পেরেছিলাম আমার চিঠি পাওয়ার পর সেই পটোয়ারী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে অভিশাপ বর্ষণ করেছে, চরম বিরক্তিতে শুধু মাটিতে পদাঘাত করেছে, কিন্তু কোন কিছু অঘটন না ঘটিয়েই ফিরে গেছে। তারপর, ঘটনার তেমন কোন অগ্রগতি আর হয়নি। ওয়ারলিদের এই বিজয়-সংবাদ অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে আমার উপর তাদের আস্থা বিশ্বাস চতুর্গুণ বেড়ে উঠল।

আমার এই প্রচারাভিযানকালে, ওয়ারলি সম্প্রদায়ের অসহায়তা; তাদের জীবন-যাত্রা প্রণালী সম্পর্কে অনেক কিছুই শিখলাম। পরিচিত হলাম তাদের ক্ষুধাগ্নি নিবারণের নিরন্তর প্রয়াস স্বরূপ খাদ্য-তালিকার সঙ্গে—লপসী জাতীয় খাদ্য (ambil), মোটা চালের ভাত, ভূষির রুটি (bhakris), অম্লজাতীয় শাক-পাতার সব্জি, তিক্ত-মূল ইত্যাদি ইত্যাদির সঙ্গে। জঙ্গল ও পাহাড়ী উপত্যকায় ছোট ছোট ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটীরে অর্ধনগ্নাবস্থায় জীবন কাটায় যারা, বিশেষ ধরনের পোড়ামাটির থালা-বাসন নিয়ে যাদের ঘর-সংসার সেই ওয়ারলিদের দুনিয়া-দর্শন ঘটল ধীরে ধীরে। তাদের অসহায়, আশাহীন জীবন-যাত্রার দৃশ্য হৃদয় বিদ্ধ করে রক্ত ঝরিয়ে দেয়, আমার মন অসাড় হয়ে যায়। ইতিপূর্বে ভারতীয় কৃষকদের দারিদ্র্য, তাদের পশ্চাৎপদতার কথা কিছু কিছু পড়েছিলাম। এই বিষয়ে কমরেড পারুলেকরের জ্ঞান বেশ ব্যাপক ও গভীর; তিনিও অনেক কথাই বলে দিয়েছিলেন। কৃষকদের জীবন সম্বন্ধে কিছুটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল আমার। তবুও কিন্তু ওয়ারলিদের এই প্রথম পরিচয় একেবারে হতবাক করে দিল আমায়। এখন তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার বহর দেখে মনে মনে লজ্জা পেলাম। শত হলেও, তারাও তো আমাদেরই স্বদেশবাসী, আমাদেরই ভাই। বোম্বাই শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে মাত্র তিন ঘণ্টা ট্রেনে করে গেলেই তাদের আবাস-ভূমিতে যাওয়া যায়। অথচ তারা এমনই একটা দুনিয়ায় বাস করে, যেখানে মানবিকতা, দয়ামায়া-সহৃদয়তার কথা তাদের কাছে সম্পূর্ণ একটা অজানা ধ্যান-ধারণার পর্যায়েই পড়ে। আর আমরা যে দুনিয়ায় বাস করি সেখানে সেই দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনের বিন্দুমাত্র সংবাদ-সংকেতও এসে পৌঁছায় না। আমাদের এহেন অনুভূতিহীন অজ্ঞতায় লজ্জা হয়। সেই মুহূর্তেই কমরেড্ পারুলেকর ও আমি পবিত্র শপথ নিয়েছিলাম—আমাদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি সম্পদ্ কাজে লাগিয়ে যুগযুগান্তর ধরে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ এই কৃষকশ্রেণীকে তাদের নারকীয় জীবন-বৃত্ত ভেঙে মুক্ত করার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাব। প্রতিজ্ঞা করলাম—প্রতিটি ওয়ারলির মধ্যে যে মানবিক সত্তা, যে পৌরুষ ঘুমিয়ে আছে, তাকে আমরা জাগ্রত করে তুলবোই তুলবো। আজ এই মুহূর্তে শুধু এইটুকুই বলতে পারি—হাজার হাজার মানুষের অবিচলিত নিষ্ঠা ও নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টায়, তাদের অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতায় আমরা সেই প্রতিজ্ঞা-পূরণে সমর্থ হয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়

জমিদারদের বিলাস-বৈভব

তৎকালীন সময়ে এই এলাকায় দুটি বৈষম্যবহুল জীবনালেখ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। একপ্রান্তে রয়েছে অসংখ্য নির্যাতিত মানুষ, যাদের খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, নেই যথাযোগ্য চিকিৎসা ও ঔষধ পত্রের কোন ব্যবস্থা, যারা শুধু মার খায়, এমন কি নিহত হলেও যেখানে কোন আপীল বা প্রতিবাদ পর্যন্ত নেই; কী তাদের জীবনে ঘটছে তার খেয়াল-খবরও কেউ রাখে না—আর অপর প্রান্তে রয়েছে—মুষ্টিমেয় কয়েকটি জমিদার—যারা জীবনে যা কিছু ভালো তার সবটারই প্রাপ্তি-প্রাচুর্যের মধ্যে বিলাসী জীবন কাটায়।

আমার ক্ষেত্রে আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কোন জমিদারের জীবন-যাত্রা সন্নিকট থেকে দেখার সুযোগ তেমন ঘটে ওঠেনি। কমিউনিস্ট হিসাবে আমরা তাদের থেকে ভিন্ন গোত্রের লোক—তাদের বিচারে অপাঙক্তেয়। সম্পর্কটা প্রথম থেকেই বিচ্ছিন্ন। তারা চাইত আমরা যেন সব সময়েই দূরে দূরে থাকি। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৭ আন্দোলনের এই দু বছরে তাদের জীবনধারা সম্পর্কে আমাদের কিছুটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়।

ভূস্বামীদের আবাসস্থল সাধারণতঃ দুটি। পশ্চিম রেলপথের পশ্চিমে আছে ছোট ছোট শহর যেমন সঞ্জন, খাত্তলওয়াড়, উম্বরগাঁও, ভিলাড়, শিরগাঁও, গোলওয়াড়, দহানু, বানগাঁও, পালঘর ভোঈসর, চিঁচনী, তারাপুর ইত্যাদি। এই সব শহর জমিদার-অধিবসতি-প্রধান। সেখানে আছে তাদের বিশাল বিশাল অট্টালিকা। রেলপথের পূর্বদিকে তাদের আবাদী কৃষিক্ষেত্র। কৃষি মরসুমে ক্ষেত-খামারের কাজ দেখাশোনা ও থাকার জন্য তৈরী হয়েছে কৃষিক্ষেত্র সংলগ্ন গোলাবাড়ি। কোনটা ছোট ছোট অস্থায়ী কুটীর ধরনের, কোনটা স্থায়ী কাঠের বাড়ি, আবার কারো আছে বাংলো ধরনের পাকা বাড়ি। এই সব পল্লী-ভবনগুলি ছোট ছোট দুর্গের মতো। এখান থেকেই সাধারণ ওয়ারলিদের উপর খুব সহজেই তাদের সুদৃঢ় কর্তৃত্ব বজায় রাখত। এই গড়ের মধ্য থেকেই তারা বর্বর নৃশংসতা চালাতো, লোভী, অর্থপিশাচ সাঁড়াশীর মতো আঙুলগুলো বাড়িয়ে দিয়ে ওয়ারলিদের রক্ত চুষে চুষে শেষ করে ফেলত।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে জনৈক ভূস্বামীর প্রাসাদে আমার পদক্ষেপ করার প্রথম সুযোগ ঘটেছিল। আদিবাসীরা তখন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিস গুলি চালিয়েছে। ওয়ারলিদেরকে মজুরি দিতে হবে—এই দাবিকে কেন্দ্র করেই ধর্মঘট চলছিল। এই প্রসংগে আপস-আলোচনার জন্য কমরেড পারুলেকর ও আমাকে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী বেড়েকর সঞ্জনের অধিবাসী জনৈক শ্রীহোমী দলিয়ারওয়ালার সুন্দর জমকালো বাংলোয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সুসজ্জিত বিলাসবহুল বাংলোর ঐশ্বর্য-সম্ভার

গেট থেকে বাংলোর অংগন পর্যন্ত প্রায় আধ ফার্লং জুড়ে লাল কাঁকর বিছানো প্রশস্ত পথ। বিশাল দ্বিতল মঞ্জিল, চারিদিকে সুরক্ষিত পুষ্পোদ্যান, লতাপাতার বাগিচা, বনবীথি। সিঁড়ি থেকে ওঠার পর প্রশস্ত বারান্দা শেষ হয়েছে একটি বড় আকারের বৈঠকখানায়। দোতলার সিঁড়ি পরিষ্কার কার্পেট দিয়ে ঢাকা। উপরতলায় ভোজনকক্ষ চমৎকার সাজানো-গুছানো। ডাইনিং টেবিল, পাশ্চাত্য অনুকৃতির দেরাজ, তার মধ্যে ও উপরে সাজানো রয়েছে ফলমূল, বিলাতী সুরা, সুন্দর চীনামাটির নানান বাসন-পত্র। বাড়ির অন্যান্য অংশ দেখার সুযোগ যদিও হয়নি, তবুও যা দেখলাম সেইটাই বাকী অংশটুকু কেমন হতে পারে, সে সম্পর্কে অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট!

এই বিশিষ্ট ভূস্বামী ইংল্যাণ্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন উম্বরগাঁও আদালতের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। ইংলণ্ডের প্রবাস জীবনের প্রতিফলন যে শুধু তাঁর জীবনের উপরিভাগেই ঘটেছে তা পোশাক পরিচ্ছদ, আহার-বিহারেই প্রতিভাত হয়; কিন্তু তাতে তার সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। এক অখ্যাত নগণ্য গ্রাম বাঁকাস্ সেখানেই তার ক্ষেত খামার, আর একটি বাংলো। সেই সময়ে কোন দোকানের অস্তিত্বও সে গ্রাম দাবি করতে পারত কিনা, এখন ঠিক তা স্মরণ করতে পারছি না। সঞ্জন তলাসরী সড়কের পাশে একটি গ্রাম 'কাওয়ড়' (Kawad) সেখান থেকেই বাঁকাস্ যাওয়ার রাস্তা বেরিয়ে গেছে। সোজা বাংলোতে যাওয়ার জন্য শেঠ বাহাদুর নিজেই বিশেষভাবে এই রাস্তাটি তৈরি করিয়েছিলেন। একটি উপত্যকায় একটু উঁচু জায়গায় বাংলোটির অবস্থান। "বিশাল হলঘর, দু'দিকেই তার কামরা। সামনের দিকে ও পিছনের দিকে লম্বা বারান্দা"—এটাই ঐ সময়ে বাংলো-নির্মাণের প্রচলিত জনপ্রিয় রীতি ছিল। পিছনের দিকে একটু দূরে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও অন্যান্য আউট হাউস বা বহির্বাটী। আরাম ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নানাবিধ ব্যবস্থার মধ্যে একটা

অন্যতম বিষয় হলো পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা। নানা রং বেরং-এর সৌখীন খেলনা দিয়ে সাজানো কক্ষ, নানা রকমের আলোর ঝাড়বাতি। পাশে আছে বর্ণবিচিত্রিত পুষ্প বিথি ও ফলের বাগিচা।

বাংলোর এক দিকে আর একটি পাকা-বাড়ি—চওড়ায় প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট, আর খুব লম্বা—প্রায় একশ থেকে দেড়শ ফুট হবে। অনেকগুলো কামরায় সেটা বিভক্ত। সামনের দিকে লম্বা ও প্রশস্ত বারান্দা। যদি ভাবতে শুরু করেন—এটা তার গরিব প্রজাদের বসবাসের জন্য তৈরী হয়েছে, তাহলে সম্পূর্ণভাবে একটা ভুল ধারণার গোলক ধাঁধায় আপনি পড়ে যাবেন। এটা হল শেঠ-মহারাজের শস্য-ভাণ্ডার। নানান রকমের ভিন্ন ভিন্ন গুণগত মানের শস্য গোলাজাত করা হয় পৃথক পৃথক কামরায়। কী পরিমাণ শস্য সেখানে মজুত রাখা যেতে পারে, তার সঠিক ধারণা করা খুবই মুস্কিল তবে, লক্ষাধিক মণ তো বটেই অন্ততঃ কাছাকাছি। গবাদি পশু থাকার জন্য পাশেই একটা শক্ত ভিতের তৈরী টালির শেড, বাংলোটা যেহেতু উঁচু জায়গায়, তার পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে সহজেই দেখা যাবে অনেক নীচে উপত্যকায় বিঘার পর বিঘা উৎকৃষ্ট ফসলের ক্ষেত, ফলের বাগান, ফুলের বাগান। সবেরই মালিক ঐ ভূস্বামী। ক্ষেতের পাশে ওয়ারলিদের অতি নিকৃষ্ট মানের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, ঘরের মধ্যে কাঠের আগুন ধিক্‌ধিক্‌ জ্বলছে। সবাই এরা ভূস্বামীরই প্রজা, তার ক্ষেতে বেগার খাটে। অগাধ ঐশ্বর্য আর অন্তহীন দারিদ্র্য—যেন ঐ উপত্যকায় কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেমন নিকটতম সান্নিধ্যে উভয়ের অবস্থান! এই দৃশ্য কিন্তু জমিদারের শহরাগত অতিথিবর্গের চোখে অন্য রকম ভাবে প্রতিভাত হয়। তারা উপত্যকার নিসর্গ-সৌন্দর্যচ্ছটায় বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যান। তারপর পেটভরে 'চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-'পর্ব সমাধা করে ধনাঢ্য অতিথিসেবকের সদাশয়তা ও বদান্যতার বন্দনা গান গাইতে গাইতে প্রস্থান করেন। আনন্দ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলে ওঠেন, "কী বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছে এখানে! একদিকে গ্রাম্য-বৈভব-সঞ্জাত আনন্দ, অপরদিকে আধুনিক জীবন যাত্রার সর্বাঙ্গীণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য—উভয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ।" ইতস্ততঃ কর্মরত ওয়ারলি ভৃত্যেরা মাথা নীচু করে এই সব মন্তব্য শোনে, আর তাদের মধ্যে নীরবে ক্রোধের আগুনে জ্বলতে থাকে।

জমিদারের কৃষি-খামারে সাধারণতঃ ট্রেনে করেই যাওয়া যায়, তা না হলে বাস তো আছেই। কোন কোন জমিদার বা সাহুকর তো জঙ্গলের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতেই বাংলো বানিয়েছে—যেমন অশটা, রায়পুর প্রভৃতি গ্রামে। এই সব বাসস্থান থেকেই তারা ওয়ারলিদের উপর প্রত্যক্ষ নজর রেখে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতো।

নগর হাভেলীর সীমারেখায় একটি গ্রাম কোচাই। ভূস্বামী-বর্গের বহু কীর্তি ও বিলাস-বাহুল্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে ঐ গ্রাম। জমিদারের নাম মাণেকজী কোচাইওয়ালা। এক বিশাল বাংলোয় তাঁর অধিষ্ঠান। বাংলো থেকে গ্রামে যাওয়ার পথে পড়ে একটা নালা। এমনকি বর্ষাকালেও সেই খরস্রোতা নালাটি যাতে পারাপার হওয়া যায় সেজন্য তিনি তার উপর একটা ঝোলানো সেতু-নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু মাণেকজীর অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে সেতু-ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হতো না। সেতুমুখ সর্বদা তালাবন্ধ থাকত। নগরহাভেলীর-মুক্তি যুদ্ধের সময় একবার মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। বন্যার জলে নালাটি বেপরোয়াভাবে ফুলে উঠল। সেই সময় একদিন ওয়ার্লিরা, গোপনে আমাকে নিয়ে সেতু পার হয়ে আবার জমিদারের বাংলোর পাশের রাস্তায় এসে পড়ল। মাণেকজী প্রচুর গালিগালাজ করলেন, কিন্তু প্রহার করতে সাহসী হলেন না।

মাণেকজী কখনো বিদেশে যাননি। তাঁর জীবন যাত্রার মধ্যে পুরোনো দিনের ঐতিহ্যই যথানিয়মে বেশি করে প্রতিভাত হয়ে উঠতো। সামন্ত-বৈভবে ভরা সেই জীবন। আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-ধারার প্রতিটি চিহ্নই সেখানে প্রত্যক্ষ করা যেত। শস্যক্ষেত্র শস্য-সম্ভারে উপচে পড়ছে, বিভিন্ন ধরনের ফলমূলের প্রাচুর্য, পোলট্রি, ডিম, প্রচুর পরিমাণ দুধ ও দুগ্ধজাত নানাবিধ উপকরণে তাঁর ভাঁড়ার পূর্ণ হয়ে থাকতো। পরম্পরাগত পার্সীরীতিতে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিতা মহিলারা চরম ঔৎসুক্য নিয়ে আচার, পাঁপড় আর রন্ধনশৈলীর নানান আলোচনায় আনন্দে মশগুল হয়ে অবসর বিনোদন করত। মূল ওয়াপি-তলাসরী রাস্তা থেকে একটি বিশেষ রাস্তা তাঁর বাংলো পর্যন্ত প্রসারিত। রাস্তাটার দুপাশে কৃষি ক্ষেত্রের বিস্তৃতির দিকে একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত করলেই তাঁর সম্পদ-সম্ভার সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা জন্মাতে পারে। মাণেকজীর প্রধান সর্দার ছিল এক পাঠান। অত্যাচারের নিত্য-নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারে সে ছিল সিদ্ধহস্ত এবং আদিবাসীদের উপর সেই অত্যাচার কৌশল প্রয়োগের কারণে সকলেই এই সর্দারকে খুব ভয় করত। কিন্তু বাংলোর খুব কাছেই যাদের পর্ণকুটীর তারাও সর্দারের দ্বারা নির্যাতিত মানুষের আর্তনাদ কোনদিনও শুনতে পেত না। অভ্যুত্থানের সময় এই পাঠান সর্দার নিহত হয়।

কোচাই, বাঁকাস্ প্রভৃতি গ্রামের জমিদাররা যেন এক একজন মুকুটহীন রাজা-মহারাজা। ঐশ্বর্য-মদমত্ত তাদের জীবন-যাত্রা। তাদের প্রণয়-সঙ্গিনী রাখাটা খুব সাধারণ ঘটনার পর্যায়েই পড়ে। আদিবাসী রমণীদের তারা

ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো ব্যবহার করতো। তাদের নৈতিক মান, অথবা নীতিভ্রষ্টতা তাদের সাধারণ লাম্পট্যেরই লক্ষণ ছিল।

রেলওয়ে স্টেশনের আশেপাশের গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমান জমিদার ও মহাজনদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা দাঁড়িয়া আছে। তাদের জীবন-যাত্রার ধারাও সামন্ত প্রভুদের মতোই। আছে টাঙ্গা গাড়ি, ঘোড়া, শস্যাগার আর বৃহৎ পরিবার। শস্যে উপচে পড়ছে শস্য ভাণ্ডার, আর দুগ্ধাগারে বইছে দুধের বন্যা, নানাবিধ দুগ্ধজাত উপকরণ। তাদের ওয়ারলি ভৃত্যেরা চলছে ফিরছে কাজ করছে—যেন এক একজন তারা বাঁধা পুতুল। জমিদারদের জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে প্রগতির চিহ্নই দেখা যেত না, এমনকি পার্সী বা ইরানী জমিদারদের মতো অন্ততঃ বাহ্যিক জীবনে আধুনিক জীবনের মনোহারিত্বের কোন প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় না। একটা সংকীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক জগতের মধ্যেই ছিল তাদের অধিবাস। শ্রীকন্ঠ, বাসুন্দি, জায়েলবি (Jaelbis) ইত্যাদি মিষ্টান্ন দিয়ে ভোজন বিলাসে আপন খুশিতেই তারা নিমগ্ন থাকত। উপচে পড়া শস্যাগার, স্বর্নাভরণ,রৌপ্য নির্মিত তৈজসপত্র প্রভৃতি সম্পদের মালিক—এই গর্বেই তারা দিন কাটাতো।

একটি বিশেষ ঘটনার কথা আমি সহজে ভুলতে পারবো না। সেবার এক জমিদারের বাড়িতে রাত যাপন করার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। সঞ্জন স্টেশনের কাছে একটি রেশন দোকানের সামনে মারাত্মক চিৎকার, ঠেলাঠেলি, ধাক্কা-ধাক্কি চলছে—কমরেড্ দলভি ও আমি রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছি। সে রাত্রিতে কোথায় থাকবো তা তখনো নির্দিষ্ট হয়নি। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, রাত্রিটা স্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে কাটিয়ে দিয়ে সকালে অন্য গ্রামে চলে যাবো। কিছুক্ষণ পরে, ঐ পথ দিয়ে স্থানীয় এক ধনী জমিদার যাচ্ছিলেন। আমার পিতা প্রয়াত লক্ষ্মণ রঘুনাথ গোখলের সংগে কোন ব্যবসা-সূত্রে ভদ্রলোকের পরিচিতি ছিল। তিনি আমাকে চিনতে পেরেই তখনি তাঁর বাসভবনে নৈশ-অবস্থানের আমন্ত্রণ জানালেন। যে ধরনের জীবন ও কর্মপন্থা আমি বেছে নিয়েছি, সেই পথ থেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমায় নিবৃত্ত করার আশাতেই বোধ হয় তাঁর এই আমন্ত্রণ। যেহেতু অন্যত্র কোথাও খাওয়ার নির্দিষ্ট জায়গা আমাদের ছিল না, তাই সেই আমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করলাম। চা-পর্বের পর মূলত আদিবাসী-সমস্যাকে কেন্দ্র করে তিনি তাঁর আলাপ-আলোচনার হাল ধরলেন, তাদের অনগ্রসরতার প্রসংগ তুলে তাদের জন্য স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতির মাধ্যমে গঠনমূলক সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। কোন মন্তব্য না করেই সব কথা শুনে গেলাম। এই সব বক্তব্য উত্থাপনের পর প্রায় আটটার

কাছাকাছি, তিনি উঠে পড়লেন, হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন—"এবার আমাকে মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে যেতে হবে"। প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, তিনি তাঁর "সান্ধ্য পানের" নির্দিষ্ট সময়ের কথাই ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছিলেন। ইতিপূর্বে কখনও কোন মদ্য পানাসক্ত ব্যক্তির গৃহে রাত্রি বাস করিনি। সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। ভিতরে ভিতরে কিন্তু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই সারারাত্রি কমরেড দলটিকে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে জাগিয়ে রাখলাম, নিজেকে অভিসম্পাত করতে লাগলাম 'কেন যে এ জাতীয় ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে রাজী হয়ে গেলাম !'

পরদিন সকালে চলে আসার আগে আমাদের জন্য এল প্রাতরাশ—পাউরুটি, সুজির হালুয়া আর চা। একটি আদিবাসী মেয়ে চা-এর ট্রে নিয়ে ভিতরে এসেছিল। তার ছেলেমেয়েগুলো জমিদারের আশেপাশে খেলা করছিল। এমনিই জিগ্যেস করলাম, "কে এই হালুয়া তৈরি করেছে ?" আদিবাসী মেয়েটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, "আমার এই গৃহ-সঙ্গিণী"। মেয়েটি চকিতে পিছন ফিরে সেই দৃশ্যপট থেকে অন্তর্হিতা হল। এ হেন মন্তব্যের সাংকেতিক অর্থ, মেয়েটির সংগে শেঠজীর নিগূঢ় সম্পর্ক ও তার স্পষ্ট উল্লেখ এবং তাঁর জীবনযাত্রার গতিবিধি অনুমান করতে পেরে মনে মনে খুব পীড়া অনুভব করলাম। সমগ্র জমিদারকুলের এ হেন নগ্ন নির্লজ্জতায় তাদের প্রতি তীব্র ক্রোধ জেগে উঠল মনের মধ্যে।

লাঞ্ছিত ওয়ারলিরা

ছোট ছোট গ্রামগুলিতে জমিদারের বৃহৎ অট্টালিকার পাশাপাশি আদিবাসীদের জীর্ণ কুটীরগুলি যেন গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে কেরোসিন ও উজ্জ্বল গ্যাসের আলোতে ঝলমল করছে ভূস্বামীদের গৃহ, আর অপরদিকে আলো আর উত্তাপ উভয় উদ্দেশ্যে আদিবাসীদের ঘরে ঘরে ধিকিধিকি জ্বলছে কাঠের আগুন। একদিকে চলছে আদিবাসীদের দিয়ে মুফতে তৈরি করে নেওয়া পুকুরের মাছ, ওয়ারলিদের পোষা মুরগীর ডিম, আর দশ বার মাইল দূর থেকে ওয়ারলিদের দিয়ে সংগ্রহ করে আনা দুধ থেকে প্রস্তুত সুস্বাদু মিষ্টান্ন সহযোগে ভোজন বিলাস ; আর অপরদিকে, তিক্ত কন্দমূল, কটু শাক-পাতা, অম্বিল, ভূষির রুটি ইত্যাদি আহার্য শেষ বিন্দু পর্যন্ত চাটতে চাটতে অনাহারে অর্ধাহারে নিঃশেষিত হয়ে কোন রকমে টিকে থাকার সাধনা করে চলেছে প্রতিটি ওয়ারলি পরিবার। সকালে ভূস্বামীদের

প্রাতরাশ সম্পন্ন হয় পাউরুটি, চা, মিষ্টান্ন ও নানাবিধ সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য সহযোগে ; প্রাতরাশ সরবরাহে বিন্দুমাত্র দেরি হয়ে গেলে তারা চিৎকারে গগণ বিদীর্ণ করে ফেলে, আর অপরদিকে সকালে উঠে ওয়ারলিদের জল ছাড়া অন্য কিছুই আর কপালে জোটে না, হাত মুখ ধুয়ে সোজা বেগার খাটতে চলে যায়, ক্ষুধার্ত না হওয়ার ভান করে উপবাসের কষ্টকে প্রাণপণে চেপে রেখে কাজ করে যায়, কেননা তাদের যে খাওয়ার মতো কিছুই নেই।

খালি পেটে কাজে যাওয়া এবং দুপুর পর্যন্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করা—ব্যাপারটা ভাবতে গিয়েই আমার পেটটাও কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। একদিকে ধোপদুরস্ত, পরিষ্কার পায়জামা, ধুতি, কুর্তা বা স্যুট পরিহিত জমিদার ও ন' গজ মহারাষ্ট্রীয় শাড়ি বা খাঁটি সিল্ক শাড়ি পরিহিতা তাদের পরিবারের ভদ্রমহিলা ; আর অপরদিকে, কোনরকমে লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরো ছিন্ন বস্ত্র দিয়ে প্রায় অর্ধনগ্ন ওয়ারলি পুরুষ ও নারী। একদিকে জমিদার প্রভুরা বারান্দায় বসে বসে পান চিবোচ্ছে, ঘন ঘন চা পান করতে করতে গাল-গল্পে মশগুল ; অপর দিকে দশ-পনেরো মাইল দূর পর্যন্ত ভারী বোঝা মাথায় করে বয়ে নিয়ে চলেছে ওয়ারলিরা, এমন অলঙ্ঘনীয় প্রহরায় কাজ করে চলেছে যে মাটিতে পা রাখার পর্যন্ত বিন্দুমাত্র সুযোগ মেলে না তাদের। একদিকে জমিদারের শস্যাগার শস্যসম্ভারে কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে, অপর দিকে এক হাঁড়ি লপসীর মধ্য থেকে ভাসমান কয়েকটি ভাতের টুকরো খুঁজে খুঁজে চেটেপুটে খাচ্ছে ওয়ারলি কৃষক। প্রাচুর্য ও নিঃস্বতার এমন নগ্ন ও নির্লজ্জ পাশাপাশি সন্নিবেশের প্রত্যক্ষ চিত্র দর্শনের সুযোগ কদাচিৎই ঘটে। এইসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর থেকে শ্রেণী হিসাবে জমিদাররা আমার মনের মধ্যে নিদারুণ বিতৃষ্ণার উদ্রেক করতে লাগল। তাদের বিরুদ্ধে একটা প্রবণতা আমায় পেয়ে বসল। ওদেরকে উত্তম শিক্ষা দিতেই হবে—এমন একটা প্রবল ইচ্ছা আমাকে তাড়িত করতে লাগল। আর ঐ সংগে, মৃতপ্রায় জন্তুর মতো সমস্ত অত্যাচার নির্বিবাদে সয়ে যাওয়া ওয়ারলিরাও মনের মধ্যে ক্রোধ সঞ্চার করল। তবুও কিন্তু কোন এক শান্তক্ষণে বিচার বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত বুঝেছি যে, ওয়ারলিদের মধ্যেও কোথায় যেন একটা স্ফুলিংগ ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে। তাদের সেই শান্ত-সমাহিত রূপ, যেন জ্বলন্ত অংগারের ওপর আচ্ছাদিত ভস্মরাশি। সেই ভস্মকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে, বাতাস করতে করতে স্ফুলিংগ থেকে দাবানল সৃষ্টি করতে হবে—এটাই আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

দমন-পীড়নের কলা-কৌশল

ওয়ারলি-আন্দোলনের বিভিন্ন কাহিনী ধীরে ধীরে সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় স্থান পেতে শুরু করল। বহির্জগতের মানুষরাও ক্রমে ক্রমে ওয়ারলিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া, বর্বর অত্যাচারের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে লাগল। শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণী আমার কাছে নানাবিধ মন্তব্য করতে লাগলেন। এগুলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, অত্যাচার যে কত বীভৎস হতে পারে, সে সম্বন্ধে বাস্তব প্রতিচ্ছবি, তাদের চোখে সঠিকভাবে ধরা পড়েনি। মামুলি ধরনের অনেক কথা প্রায়ই শুনতাম। "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী যেন লোকগুলোকে বলে? ওয়ারলি, তাই না? আপনি তো তাদের মধ্যেই কাজকর্ম করেন? আপনার নাম শুনেছি বটে! মনে হয়, ওদের অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ।" অথবা, "দুর্ভাগ্যের বিষয়, লোকগুলো সত্যিই জংগলের মধ্যে ভয়াবহ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটায়!" (ভাবটা এমন, যেন জংগলে থাকতে না হলে, এত কষ্ট হতো না, অন্যত্র থাকলে তাদের পক্ষে ভালোই হত!) "আপনিও কি জংগলের মধ্যে যেতেন না কি?" এই রকম আরও কত মন্তব্য! এর থেকে এটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে, কী ধরনের দমন-পীড়ন তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হতো সে বিষয়ে সাধারণ মানুষের কোন ধারণাই ছিল না। সভা-সমাজের কাছে আতংকে শিহরণ সৃষ্টিকারী সেই সব নৃশংস-কাহিনী!

কোন ওয়ারলি গ্রামে নৈশ-অবস্থানকালে, প্রায়ই সন্ধ্যাকালটা একই ধরনের রুটিন মাফিক কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে কাটত, সেটা যেন অভ্যাসের সামিলই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের বাইরে একটা চারপায়ার উপর বসতাম আমি, আর ওয়ারলিরা আমার চারদিক ঘিরে ধূমপান সহযোগে আসর জমাত। অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্পগুজব চলত। টাট্‌কা ঘটনাগুলো একের পর এক বলে যেত, সেই ফাঁকে চলত নানারকম প্রশ্নোত্তরের পালা। এই সব মামুলি বৈঠকের মাধ্যমে ওয়ারলি-জীবনের নানান চিত্র আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। জমিদার-প্রসংগেও অনেক কথাই জানতে পারতাম।

উম্বর গাঁও তালুকের বাডী (Bardi) গ্রামে, একবার কর্মসূত্রে কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। গ্রামবাসীরা একবার সংবাদ পাঠাল, "দয়া করে এক

সময় একবার আমাদের এখানে আসুন।" এ ধরনের কোন আহ্বান এলেই, যত শীঘ্র সম্ভব সেই গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতাম। সেখানে গিয়ে তাদের অভিযোগ, অসন্তোষ, দুঃখকষ্টের কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। অনেক সময় দেখা যেত, আমার উপস্থিতি ও সহানুভূতি তাদের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে পেরেছে। খুব খুশী হত তারা। কখনো কখনো আমার উপস্থিতিই জমিদারের অবৈধ জুলুমের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধা হিসাবে কাজ করত। এতে ওয়ারলিরাও কিছুটা খুশী হত। এমন বহু গ্রামের আমন্ত্রণ-লিপি, সব সময় আমার ব্যাগের মধ্যে থাকত। মনে মনে খুশী হলেও, বাইরে কিন্তু তার কোন প্রকাশ ঘটতো না। নিজেকে জাহির করাব অভ্যাস তাদের ছিল না, বহির্মুখী প্রকৃতি তাদের নয়। অনেক সময় তাদের মানসিক গতি-প্রকৃতির স্বরূপ অনুমান করা রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ত। কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রেই তাদের খুশির সংকেত বোঝা যেত। যখন তাদের গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতাম, ক্ষেত-খামারে কর্মরত ওয়ারলিরা আমাকে দেখার জন্য কাজ ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াত, তাদের মধ্যে কয়েকদিন থাকবো শুনলে সত্যিই খুশী হয়ে উঠত, আর সেই খুশির ঝলক্ চোখের তারায় অগ্নি-চমক সৃষ্টি করত। আমি কার বাড়িতে গিয়ে উঠবো, থাকবো—তা তারা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে ঠিক করে নিত, তারপর কৃষির সরঞ্জাম বা অন্যান্য উপকরণাদি অন্য কাউকে দিয়ে, তার উপর দায়িত্ব ভার অর্পণ করে আমায় বলত, "চলুন, বাড়ি চলুন।" বলেই সোজা রওনা হতো। এমন কি তখনো তেমন কথা বলত না, নীরবেই সাধারণত বাড়ির দিকে এগিয়ে চলত।

দাসত্বের দণ্ড

বাডী' গ্রামে ভূস্বামীর একটা বাড়ি ছিল। ভূস্বামীর একটা স্থায়ী নিয়ম চালু ছিল যে, তার ক্ষেত-খামারে প্রতিদিন নিয়মিত-ভাবে ওয়ারলিদের কাউকে কাউকে কাজ করতে হতো, অবশ্যই বিনা পারিশ্রমিকে। প্রতিটি ভূমিদাসের 'বেগার কাজ' নিশ্চিত করার জন্য, ভূস্বামী তার প্রজাদের একটা লৌহ দণ্ড দিয়েছিল। ওয়ারলিরা একে বলত 'দাসত্ব-দন্ড' বা 'বেগার দণ্ড' (Vethi Pole)। গ্রামের ঘরে ঘরে এই 'বেগার দণ্ড' চক্র-ক্রমে পাঠানো হতো। যার ঘরে এই দণ্ড পেঁছে দেওয়া হতো, সেই ঘরের প্রতিটি লোককেই পরের দিন জমিদারের বাড়িতে বেগার খাটতে যেতে হতো। আদেশমতো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, বাধ্যতা-মূলক শ্রমদান করতে হতো। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে তারা বেগার-দণ্ডটি পাশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিত। এইভাবে সারা বছর ধরে 'বেগার দণ্ড' বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত। এমনি করেই, বংশ পরম্পরায়, এই প্রথার আবর্তন

চলে এসেছে। কর্তব্য-কর্মের এই নিয়মিত ধারায় তারা এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে প্রত্যেকেরই প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল—কোন শুভদিনে তার বাড়িতে দণ্ড-এর আবির্ভাব হবে, আর তাদের বেগার খাটতে যেতে হবে। এই পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই, প্রত্যেককেই নত মস্তকে মানতে হবে, বিনা মজুরিতে শেঠজীর জমিতে গিয়ে প্রতিটি ভূমিদাস-প্রজাকেই কাজ করতে হবে।

যে ওয়ারলির বাড়িতে আমি থাকবো বলে গিয়েছিলাম, ঠিক সেই দিনই সে 'দণ্ড'-প্রাপ্ত হয়েছিল অর্থাৎ, তার বাড়িতে 'বেগার দণ্ড' এসে হাজির হয়েছিল। যখন গিয়ে পৌঁছালাম, তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে। বাড়ির আশেপাশে কোন মেয়েকে দেখতে পেলাম না। বাড়িতে কোন মেয়েই নেই না কি? সেই ওয়ারলি গৃহস্বামীকে জিগ্যেস করলাম, "কোথায় গেছে তোমার ঘরোয়ালী" আমার প্রশ্নে, পিতাপুত্রে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণভাবেই পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ঠিক কী ঘটেছে, তা বুঝে উঠতে বা অনুমান করতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দেখি, ঘরের এক কোণে একটি মেয়ে জ্বরের প্রকোপে গোঙাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই উঠে বসার চেষ্টা করল। "তোমার শরীর ভাল নেই, চুপচাপ তুমি শুয়ে থাক"—এই বলেই বাইরে চলে আসার জন্য ফিরেছি, হঠাৎ মেয়েটি করুণভাবে কেঁদে উঠল। "বেগার-দণ্ডের" আবির্ভাবের জন্য আদেশনুসারে, তাদের সকলেরই সেদিন কাজে যাওয়া উচিত ছিল। মেয়েটি জ্বরে অসুস্থ বলেই সেদিন কাজে যেতে পারেনি। এতে ভূস্বামী তো একেবারে ক্রোধে-অগ্নিশর্মা, সংগে সংগে তার সর্দারকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সর্দার মেয়েটির ঘরের মধ্যে ঢুকেই, তার উদ্দেশ্যে গালি-গালাজের গোলা-বর্ষণ শুরু করে দিল, সজোরে মেয়েটির পিঠের উপর দু ঘুষি বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করতে করতে তাকে টেনে হিঁচড়ে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। প্রাণপণে যুঝল মেয়েটি, কিন্তু পেরে উঠল না। তারপর সর্দার ঘরের মাচানের উপরে উঠে যে সামান্য ধান কটি ছিল এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র যা কিছু দেখতে পেল, সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করে দিল। মেয়েটি অসহায়ের মতো আর্তনাদ করে উঠল, অনেক কাকুতি-মিনতি করল, হাতে পায়ে ধরল, কিন্তু এত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও, কোন রকম ভ্রূক্ষেপ বা কর্ণপাত না করেই, সেই চণ্ড-সর্দার মেয়েটিকে টানতে টানতে জমিদারের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে শেঠ বাহাদুর আবার গালি-গালাজ দিতে লাগল, চিৎকার করে উঠলো, "এ তোর ভণ্ডামি! জ্বর হয়েছে? মোটেই না, কিস্যু হয়নি তোর। যত সব অকর্মার ধাড়ী! শুধু ফোকটে খানা চাই? না?"

জ্বরের উত্তাপে মেয়েটির গা পুড়ে যাচ্ছিল তবুও মেরে পিটে, জোর করে, তাকে কাজ করতে বাধ্য করা হল। এই অবস্থায় কাজ করতে করতে যখন সে একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ল, তখন তার স্বামীকে বলা হ'ল "যা। এবার ওকে ঘরে রেখে আয়। বাড়িতে তাকে রেখেই তক্ষুনি আবার সে কাজে ফিরে গিয়েছিল। এ যদি সে না করত, তাহলে তাকেও উত্তম-মধ্যম দেওয়া হত। তাদের এই রকম পরিস্থিতিতে আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। স্বভাবতই, আমাকে দেখে মেয়েটি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল। গ্রামের মানুষ সব ঘৃণায় ক্রোধে ক্ষেপে উঠেছে, তাদের চোখের সামনেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। সক্রোধে নিজেদের মধ্যে চুপচাপ আলোচনা করেছে, কিন্তু পরিস্থিতির মোকাবিলা করার কোন পথ তারা খুঁজে বের করে উঠতে পারেনি। হৃদয় জ্বলছিল তাদের, প্রচণ্ড ক্রোধকে বুকের মধ্যে স্তব্ধ করে রেখে। ঘাড় গুঁজে তারা কাজ করে গেছে।

সেই রাতে আমি ওই গ্রামেই থেকে গেলাম। সবাইকে বললাম, "কেউ তোমরা বেগার খাটতে যাবে না। বিনা মজুরিতে কাজ করিয়ে নেওয়ার সুযোগ, জমিদারকে মোটেই দেবে না। আর ঐ পীড়িত মেয়েটিকে কোন মতেই কাজে পাঠানো চলবে না। শেঠজী যদি তার জন্য তোমাদের কিছু বলে বা কৈফিয়ৎ চায়, তাহলে তাকে আমার নাম করে বলবে যে আমি এ কথা বলে গিয়েছি। তবুও যদি জবরদস্তি করে, জোর ফলাতে আসে, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমায় খবর দেবে।" যতটা পারি এই ধরনের পরামর্শ ও আশ্বাস দিয়ে পরদিন সকালে আমি অন্য গ্রামে চলে এলাম।

আমি 'বাসা' (Vasa) গ্রামে রূপজী নামক কৃষকের বাড়িতে থাকার পরিকল্পনা করেছিলাম। আগেভাগেই আমার যাওয়ার সংবাদ তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার যাওয়ার পূর্বাভাস পেয়েই সে বহু কষ্টে চা-পাতা, চিনি আর দুধ সংগ্রহ করে রেখেছিল। তার প্রস্তুতি দেখে বললাম, "রূপজী। এত সব জিনিস আবার কষ্ট করে যোগাড় করতে গেলে কেন ? এ ঠিক হয়নি। তুমি তো জান, আমি দুধ ছাড়াই, এমন কি গুড়ের চা-ও খেতে পারি।" রূপজী সংগে সংগে জবাব দিল "বহিনজী, এমন একদিন ছিল, যখন শুধু মার খেয়েছি, ভয়ে সব সময় জুজু হয়ে থেকেছি, না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে দিন কাটিয়েছি ; এমন একদিন গেছে—যেদিন নিজের জমিতে নিজের হাতে লাগানো আম গাছের মোটে একটা আম খেয়েছিলাম বলে পিঠে চাবুক মেরে মেরে রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছিল। আর, আজ ? আজ তো রোজই অন্ততঃ একবাটি করে তরল ভাতের মাড় খেতে পাই, আমার নিজের গাছের আম পেট ভরে খেতে পাই। এই সবই তো লালকাণ্ডার

দৌলতেই পেয়েছি। তাহলে, আপনার জন্য অন্ততঃপক্ষে এক কাপ চা-এর ব্যবস্থাও করা উচিত নয় কি ?”

তারপর সে গড়গড় করে সেই কাহিনীর ইতিবৃত্ত বলে গেল—কীভাবে শুধু একটা আমের জন্য তাকে প্রহার দেওয়া হয়েছিল। আম গাছে মুকুল আসার সংগে সংগে জমিদার গাছ পাহারা দেওয়ার জন্য সেখানে একজন প্রহরী মোতায়েন করত। শুধু তাই নয়, চুরির হাত থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য, গাছের গুঁড়ির চারদিকে কাঁটা গাছের ডালপালা ছড়িয়ে রাখত। প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ পাথর ছুঁড়ে আম নীচে ফেলতে পারলেও, কাঁটাজাল থাকার জন্য সেখান থেকে সেটা কুড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হত না। একদিন, রূপজীও আম খাওয়ার লোভ সামলাতে পারল না। কাছাকাছি কাউকে দেখতে না পেয়ে, সে তো পাথর ছুঁড়ে একটা আধ-পাকা আম পেড়ে খেতে আরম্ভ করল। হঠাৎ প্রহরী যেন আকাশ থেকে নেমে এসে বাজ-পাখির মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে, ঘাড় ধরে টানতে টানতে তাকে ভূস্বামীর কাছে নিয়ে চলল, সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে আমটাও নিয়ে গেল। শেঠ্জী সব শুনে রূপজীকে শণ-জাতীয় ছাল থেকে একটা দড়ি পাকাতে নির্দেশ দিল। যে আমগাছ থেকে সে আম চুরি করে পেড়েছিল, সেখানেই তাকে নিয়ে এল তারা। তারপর সেই গাছের সংগে তারই পাকানো দড়ি দিয়ে তাকেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নির্দয়ভাবে তার উপর চাবুক মারতে লাগল, গায়ের ছাল-চামড়া একেবারে তুলে ফেলল। প্রহারাঘাতে পশু-জন্তুর মতো সে তীক্ষ্ণ-চীৎকার করতে লাগল। কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে আনতে তার সাহায্যে এগিয়ে আসার মতো সাহস কারুর হল না। শেঠজীর হৃদয়-বত্তা বলে কিছুই ছিল না, সম্পূর্ণ পাথর হয়ে গিয়েছিল। সেই আর্ত চিৎকার ও ক্রন্দন তার মনের মধ্যে আদৌ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারল না। তখনকার দিনে অধিকাংশ জমিদার ও মহাজনের বাড়ির দেউড়িতে সবসময় একটা চাবুক ঝুলিয়ে রাখা হতো। এই চাবুক ওয়ারলিদের কাছে গোলামির জ্বলন্ত প্রতীক। তারা কেউ কোন রকম একটু ট্যাঁ-ফু করার সাহস করলেই তার কপালে চাবুকের মার জুটত। ওয়ারলিরা একে বলত ‘খোঁয়াড় বন্ধ করে’ পেটানো, সত্যিই প্রভুদের হাত থেকে যেরকম ‘উত্তম-মধ্যম’ প্রহার খেতে হতো, তাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে চাইলে ঐ শুধু প্রহার শব্দটা কেমন যেন জলো জলো মনে হয়, বরং ‘খোয়াড়ে বেঁধে পেটানো’ শব্দটাই আরও যুক্তিসংগত। কারণে অকারণে ওয়ারলিদের হাত-পা বেঁধে উত্তম-মধ্যম প্রহার করা, এ যেন ভূস্বামীদের কাছে জলভাতের মতো সাধারণ রুটিন-মাফিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক যেমন যান্ত্রিকভাবে বারান্দা বা

অংগন ঝাড়ু দেওয়ার মতো নিত্য-নৈমিত্তিক মামুলি কাজ লোকে করে থাকে সেই রকম। নীতি বা বিবেকের দিক থেকে কোন রকম দ্বিধা বা সংশয় তাদের মানসিক প্রশান্তিতে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে পারত না। মানুষ মানুষকে বেঁধে মারবে এই বর্বরোচিত কাজ যে তাদেরই অসভ্যতা আর আপ-জাত্যেরই লক্ষণ—এ সম্বন্ধে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ তারা কল্পনাও করতে পারত না। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়—"ও শালাদের মারাই উচিত"—এই মনোভাবকে তারা খুব বাহাদুরি বলেই মনে করত। এই রকম নিয়মিত মারধোর ছাড়াও আরও উন্নত ধরনের দমন-পীড়নের নানা রকম কলা-কৌশল তাদের উর্বর মস্তিষ্ক-কোষ থেকে জন্মলাভ করত।

কোন একজন ভূস্বামীর মনে হয়তো বাসনা জাগল—তিনি তার নিজের জমি ও প্রজার জমির মধ্যে যে "আলের" সীমারেখা আছে, সেটার একটু পরিবর্তন করবেন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, নিজের জমি বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য প্রজার জমির দিকে জোর করে একটু এগিয়ে যাওয়া। প্রজা তো মোটেই রাজী নয়, সে মানতে চায় না। অতএব, জমিদারের বাড়িতে তাকে ধরে এনে, তারই লম্বা লম্বা চুল দিয়ে ঘাড় গুঁজে দিয়ে, তারই পায়ের সংগে বেঁধে দুমড়ে দুভাজ হয়ে যাওয়া দেহটার উপর আগাপাছতলা চাবুক চালানো হল। [তখনকার দিনে প্রায় সব ওয়ারলিরাই মাথায় লম্বা লম্বা জটার মতো চুল রাখত]। এই ভাবের অত্যাচারে ওয়ারলিদের খুব দ্রুত বাগ মানানো যেত। "পা—আর মাথা" একসংগে নিজের চুল দিয়েই বাঁধা ওয়ারলি রেহাই পাওয়ার জন্য ভূস্বামীর খুশিমতো, তার সব কিছু করতেই রাজী হয়ে যেত। এইভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া হতভাগ্য কৃষকের কাছে কোন গত্যন্তর থাকত না। তখন ভূস্বামী বলত, "এই তো বাবা! পথে এসেছ! খুব ভাল কথা! ফের যদি এই রকম গররাজী হও, তো জান নিয়ে নেবো একেবারে।" আদিবাসীটাকে এইভাবে ধমকে দিয়ে তারপর ছেড়ে দেওয়া হতো।

আর একজন আদিবাসীকে একবার পায়ে বেঁধে গাছের উপর থেকে মাথাটা মাটির দিকে করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক তার নীচেই মুখের কাছে আগুন জেবলে তার মধ্যে লংকা দিয়ে দেওয়া হল। তার অপরাধ—সে বেগার খাটতে যেতে অস্বীকার করেছিল। লংকার ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে এল। তারপর পিঠের উপর পড়তে লাগল চাবুকের পর চাবুক। অসহ্য যন্ত্রণায়, মরণ আর্তনাদে সে যখন প্রাণভিক্ষার জন্য বার বার কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, মাত্র তখনি তাকে মুক্তি দেওয়া হল।

ভূস্বামী ও তার সর্দারের অত্যাচারের কবল থেকে আদিবাসী মেয়েরাও রেহাই পেত না। ওয়ারলি-জীবনের সীমাহীন নারকীয় যন্ত্রণার ভাগ তাদেরও ভোগ করতে হত। ইতিপূর্বেই বলেছি—ভূস্বামীরা তাদের প্রজাদের পত্নী ও ভূমিদাস বেগারদের পত্নীকে একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেই মনে করত। আপন খেয়াল-খুশি মতো যখন-তখন এই সব মেয়েদের উপভোগ করার অধিকার, যেন তাদের জন্ম-জন্মান্তরের অধিকার—একথা দৃঢ়ভাবেই তারা বিশ্বাস করত, বুক ফুলিয়ে তা ঘোষণা করত। কাজে-আসা মেয়েদের সংগে নির্লজ্জ কামুকের মতো বেহায়াপনা করা, অশ্লীল মন্তব্য করা, যখন তখন তাদের গায়ের উপর ঢলে পড়া, চিমটি কাটা, একান্তে কাউকে ঘিরে ধরে তার শ্লীলতাহানি করা, ইজ্জত লুটে নেওয়া—এ সব তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

নিজের চোখে আদিবাসীরা এ সব দেখত। বলত, "বহিনজী, আমরা সব কিছুই বুঝতে পারতাম, কিন্তু কী করবো, কোন উপায়ই যে নেই।" ভূস্বামী আর জংগলের ঠিকাদাররা সব সময়ই তাদের যৌন-লালসা চরিতার্থ করতে আদিবাসী মেয়েদের ব্যবহার করত। জমিদার ও আদিবাসী মেয়েদের এই ধরনের অবৈধ সম্পর্ক এমনি একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠলো যে, নতুন একটা প্রজন্ম সৃষ্ট হল, তাদের অবৈধ সন্তান-সন্ততিদের একটি বিশেষ নামকরণ করা হল। তাদেরকে বলা হত 'ওয়াটলাস' (Watlas)—একটা বিশেষ জাত। অহিন্দু-জমিদারদের অবৈধ বংশধরদের কেবল এই নামে অভিহিত করা হত। কিন্তু এই 'ওয়াটলা' জাতির সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, হিন্দু-জমিদারদের অবদানের পরিমাণও নেহাৎ কম নয়।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সীমানায় মামাকওয়াড় (Mamakwad) নামে একটি গ্রাম ছিল। তখন এই গ্রাম বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্তমানে গুজরাট রাজ্যের সীমানাভুক্ত। একদিন বিকেলে, আমরা সেখানে একটা সভা করছিলাম। অনুভব করছিলাম অন্যান্য সভার মতো এই সভার মধ্যে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে না। কোথায় যেন একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সেই গ্রামে ওয়ারলি, দুবলা (Dublas) ও ধোড়ী (Dhori) সম্প্রদায়ের বসবাস [দুবলা ও ধোড়ী আদিবাসীদের দুই উপজাতি]। শক্তিশালী ভূস্বামীদের সুরক্ষিত দুর্গ-ভূমি নারগোল ও খাত্তালওয়াড়ের লাগোয়া এই গ্রামের চাষীরাও বেশ ভীত-সন্ত্রস্ত ও অবদমিত হয়ে থাকত। কোন জংগলে হঠাৎ কোন শিকারান্বেষী বাঘ এসে পড়লে ঘাস খাওয়ার জন্য চারণ-রত গবাদি পশুর

মধ্যে যেমন একটা সন্ত্রস্ত ও সতর্কতার চিত্র ফুটে ওঠে, এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যেও ঠিক এই রকম একটা সাদা-সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠেছিল।

কমরেড বীরকর ও আমি রাত্রিতে ঐ গ্রামেই থেকে গেলাম। আশা করেছিলাম, রাত্রিতে লোকগুলো আমাদের কাছে আসবে, তাদের সংগে মশগুল হয়ে বৈঠকী গল্পের আসর জমাব। ভেবেছিলাম, তাদেরকে আরও উদ্দীপিত করে তুলতে পারবো। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কেউ এসে হাজির হল না। অবশেষে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কয়েকজন এল। এমনকি, যে বাড়িতে আমরা ছিলাম, সেই গৃহস্বামীও বেশ আতংকগ্রস্ত। বাড়ির বাইরে আগুনের পাশে বসে বসে তাদের সংগে কথা বলতে লাগলাম। গভীর রাত্রিতে এক দম্পতি তাদের একটা অভিযোগ নিয়ে হাজির হল। স্পষ্টই বোঝা গেল, আমার সংগে দেখা করতে আসার আগে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। "আমার কাছে আসাটা উচিত হবে, না অনুচিত হবে এবং এলে তার পরিণামটাই বা কী হবে"—এ বিষয়ে তাদের পরামর্শদাতারা নিশ্চয়ই বহু তর্কবিতর্ক করেছে। চার-পাঁচ দিনের একটা নবজাত শিশুকে কোলের মধ্যে নিয়ে মেয়েটি এসেছে। বাচ্চাটা জম্মানোর তিন দিন পরেই ভূস্বামী প্রসূতি-মাকে কাজে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। কাজে যেতে সে পারেনি। ভূস্বামী তখন ইনিয়ে বিনিয়ে নানান বাগ্-বিস্তার করে তাকে লোভ দেখিয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার মুখের উপর পটাপট চড়-চাপড় চালাতে লাগল, কোলে তখনো তার সেই নবজাত শিশু। তারপর তাকে অশ্লীল বিদ্রূপ বাক্যে জর্জরিত করে পরের দিন আবার কাজে আসার আদেশ দিল। পরদিনও যখন সে যেতে পারল না, তখন জমিদার তার স্বামীকে ধরে পিটিয়েছে। সেই মুহূর্তে আমরা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। জমিদারের বাড়িতে বেগার খাটতে নিষেধের কথা বললে কোন ফল হবে না তখন। কারণ তাদের মধ্যে কোন একতা নেই; আবার খুবই আতংকগ্রস্ত তারা। মেয়েটিকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আশ্বাস-সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। পরের দিন মেয়েটিকে সংগে করে আমাদের খাত্তালওয়াড় কার্যালয়ে ফিরে এলাম। তারপর থানায় গিয়ে তার নামে একটা রিপোর্ট লিখে অভিযোগ পেশ করলাম। আদালতেও তেমন কোন সুরাহা হল না, সেই চিরাচরিত স্তোকবাক্য "এ ব্যাপারে কি করা যায় ভেবে দেখা হচ্ছে, তোমার জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা হবে।" মেয়েটি এইটুকু সান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই পেল না। সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের সংগে চক্রান্ত করে জমিদার শুধু দিন চাইতে লাগল; এইভাবে দিন পেয়ে পেয়ে শুনানীর দিন অসংখ্যবার স্থগিত রাখা হল। জমিদারের কাছে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত, তাই ভয়ে গ্রামবাসীরা

কেউই মেয়েটির সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে এগিয়ে আসতে সাহসী হল না। মেয়েটি দারুণ হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে আটকে পড়ল। যখন তখন ছোট্ট শিশু-সন্তানটিকে সঙ্গে নিয়ে তিন চার মাইল পথ হেঁটে খাত্তালওয়াড় আসতে হতো। সেখান থেকে আমি তাকে উশ্বরগাঁও আদালতে নিয়ে যেতাম। যাওয়ার পথে একটা খেয়া পার হতে হতো। মামলা দায়ের হওয়ার পর জমিদার একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কাজেই, নিঃসন্দেহে আমরা জমিদার থেকেও একটু সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু এতদূরে পথ বাচ্চা নিয়ে হাঁটাহাটি করে করে মেয়েটিও কয়েকদিন পরে হতাশ হয়ে পড়ল। শুনানীর সময় হাজিরা দেওয়া বন্ধ করে দিল। তারপর আমিও কেসটির সংযোগসূত্র হারিয়ে ফেললাম। পরে কী হল—জানি না, কোন খবরও রাখতে পারিনি।

"চার-পাঁচ দিনের নবজাত 'শিশু-কোলে প্রসূতিকে' ভূস্বামী চপেটাঘাত করেছে"—এই কাহিনী শোনার পর, বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। খুব খারাপ লেগেছিল আমার। পুরো ঘটনাটা প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেক করে। আর ঐ নিগ্রহের বোঝাকে মুখ বুজে সহ্য করে নেওয়ার জন্য কৃষকদের উপরও আমার ক্ষোভ জেগে উঠত। কেন যে তারা এমন নির্বিকার, উদাসীন, একেবারে বোধশক্তিহীন, তাদের সংগ্রামী মনোভাবের এমন অভাবের কারণ কী—কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ক্ষোভে-ক্রোধে তাদের সামনে অনেক কথাই বলেছি। সব মন দিয়ে শুনে গেছে, কিন্তু চোখে-মুখে প্রতিক্রিয়ার কোন চিহ্নই খুঁজে পাইনি। ঐ এলাকায় একজন স্থায়ী 'কর্মী-সংগঠক' নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। ভূস্বামীদের খুব কাছাকাছিই এরা বাস করে। তাই গ্রামবাসীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র অবাধ্যতার প্রকাশ ঘটলেই ভূস্বামীদের সঙ্গে তাদের নিত্য-বিরোধ তো লেগেই থাকবে। সেই জটিল অবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সময় একজন সর্বক্ষণের কর্মীর ঐ এলাকাতেই থাকা দরকার। যে ভাবে কাজ চলছে তার থেকেও বেশী সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন তাদের আছে। তাদের সহযোগিতা করবে—আন্দোলনের পথনির্দেশ করবে এমন কোন কর্মী তখন আমাদের ছিল না যাকে আমরা ওখানে স্থায়ীভাবে বসাতে পারি। সেই জন্যই তো আদিবাসীদের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের এত অভাব ছিল। আমরা তাদের জন্য যতটুকু করার চেষ্টা পেয়েছি, তার ফলে তাদের হয়রানি শুধু আরও বেড়েই গেছে। কাজেই, তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমরা পরিস্থিতির উপর অযথা বেশী হস্তক্ষেপ করব না—এই সিদ্ধান্ত নিলাম। এই জন্যই আমাদের সংগঠন ও পরবর্তী আন্দোলনের ক্ষেত্রে

ঐ এলাকাটায় যোগসূত্র খুব দুর্বল থেকে গিয়েছিল। আজ পর্যন্তও তাই থেকে গেছে।

আদিবাসীদের সংগে গবাদি পশুর মতো আচরণ

কাওয়াড় (Kawad) গ্রামে অবস্থানকালে যে ঘটনা শুনেছিলাম তা যে কোন মানুষকেই মানসিক আঘাত দিতে পারে। সে সময়টা আবাদ-কার্যের সময়। আবাদের আগে অর্থাৎ ধান রোয়ার পূর্বে, ক্ষেতে ভাল করে লাঙল করে জলভরা জমিতে পা দিয়ে কাদা মাড়িয়ে, হাটুভোর চাষের মাটি প্রস্তুত করতে হয়। ঐ কাদা-মাটি যত নরম হবে, ফসল তত ভাল হবে। এভাবে জমিতে লাঙল দেওয়া, জমি কাদা করা এবং চারা রুয়ে দেওয়ার কাজে ওয়ারলি-দের ভেটিয়া (Vethyas) হিসাবে কাজে লাগাত। একবার জেঠু নামে এক কিষাণের বসন্ত হয়েছে। প্রচণ্ড জ্বর, এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে—দাঁড়াতেই পারে না। জমিদারের একজন মুখ্তিয়ার [কর্মচারী বিশেষ] তাকে কাজে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার ঝুগ্গীর [খুব ছোট ঘর] মধ্যে ঢুকে পড়ল। ধমকের সুরে বলল, "সহজ কথায় কাজে না গেলে তোকে আমি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাব। আর সেখানে জোয়াল কাঁধে দিয়ে, হালের সংগে জুড়ে দেবো।" জেঠু ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে তার সংগে বাইরে বেরিয়ে এল। আমি তখন সেই গ্রামেই ছিলাম, এ কথা শুনতে পেয়ে সে লোকটির দৃষ্টি এড়িয়ে কোন রকমে আমার কাছে চলে এল। এসে বলল—যদি সে কাজে না যায় তো জোয়ালের একপাশে বলদ, আর একপাশে তাকে জুড়ে দিয়ে হাল টানতে তাকে বাধ্য করা হবে। তার কথায় বিশ্বাস হল না। আবার আমায় বলল—আমি যদি নিজে গিয়ে সেখানে হাজির থাকি, তাহলেই মাত্র সে ঐ পীড়নের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এমন অমানুষিক, বর্বর কাজও যে সম্ভব হতে পারে—সেই কথা বিশ্বাস করানোর জন্য ঝিংপর চৈত্যা নামে একজন ওয়ারলিকে ডেকে পাঠালাম। ঝিংপরের কাছ থেকে সব শুনে তবেই মাত্র আমি বিশ্বাস করতে পারলাম যে, জমিদার-সাহুকরের ধারণা মতো বলদ ও ওয়ারলির মধ্যে বিশেষ কোন গুণগত পার্থক্য নেই।

শেঠ নাসেরওয়ানজীর সর্দারের জমিতে চাষের কাদা করার জন্য ঝিপ্পর এবং আরও আট-দশজন ওয়ারলি কিষাণকে ডেকে পাঠিয়েছিল। চাষের কাদাকে যথাসম্ভব নরম করার জন্য সারাদিন ধরে তারা পা দিয়ে দলিত-মথিত করেছে। এমন কি দুপুরে খাওয়ার জন্যও তারা ছুটি পায়নি। পিপাসার্ত হলে খুব সন্তর্পণে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী একটা কূপ থেকে জল খেয়ে আসতে হতো। এসব কাজ খুব তাড়াতাড়ি সর্দারের দৃষ্টি এড়িয়ে

সেরে আসতে হয়। কারণ ক্ষেতি থেকে বাইরে জল পান করতে গিয়ে কেউ যদি সর্দারের কাছে ধরা পড়ে যায়, তাহলে সর্দার তাকে লাঠিপেটা করে একেবারে ভূতলশায়ী করে ফেলত, আর গালি-গালাজ শুরু করে দিত—"বেটা জারজ, সকালে কাজে আসার আগে কেন জল খেয়ে আসিস নি? কার হুকুমে ক্ষেতির কাজ ছেড়ে জল খেতে বাইরে যাচ্ছিস?" সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি বলদগুলো মাঠ থেকে বাইরে ইতস্ততঃ ভাগতে শুরু করল। চিৎকার করে উঠল সর্দার, "বলদগুলোকে আবার ধরে এনে সঠিকভাবে ক্ষেতির কাদা কর।" এই কথায় ঝিপ্পের বলে ফেলল, "ক্ষেতে এত কাঁটা, কী করে বলদগুলোকে জমিতে সামলে রাখব?" অলক্ষিতে এই উত্তর শুনেই শেঠজীর আর একজন চাকর বাড়িতে গিয়ে ভূস্বামীর মেহ্তার (Mehta) কাছে ব্যাপারটা অভিযোগের আকারে বলল। মেহ্তা তৎক্ষণাৎ মাঠে এসে হাজির। এসেই মুখের উপর কথা বলার দুঃসাহসের জন্য শাস্তি ঘোষণা করল। তখন মাঠে একটা হাল চালানো হচ্ছিল। জোয়ালের একদিকে একটা বলদ, আর অপরদিকের বলদটাকে খুলে দিয়ে তার জায়গায় ঝিপ্পেরকে জুতে দেওয়া হলো। সেই হাল ঝিপ্পের আর একটা বলদকে টানতে হবে। সারাদিন কাজ করেছে, কোন বিশ্রাম কপালে জোটেনি। খুব পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল ঝিপ্পের। তবুও কোন রকমে হাল টানছিল, পারছিল না ঠিকমত। সেজন্য তার শাস্তিস্বরূপ সর্দার তাকে অংকুশ [চার পাঁচ ফুট লম্বা ডাণ্ডা, একদিকে মুখটায় কীল লাগানো থাকে] দিয়ে আঘাত করতে লাগল, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। এমন রক্তস্নানের মধ্যেও ঝিপ্পের কোন রকমে ক্ষেতের চারদিকে দুবার হাল টানল। তারপর মেহতা ধমকে উঠল, "কিরে ব্যাটা—আর কাজে ফাঁকি দিবি, কাম চুরি করবি?" অন্যান্য ওয়ারলিদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখলি? ভাল করে দেখে রাখ। কাজ ঠিকমত না করলে তোদের বরাতেও এমন সাজা জুটবে।"

এই ঘটনার বিবরণ শুনে জমিদারদের প্রতি আমার ঘৃণা-বিদ্বেষ বহুগুণ বেড়ে গেল। এরপর অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল। প্রতিরোধ আন্দোলন আরও জোরদার করার জন্য ওয়ারলিদের সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রামী করে তুলতেই হবে—এই বিষয়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলাম। সে রাত্রিতে আরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি।

আদিবাসীরা নিরক্ষর। কোন হিসাব নিকাশের জ্ঞান ছিল না তাদের। লেনদেনের সমস্ত হিসাব ভূস্বামীই রাখত। ভূস্বামীরা আপন খেয়ালখুশিমতো ওয়ারলিদের নামে বাকী-বকেয়ার হিসাব বসিয়ে রাখত। আর সেই হিসাবমতো পাওনা মিটিয়ে দিতে না পারলে, বা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে

তাদের স্বেচ্ছামতো শাস্তিবিধান করত। এমনি এক শাস্তির প্রক্রিয়া—যা একজন নিয়মভঙ্গকারীকে ভোগ করতে হয়েছিল বলে শুনেছিলাম তাই বর্ণনা করছি। অপরাধীকে ভূস্বামীর দালালরা মাটিতে আছড়ে উপুড় করে ফেলে তার পিঠের দিকে একটা কাঠের মুষল দেহের আড়াআড়ি চাপিয়ে দিল। তারপর মুষলের দুইদিকে দুজনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। যতক্ষণ না অসহ্য যন্ত্রণায় লিখিত বকেয়া স্বীকার করে তা মিটিয়ে দিতে রাজী না হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদুটো মুষলের উপর নাচতে থাকলো। মুমূর্ষু অবস্থায় বকেয়া কবুল করলে তারপর ছেড়ে দেওয়া হলো। এমন নারকীয় শাস্তি বিধানের কথা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। বিস্ময়াহত হয়ে ভাবছিলাম—"এই জমিদারগুলো কি মনুষ্যপদবাচ্য, না এক একটি নরপিশাচ"।

ওয়ারলি কিষাণের ওপর এমনতর বহুবিধ দমন-চক্র চালানোর পরও, শুধু তাতেই সন্তুষ্ট না থেকে, যথেষ্ট হল না বিবেচনা করে, চরম বিধান স্বরূপ অনেক সময় তাদের বলির পশুর মতো হত্যা পর্যন্ত করতে দ্বিধা করত না। প্রায় সব ভূস্বামীরই লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র থাকত, অধিকাংশেরই নিজস্ব বন্দুক ছিল। আদিবাসীদের মধ্যে সব সময় একটা আতংক ভাব সৃষ্টি করার জন্য প্রায়ই তারা বন্দুক থেকে ফাঁকা আওয়াজ করত। আদিবাসীদের গুলি চালিয়ে খতম করে দিলেও, কেউ কোন কৈফিয়ৎ চাইবে না—একথা তারা ভাল করেই জানত। সেই জনাই বাক্‌পটুর মতো সোজাসুজি ধমকের সুরে বলত, "আমার সংগে কোন রকম গরবর করেছো তো একেবারে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব"। এইরকম শাসানিতে সবসময় ওয়ারলিরা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত, এই সন্ত্রাস খুব বাস্তব সত্য বলেই তারা ধরে নিত—কারণ এটাই তাদের অভিজ্ঞতা—হত্যা করেও সে বেঁচে যাবে, কোন জবাবদিহি করতে হয় না কারুর কাছে। আদিবাসী সেবা মণ্ডলের ১৯৪৫-১৯৪৬ সালের রিপোর্টে এই প্রসংগে বহু উল্লেখ আছে: (১) "এক বছর আগে দুর্ব্যবহার থেকে বাঁচার জন্য কাজ ফেলে কয়েকজন ওয়ারলি জংগলের মধ্যে দৌড়ে পালাচ্ছিল। জংগলের ঠিকাদার আর তার লোকজন তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের উপর গুলি চালায়। পাঁচজন নিহত ও আরো কয়েকজন আহত হয়। আজ পর্যন্তও হত্যাপরাধীদের শাস্তিবিধানের কোন চেষ্টাই দেখা যায়নি।" (২) "জংগলের ঠিকাদার কাঠ-কাটার দুজন ওয়ারলি মজুরকে মারধোর করতে করতে শেষ পর্যন্ত মেরেই ফেলেছে। হত্যাকারী এখনো পর্যন্ত নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

এইসব উদাহরণ পড়ার পর, ওয়ারলিরা যা আমাকে বলেছিল—তা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে। এইসব কাহিনী শুধু ওয়ারলিরাই আমাকে

বলেনি। বিভিন্ন এলাকায় কাজ-কর্মের সময়, কিছুদিন বাদে, কিছু কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের সংগেও আমার পরিচয় হয়, আমাদের প্রতি তাদের পূর্ববর্তী ভুল ধারণার নিরসন হয়ে গিয়েছিল। তারাও অনেক সময়, আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে একান্ত গোপনীয়তার সুরে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলেছে "বহিনজী, কী বলি বলুন তো ? কিছু করার উপায় নেই। ওরা সব বড় বড় আদমী, মহাধুরন্ধর। ওরাই তো খুন-জখম করেছে। হ্যাঁ, সত্যি কথা, খুন করে সব হজম করে ফেলেছে। ঐ যে ওই অমুক ওই লোকই সত্যিই খুনী, হত্যা করে কেমন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" এই সব শোনার পর অবিশ্বাসের কোন কারণই আর থাকতে পারে না।

অত্যাচারের চরম সীমা

এই অঞ্চলে বহু-বিদিত একটি কাহিনী আমি শুনেছি। জঙ্গলের এক ঠিকাদার, একটি ওয়ারলিকে কয়লার চুল্লীর মধ্যে ফেলে দিয়ে, তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। প্রধানত আদিবাসীরাই, জঙ্গলের কাঠ থেকে কয়লা তৈরি করার কাজ করত। একেবারে পুড়িয়ে ছাই না করে ফেলে বা ভিতরে কাঁচা না রেখে ঠিক ঠিক মতো কাঠ থেকে কয়লা করার কলাকৌশল, একমাত্র আদিবাসীরাই রপ্ত করেছিল। কয়লা তৈরির সময়, ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো এক রকম শব্দ হয়। কাঠ আগুনে পোড়ানোর সময়, ঐ ধরনের শব্দ-তরঙ্গ সমান পরিমাণে বজায় রাখার জন্য, আগুনটা সব সময় সমান উত্তাপে রাখতে হয়, আর সে জন্য তাদের সদা সতর্ক থাকতে হতো।

একবার একটা কয়লা-ভাট্টী আদিবাসীদের অনবধানতায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এতে কয়লা-মালিকের খুব ক্ষতি হয়, ফলে সে এমন ক্ষেপে গিয়েছিল যে, একজন আদিবাসীকে ধরে পাকড়ে জোর করে চুল্লীর মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল। লোকটা জীবন্ত পুড়ে মরল। অনেকেই এই কাহিনী শুনেছিল বটে, কিন্তু এতে কেউ কোনো উদ্বেগ দেখাল না। আমার ভাষণের সময় প্রায়ই ঐ ঘটনার উল্লেখ করতাম। আদিবাসীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে জমিদার মালিকরা কোন রকম দ্বিধা বোধই করত না। পশুবৎ বর্বর অত্যাচারের এ এক চরম-সীমা। এর চেয়ে বেশী নৃশংস অত্যাচার আর কী হতে পারে ? এর থেকে আরও কী খারাপ কাজ সে করতে পারে ?

আর একটা ঘটনা আমি শুনেছিলাম। জানু নামে এক আদিবাসীর ভাইকে মাটির ভেতর জীবন্ত পুতে ফেলা হয়েছিল। তার স্ত্রী ছিল খুব সুন্দরী। একরাত্রে স্বামীর অনুপস্থিতিতে, ভূস্বামী মেয়েটিকে ডেকে পাঠাল।

আহবানের কারণ অনুমান করে মেয়েটি যেতে চাইল না। একটা গণ্ডগোল হল। চিৎকার শুনে প্রতিবেশী ওয়ারলিয়া এসে হাজির হল। মেয়েটিকে জোর করে ভূস্বামীর বাড়িতে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হলো। অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই সব দেখল, কিন্তু বাধা দিতে সাহস পেল না। মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়ার পর, গভীর দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে নত মস্তকে যে যার বাড়িতে ফিরে গেল। তাদের জীবনে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটত। পরের দিন বাড়ি ফিরে মেয়েটির স্বামী সমস্ত ঘটনা শুনল। লোকটা খুব সাহসী। সে গ্রামের বয়স্কদের একত্রিত করে, তাদের উপজাতির নেতা [Karbharis] নির্বাচিত করল, তারপর উপজাতিদের পঞ্চায়েতে [Panch] একত্রিত করে, ব্যাপারটা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, এই ঘটনা জানতে পেরে ভূস্বামী আবার মেয়েটিকে তার চোখের সামনে দিয়েই ধরে নিয়ে গেল। প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা, হাতাহাতি হল, কিন্তু তারা কিছুই করতে পারল না। 'প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এরপর ভূস্বামী মাটিতে একটা বড় গর্ত খুঁড়ে, তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই খানার মধ্যে জীবন্ত পুতে ফেলল। তার ভাই জানুকে ধমকে দেওয়া হল, "বাঁচতে যদি চাস তো দাদার মৃত্যু সম্বন্ধে একটা কথাও কাউকে বলবি না, তার ফল হবে কিন্তু মারাত্মক, আর যদি, কেউ কোন রকমে জানতে পারে, তাহলে তোর হাত-পা কেটে ফেলে দেবো।" জানু গ্রাম থেকে পালিয়ে গেল। তার দাদার স্ত্রীও তাই করল। গ্রামের সবাই ভয়ে চুপ মেরে গেল। কিন্তু তবুও কোন রকমে ব্যাপারটা কানাকানি হয়ে গেল, কয়েক মুঠো ধুলো উড়ল শুধু। পুলিসী অনুসন্ধান হল, তারপর বিচারের নামে চলল এক প্রহসন। সরকারী সিভিল সার্জন হাড় পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিল জানুর দাদাকে যে খানার মধ্যে পুতে ফেলা হয়েছিল, সেই খানা থেকে যে হাড় পাওয়া গেছে—সেগুলো বলদের হাড়—মানুষের নয়। আর ভূস্বামী সসম্মানে মুক্তি পেল।

ভূস্বামীরা অসহায় আদিবাসীদের পশুর পর্যায়েই ফেলত; তা না হলে তাদের সংগে পশুর মতো ব্যবহার করতে পারত না। উপরে-যা বর্ণনা দিলাম, সত্যিই তাতে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। শ্রীসামিংটন অনুসন্ধান করে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তার থেকে উদ্ধৃতি নিম্নে দিলাম। এর থেকেই আমার বক্তব্যের সাক্ষ্য-প্রমাণ মিলবে। তিনি বলেছেন—"(খ) যদি তারা (ওয়ারলি) কাজে যেতে অস্বীকার করে বা গড়িমসি করে, তাহলে ভূস্বামী তাদের উপর হামলা করত, মারধোর করত। এসব হচ্ছে ভূস্বামীর স্থানীয় দালালদের নিত্য-কর্মের মতো, তারাই মারপিট করত। বিশ্বস্তসূত্রে আমি জানতে পেরেছি, মানুষকে থামের সংগে বেঁধে চাবুক মারা হত। কিছুদিন

আগেও মানুষকে খুন করা হয়েছে, এমন জনশ্রুতিও শুনেছি। "(চ) উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগে ভূস্বামীরা কোন সংশয়বোধ করত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—নিজেদের কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য তারা কিসানদের বাড়ির মেয়েদের উপভোগ করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা পেত না।"

১৯৪৫ সালের আগে ৭৫ বৎসর কালের মধ্যে 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে' উল্লিখিত এমন একটিও অপরাধ বাকী নেই, যা ভূস্বামীরা করেনি। কিন্তু শাস্তি পেয়েছে, এমন কোন জমিদার বা মহাজনের নাম কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্নই এখান থেকে বেরিয়ে আসে—কীভাবে এতদিন ধরে এইসব অত্যাচার-অবিচার চলে এল? কোনো সরকার বা সরকারী অফিসারের কী অস্তিত্ব ছিল না? কী তারা করছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই করা যায়—অন্ততঃ আদিবাসীদের দুনিয়ায় তাদের জন্য কোন সরকারের অস্তিত্ব ছিল না। সরকার ছিল শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য, তাদের নানান দুষ্কর্মে সাহায্য করার জন্য, শোষণ ব্যবস্থায় মদত দেওয়ার জন্য। সরকারী নীতির এই নগ্ন রূপ আদিবাসী এলাকায় প্রতি পদক্ষেপে আমরা লক্ষ্য করেছি।

পাশবিক নির্যাতনের কলাকৌশল

ওয়ারলি এলাকায় ভূস্বামীকৃত খুন, জখম, অত্যাচারের হিসাব শহরবাসী কোন সভ্য মানুষের পক্ষে সহজে বিশ্বাস করা সত্যিই খুব কঠিন। এসব ঘটনা যে সম্ভব হতে পারে, তা তাঁরা বিশ্বাসই করেন না। তাঁরা প্রশ্ন তুলতে পারেন—"১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এত কিছু সেখানে ঘটে গেল, অথচ কেউ কোন খবর রাখল না, এটা কী করে সম্ভব? সরকারী অফিসার বা কর্মচারীরা কী করছিল? অথবা, সরকার নামে কোন জিনিসের অস্তিত্বই ছিল না?" এইটুকু মাত্র তাঁরা স্বীকার করেন যে, হয়তো কিছুটা জবরদস্তি বা হামলা হতে পারে, কিন্তু যে সব কাহিনীগুলো ছড়িয়েছিল, সেগুলি নিশ্চয়ই অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। তাদের উপলব্ধির জন্যই কীভাবে ঐ পরিস্থিতি এতদিন ধরে চলে আসছিল সে কথার বিস্তৃত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়েছি। এতসব কিছু বলার পর, আমতা আমতা করে তারা বলেন—"কে জানে বাবা, হতেও পারে।" এইটুকু মাত্র প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে দেখা যায়। পরিস্থিতি তো এই যা বললাম—কিছুতেই তা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারছে না। দোষ তাদের আমি দিতে পারি না। আমিও যদি ওখানে গিয়ে নিজে প্রত্যক্ষভাবে না দেখতাম, নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না হত, তাহলে আমারও অবিশ্বাস হতো। সব ঘটনাই অসম্ভব বলে মনে হতো। কিন্তু আজ এত বছরের অভিজ্ঞতার

পর বুঝতে পারছি—বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সরকার তার নিরপেক্ষতার বড়াই হারিয়ে ফেলে এবং কোন একটা পক্ষভুক্ত হয়ে যায়। বিশেষ একটা মাত্রা আছে যার পর সরকার শুধু কায়েমী স্বার্থসমূহকেই সুরক্ষা করে।

হাজার হাজার ওয়ার্লিকে দাসত্ব-গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ রাখার পরিকল্পনায় জমিদার ও মহাজনরা দু ধরনের দালাল-চক্র মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করত। প্রথমত, স্থানীয় সরকারী অফিসার, আর দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত সর্দার, চৌকিদার ও অন্যান্য চাকর। এই দুই চক্রের উপর নির্ভর করেই ভূস্বামীবর্গ তাদের অত্যাচার-ব্যাভিচারের রথ সাফল্যের সংগেই চালিয়ে যেত। সরকারী অফিসারদের পূর্ণ সমর্থন না থাকলে, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় তাদের পক্ষে এতদূর এগুনো মোটেই সম্ভব হতো না।

সরকারী অফিসারদের মধ্যে ঠিক মাঝামাঝি পর্যায়ের অফিসার—যেমন মামলাতদার (Mamlatdar), সার্কেল ইন্‌সপেক্টর, তহশীলদার (Talathi); পুলিস ইন্‌সপেক্টর এবং বন বিভাগের অফিসার প্রভৃতি যখনই কোন কর্মব্যপদেশে এইসব এলাকায় যেতেন, তখন ভূস্বামীদের শহরে বা গ্রামের বড় বড় বাড়িতে বা বাংলোতে মহাসম্মানে তাদের অতিথির মতো বরণ করা হতো। আরও উচ্চ পর্যায়ের অফিসার, যেমন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌ এবং বন বিভাগের সর্বোচ্চ অফিসার প্রমুখেরা সরকারী বাংলোতে অবস্থান করতেন। ছোট ছোট গ্রামগুলোতে গিয়ে তাঁরা কিন্তু ভূস্বামী-গৃহে আতিথ্য স্বীকার করতেন। ভূস্বামী তখন মহা সমারোহে বরেণ্য অতিথির সেবা করার জন্য তাদের খানা-পিনা ও অন্যান্য সবকিছু সুযোগ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাপনা কবত। এমন কি, গ্রাম পরিক্রমার জন্য তার নিজের গাড়িও ছেড়ে দিত। উচ্চপদস্থরা এলে ভূস্বামী নিজেই তাদের দেখাশুনা করত; আর অন্যান্যদের ক্ষেত্রে করত তার প্রতিনিধিরা—যেমন সর্দার, চৌকিদার ইত্যাদি। ১৯৪৫ সালের আন্দোলনের পর থেকেই প্রথম দেখা গেল—সরকারী অফিসাররা স্বাধীনভাবে সরকারী বাংলোতে থাকছেন, আর ছোট ছোট গ্রামগুলোতে থাকছেন তাঁবু ফেলে।

নতুন কোন অফিসার বা পুলিস অফিসার এই এলাকায় বদলি হয়ে এলেই তার কাছে প্রথম যাওয়া, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও তার অনুগ্রহ লাভের জন্য জমিদার ও জঙ্গলের ঠিকাদারদের মধ্যে অসভ্যের মতো ঠেলাঠেলি লেগে যেত। মামলাত্‌দাররা স্থায়ীভাবে শহরেই থাকতেন। শহরে মুখ্যত ভূস্বামীদের বসবাস। ভূস্বামী, সাহুকার, জঙ্গল-ঠিকাদাররা মামলাত্‌দারের বাড়িতে শাক-সব্‌জি, দুধ-ঘি, মাছ-মাংস, উৎকৃষ্ট মানের চাল প্রভৃতি পাঠিয়ে তাদের স্থায়ীভাবে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখত।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে, দহানু তালুকে আন্দোলন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। উম্বরগাঁও যাওয়ার প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য রাত্রি ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত জনৈক ভূস্বামীর বাড়িতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। নৈশ ভোজনের পর অপরাপর উপস্থিত ভদ্রলোকদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন পটোয়ারী (Talathi) জনৈক শ্রী……; ভূস্বামী তাঁকে দেখিয়ে বলল—"উনি যখনই এদিকে আসেন, আমার এখানেই ওঠেন। তার বা পটোয়ারী—কারুরই মধ্যে এই মন্তব্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ মামুলি ব্যাপারেও ওয়ারলির শাস্তি-বিধান করা হতো। মার-ধোর করা হতো। কাওয়াড় (Kawad) গ্রামের একটি জায়গায় বাঁধ বেঁধে জল ঘিরে রেখে একটা কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা হয়েছিল। বাঁধ বাঁধার কাজ, মাটি কাটার কাজ—সবই 'বেগার কাজের' মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল। কিছুদিন পর, জলাধারটা গ্রামের সম্পত্তি মনে করে আদিবাসীরা তাতে মাছ ধরেছিল। জমিদার কিন্তু অন্যরকম ভেবে বসল। হুংকার দিল, "কার হুকুমে তোরা আমার পুকুরে মাছ ধরেছিস্?" বলেই ওয়ারলিদের প্রচণ্ড মারধোর করল। তার উপর আবার, শ'খানেক ওয়ারলির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করে দিল। ফলে সকলকে সংগে সংগে হাজত-বাস করতে হল। কয়েক মাস ধরে সেই মামলা চলল। আমরা সেখানে সে সময় ছিলাম বলেই, তাদের জামিনে ছাড়িয়ে আনা হল। তা নাহলে সবার সামনে ক্ষমাভিক্ষা করে আত্মসমর্পণ করতে হতো ঐ ভূস্বামীরই কাছে।

এটা তো নিত্য-কর্মের মতো হয়ে উঠল। মামলাতদার, পটোয়ারী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা আরো নানাভাবে ভূস্বামীদের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহ বিতরণের জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অপ-প্রয়োগ বললেই ভাল হয়, তারা জমিদারের স্বার্থে জমিদারের প্রাপ্য খাজনা (Khands) বাড়িয়ে দিত, মিথ্যা মাপের দ্বারা জমির সীমানা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিত, ওয়ারলিদের নামে মিথ্যা করে বকেয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে বাড়তি অংশে ভাগ বসাত, দলিলে জোর করে বুড়ো আঙুলের ছাপ দেওয়াত, আর তার ফলে জমির মালিকানা লাভ করত জমিদার। ভূস্বামীদের কাছ থেকে নানান উপঢৌকন, সুখ-সুবিধা লাভের মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে অফিসাররা তাদের প্রতিদান দেওয়ার জন্য আইন-কানুনকে মাড়িয়ে, কোন তোয়াক্কা না করে তাদের স্বার্থে যা খুশি তাই করত। তার জন্য আদালতের কোন নির্দেশেরই প্রয়োজন পড়ত না।

একবার আমি 'বাপুগ্রামে' কয়েকদিন ছিলাম। সেখানে আমার যাওয়ার আগে মামলাতদার ঘুরে গেছে। ফিরে যাওয়ার আগে, ভূস্বামীর কাছ থেকে

যে একটি উপহার লাভ করেছে তা হলো বেশ কড়া ও ভাল জাতের মদ। ওয়ারলিরা এই মদ এক ধরনের ফুল থেকে তৈরি করে। ভূস্বামীর আদেশে এই মদ তারা সংগ্রহ করে দিয়েছিল, অবশ্য এর জন্য কোন মূল্য বা প্রতিদান পায়নি ভূস্বামীর কাছ থেকে। ওয়ারলিরাই আমাকে এই কথা বলেছিল। পরিদর্শনকালে অফিসার ভদ্রলোকের কর্মসূচীই থাকত নিম্নরূপ : প্রথমেই, সুন্দর করে খানা-পিনা. ঐ সংগে গল্প-সল্প, তারপর দিবানিদ্রা। নিদ্রাশেষে শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবার পর জমিদারের সংগে আলাপ-আলোচনা করে নিয়ে গ্রামবাসীদের অভিযোগ শুনতে বসত! অনেক সময় এই সব অভিযোগ সম্বন্ধে আদৌ কোনরকম অনুসন্ধান বা তদন্ত না করেই, শুধুমাত্র তার মন্তব্য লিখে নাম সই করে দিত। তারপর যথাস্থানে প্রস্থান। এ হেন পরিস্থিতিতে ওয়ারলিরা যদি কোন প্রতিবাদ করেও তবুও কোন্ আশা-ভরসায় ওয়ারলিরা দাবি-পূরণের জন্য কীভাবে দাঁড়াতে পারবে। সে সুযোগ কোথায় ?

আর জমিদারের সংগে বিরোধে জয়লাভের সামান্যতম ক্ষীণ আশা থাকলেই বা কী হতো ? অভিযোগ পেশ করার সংগে সংগেই তো মারধোর শুরু হয়ে যেত। তারপর শুরু হতো আদালতের কার্যধারা ; চলতো দীর্ঘ দিন ধরে, শেষ হওয়ার আগেই চরম বিরক্তি আর ক্লান্তিতে হয়তো ওয়ারলিরা হালই ছেড়ে দিত। ধৈর্যের শেষবিন্দুতে তারা না আসা পর্যন্ত ভূস্বামী-পক্ষ থেকে মামলা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হতো। এইভাবে সব দিক থেকেই ব্যর্থ হয়ে চরম হতাশায় ভুগত তারা। আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে হলেই হাত-পা কাঁপতে শুরু হতো, ভয়ে আধমরা হয়ে যেত, মুখ দিয়ে কথা বেরুত না—ফলাফল কী দাঁড়াবে তা ভাবতে গিয়েই হৃদকম্প শুরু হয়ে যেত। জামিনে মুক্তি পাওয়ার আশাও খুব ক্ষীণ। কারণ জামিনের টাকা যত কমই হোক্ না কেন, সেটুকুও তাদের চরম দারিদ্র্যের জন্য জমা দিতে পারত না। আর ভূস্বামীর ভয়ে অন্য কেউই জামিনদার হিসেবে দাঁড়াতে সাহস পেত না। কাজেই, তার মামলায় শুনানীর দিন ধার্য হওয়ার আগে পর্যন্ত, তাকে পুলিস-হাজতে থাকতে হত। সেখানে না মিলত খানা, না পাওয়া যেত জল। উপবাসে মৃত্যুর সামিল হয়ে দাঁড়াত। শেষ পর্যন্ত কোন উকিলও তার পক্ষ সমর্থনে রাজী হতো না, কারণ উকিলের ফি দেওয়ার মতো অর্থ-সামর্থ্য তার নেই, তা ছাড়াও অধিকাংশ উকিলই তো ঐ ভূস্বামী শ্রেণীর, সবাই এক পালকের পাখি, কাজেই তাদের থেকে কোন সাহায্য-সুযোগই ওয়ারলিরা পেত না।

পুলিস বিভাগ ও স্থানীয় সরকারী অফিসের মদত নিয়ে ভূস্বামীরা

আইন-আদালতকে নিপীড়নের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ পেত। আদালত জমিদার-শ্রেণীর মুখপাত্র, পুলিস তাদের রক্ষক। উম্বরগাঁও তালুকের এক জবরদস্ত জমিদার নিজেই ছিলো একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। জমিদার-কৃত কোন অপরাধ—যেমন ওয়ারলিদের ঘরের মধ্যে তালা-চাবি বন্ধ করে আটকে রাখা, তাদের মারধোর করা, এমন কি তাদের মেয়েদের অশ্লীলভাবে উত্যক্ত করা প্রভৃতি কোন অপরাধই কোনদিন আদালতের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করা হত না, অপরাধের শাস্তি হবে এতো অনেক দূরের কথা! জমিদাররা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াত "কে তোদের হয়ে লড়বে? পুলিস, তলাথি, আইন-আদালত—সব আমাদের দিকে। সুতরাং যা বলবো, তাই করতে হবে। এমন কি তোদের খুন করে ফেললেও, কেউ আমাদের বাধা দিতে আসবে না, কিস্যু করতে পারবে না আমাদের"। এ ধরনের মন্তব্য করতে গিয়ে, বিবেকের সামান্যতম দংশনও তারা অনুভব করত না। এক বিন্দু লজ্জাও হত না তাদের। কারণ এইতো সত্য ঘটনা। এ কথা খুব দৃঢ়তার সংগেই ওয়ারলিরা বিশ্বাস করত যে, ওরা [সরকারী প্রশাসন] সবাই ধনীর ভৃত্য। কাজেই রক্ষকই যেখানে ভক্ষকের ভূমিকায়, সেখানে আইন-আদালত, সরকারী অফিসার ও তাদের কর্মচারীবৃন্দ সাধারণ মানুষের সেবা করবে, তাদের কাছে ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে—এ আশা, এ কল্পনা মূর্খের স্বর্গে বাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই হচ্ছে ওয়ারলিদের অভিজ্ঞতা। মুখে তো সব গণতন্ত্রের ফানুস ওড়ায়, আর আড়ালে বিস্তার করে দেয় একনায়ক-তন্ত্রের নিষ্ঠুর-কুটিল যন্ত্র-জাল। তাই অত্যাচারের নৃশংসতা জানা সত্ত্বেও চোখের সামনে সব কিছুই সহ্য করে নিতে হয়। সরকারের জমিদার তোষণের নগ্নরূপ আদিবাসীদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কোন পর্দাতেই সেই আসল রূপ আর লুকানো যাবে না। যেমন করে, 'গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত' এই ঋতুপরিবর্তনের ধারার সংগে স্বাভাবিকভাবেই আদিবাসীরা পরিচিত, ঠিক তেমনি করেই সহজাত অভিজ্ঞতায় তারা বুঝতে পারতো যে, সরকারী প্রশাসন যন্ত্রও জমিদারের পক্ষ নেবে, তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের হাত শক্ত করবে। আমার কাছে এই কথাই তারা তাদের অমার্জিত ভাষায়, আত্মসমর্পণের সুরে বলত, "বাহিনজী! কী করবো আমরা? এই সরকারী আমলারা জমিদারের ওখানে খানা খায়, মজা লোটে, তাই তারা ওদের ঢাক বাজায়। আর আমাদের কী আছে যে বাবুদের শ্রীচরণে প্রণামী দেব? আমাদের জন্য মাথা ঘামিয়ে কেন ওরা মাথার যন্ত্রণা বাড়াবে বলুন?"

বনবিভাগের অফিসারদের সবচেয়ে তিক্ততম শত্রু বলে মনে করত ওয়ারলিরা। জংগল পরিষ্কার করা, বীজ বোনা, সেই বীজের চারা আবার রোপণ করা, বনে

যখনি দাবানল সৃষ্টি হতো—সেই দাবানল নিভানো ইত্যাদি সমস্ত কাজই ওয়ার-লিদের দিয়ে করানো হতো। ক্ষেত ও জংগলে ধানের চারা লাগানোর কাজ একই সময়ে প্রায় করতে হতো। নিজের ক্ষেতের কাজ ছেড়ে দিয়ে, জংগলের কাজ করতে যেতে হতো তাদের। তার ফলে নিজের জমিতে চাষের কাজ অনেক পিছিয়ে যেত। বলা বাহুল্য—জংগলের কাজের জন্য তাদের কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হতো না। কিসান জংগলে কাজ করতে যেতে কোন রকম গড়িমসি করলে জোর-জুলুম করে তাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। এই কাজের জন্য সরকার যে তাদের উদ্দেশ্যে টাকা বরাদ্দ করে সে কথা তারা মোটেই জানত না। তারা বলত, "বহিনজী, জংগলেও সরকার আমাদের বেগার খাটিয়ে নেয়।" সরকারের তরফ থেকে তাদের কাজের জন্য বরাদ্দ টাকা তাদের কাছে সংগে সংগেই আসা উচিত ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে তারা কিছু জানত না, কেউ তাদের একথা বলেওনি বা তাদের শোনানো হয়নি। বরাদ্দ টাকা আসলে বনবিভাগের অফিসারদের পকেটেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। একবার এক ওয়ারলি বলল, "বহিনজী, জংগলে কাজ করার পর বনবিভাগের এক অফিসার আমাদের শুধু এক মুঠো করে নিমক দিয়েছিল।" ওয়ারলিরা যদি কাজ করতে অস্বীকার করার মতো বিন্দুমাত্র সাহস দেখাত, তাহলে অফিসাররা বিভিন্ন উপায়ে ঝামেলা সৃষ্টি করত, তাদের উপর নানা কৌশলে হামলা চালাত। খেয়ালখুশি মতো সত্য-মিথ্যা নানা রকম অপরাধ খাড়া করে তাদের বিরুদ্ধে সাজানো মামলার স্রোত বইয়ে দিত। তাই বাধ্য হয়ে আবার ভাগ্যের দোহাই পেড়ে, অফিসাররা ভাল-মন্দ যে আদেশই করুক না কেন, মুখ বুজে সব মেনে নিয়ে বেগার খেটে আসত।

কোন সরকারী অফিসার বা কর্মচারী এই সব গরিব মানুষগুলোর সঙ্গে কোনদিন ভদ্রভাবে কথা বলত না। তারা বলত "বহিনজী, গালি-গালাজ না করে কেউ তো আমাদের সংগে কথা বলে না। সব সময় গালাগালির বিশেষণ যোগ করে আমাদের ডাকে।" সরকারী সব বিভাগেরই অফিসার কর্মচারী, প্রধানত পুলিসের কাছ থেকে একটি মাত্র ন্যায়-নিষ্ঠ আচরণ তারা পেত—সেটা হচ্ছে গালি-গালাজ, দু-চারটে চপেটাঘাত, ধাক্কাধাক্কা, ঝাড়ধাক্কা ইত্যাদি। জমিদার, তার সর্দার আর পুলিসকে এইজন্য তারা যমদূত বলে মনে করত।

এই সরকারী অফিসারদের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়াও, ভূস্বামীদের অত্যাচারের যন্ত্ররূপে আরও অনেক নিজস্ব হাতিয়ার ছিল—যেমন সর্দার, পাঠান, চৌকিদার, মুখতিয়ার—তারাও সরকারী যোগসাজসে দমন-যন্ত্র পরিচালনা করত। এই সব চণ্ডালদের প্রধান কাজ ছিল—মোটা লাঠি দুলিয়ে দুলিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো আর আদিবাসীরা যাতে কোন গড়বড় না করে তার জন্য তাদের মধ্যে

ত্রাস সৃষ্টি করা। মন যদি চায়, আবশ্যক যদি পড়ে, তাহলে তারা আদিবাসী পুরুষদের মধ্যে ঐ লাঠির প্রসাদ বিতরণ করে বেড়াত। অবশ্য মেয়েরাও প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হত না। এই চণ্ডালগুলোর মাধ্যমেই জমিদারদের বিশেষ প্রতিভা-জাত নিয়ম-নীতির বেড়াজাল আদিবাসী দুনিয়ার একেবারে কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। মোটামুটি তাদের কাঁধের ওপর দিয়েই নরদানব জমিদার ওয়ারলিদের সংগে স্বেচ্ছামতো ব্যবহার করত; আর যা কিছু অপকর্ম সে সব কিছু তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু সেই সরকারী প্রশাসনের নিশ্চিত সহায়তায় হজম করে ফেলত।

এইভাবে নিরক্ষর, অসহায় ওয়ারলি সম্প্রদায় পাহাড়ী টিলায়, উপত্যকায় ও অরণ্য প্রান্তরে আপন আপন ভগ্নপ্রায় ছোট্ট ঝোপড়ীর মধ্যে আলাদা আলাদা বস্তিতে বাস করত। ওদের কোন সংগঠন ছিল না। ওরা জীবনে কারও সহানুভূতি ও সমর্থন পায়নি। সমস্ত সম্প্রদায়টাই যেন মুমূর্ষুর জীবন যাপন করত। এ কথা তাদের জানা ছিল না যে, মানুষের মতো বাঁচার অধিকার তাদেরও আছে। আত্মসম্মান নামের বস্তুটা তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ভূস্বামীবর্গের কেবল ছিল শোষণ আর দমনের জন্য সুচিন্তিত ও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা।

কোচাই গ্রামের জমিদার তার নৃশংসতার জন্যই কুখ্যাত ছিল। তার নাম কোচাইওয়ালা। তার সর্দার ছিল জাতিতে পাঠান। এই লোকটাই তার অন্নদাতা প্রভুর যাবতীয় আদেশ কার্যকর করত, আর সেই উদ্দেশ্যে আদিবাসী-দের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাত। অত্যাচারের মাত্রা যখন চরমে উঠল, তখন আর সহ্য করতে না পেরে কমরেড রূপজী কড়ু নামে একজন আদিবাসী আরও কয়েকজনকে সংগে নিয়ে তাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে এল। সেই খণ্ড-যুদ্ধে পাঠান সর্দার খুন হয়। আদিবাসীরা মোটেই ঘাবড়াল না। আমাদের উপস্থিতিতে মনে সাহস পেল। কমরেড রূপজী ছাতি টান করে আদালতে বলল—"পাঠানের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে সেই অত্যাচার খতম করার জন্যই আমরা লড়াই করতে বাধ্য হয়েছি; বাধ্য হয়েছি জমিদারদের বজ্রমুষ্টি থেকে মুক্তিলাভের আশায়। এই জন্য মহামান্য আদালত যে শাস্তি উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবে - আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত। কমরেড রূপজীর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। সরকার তাকে খুনী অপরাধী বলে ঘোষিত করেছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে তাদের নেতা ও উদ্ধারক বলে মেনে নিল। কারামুক্তির পর তাকে বীরের সম্মানে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল।

১৯৪৫ সালের পর আদিবাসীদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল। আদিবাসীদের একতা, দৃঢ় সংকল্প, আর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জমিদারের

দমন-পীড়নের যন্ত্রপাতি বেশ কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য আমরা তাদের পাশে এসে দাঁড়ালাম। সেখানে খোলা হল কৃষক সভার দপ্তর। আদিবাসীদের অভিযোগ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বোম্বাই পর্যন্ত পেঁছে গেল। আমাদের উকিলরা আদিবাসীদের মামলা বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালনা করতে লাগল। আদিবাসীদের প্রতি দুর্বিচারের অভিযোগ রিপোর্টে তালিকাভুক্ত হতে লাগল। শক্তিশালী জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সংগঠনকেও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হল। সেই সংগঠনের মাধ্যমে গড়ে উঠল কমরেড রূপজী বড়ুর মতো অনেক বীর নেতা—যারা তাদের আদিবাসী ভাইদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। ওয়ারলিরা বলতে লাগল "লাল ঝাণ্ডা আমাদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের অবতারের মতো আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে"। জমিদার ও মহাজন চক্রের নির্দয় লালসার জিহ্বা কিছুটা সংযত হল। আমাদের তারা তাদের শ্রেণীশত্রু বলে চিহ্নিত করতে লাগলো এবং ঐ এলাকায় আমাদের কাজকর্ম অসম্ভব করে তোলার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা আরম্ভ করে দিল।

পঞ্চম অধ্যায়

যে ভাবে আমরা দিন কাটাতাম

কৃষকদের উপর জমিদারদের খোলাখুলি দমন-পীড়ন এবং সরকারের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি—উভয় ঘটনাই আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে কিছুটা প্রতিহত হল। ফলে জমিদারবর্গ আমাদের ঘৃণা করতে সুরু করল। ঐ এলাকায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার জন্য তারা যথা-সাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। তাদের উদ্দেশ্য হয়তো এই যে, আমাদের এমনভাবে হয়রান করা—যাতে চরম বিরক্তি বা হতাশায় আমরা লোটা-কম্বল ফেলে রেখেই চিরদিনের জন্য সেখান থেকে চলে যাই।

এই প্রসংগে বলতে গিয়ে, সে সময়কার ঘটনা আজও স্পষ্টভাবে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উম্বরগাঁও তালুকের শিরগাঁওতে চলছিল সংযুক্ত মহারাষ্ট্র পরিষদ আয়োজিত 'সীমান্ত সম্মেলন"। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সীমারেখায় শিরগাঁও গ্রাম। তার নামকরণ হল 'সীমা-নগর' [Boundary Town]। সেদিন সভামণ্ডপ আদিবাসী-শ্রোতায় একেবারে ঠাসা হয়ে গিয়েছিল। সামনের সারিতে বসে আছেন থানা জেলার সমস্ত রাজ-নৈতিক পার্টির প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ। সবাই তাঁরা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। মূল মঞ্চে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে আমরা তিনজন বসে আছি—কমরেড শ্যামরাও পারুলেকর, কমরেড বি. টি. রনদিভে ও আমি। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রী ডি. ভি. পোতদার। সেদিন ছিল সম্মেলনের শেষ দিন। ধন্যবাদ-জ্ঞাপনসূচক অন্তিম-ভাষণ চলছে তখন। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছি সেই বিশাল জনসমুদ্রের দিকে—যেখানে কালো চামড়ার আদিবাসী, আর সাদা বা ফরসা চামড়ার অভিজাত শ্রেণী, এই দুটি ধারার সংগম ঘটেছে একই উদ্দেশ্যে, একই লড়াইয়ের ময়দানে। হঠাৎ চোখ দুটো জলে ভরে গেল, নীরবে মুছে ফেললাম। মনের পর্দায় প্রতিফলিত হয়ে উঠল আগের সুদীর্ঘ আট বছরের আন্দোলনের দৃশ্যপট। ১৯৪৫ সালের মে মাসের একটি দিনের কাহিনী বিশেষভাবে মনে পড়ে গেল। অবিস্মরণীয় সেই কাহিনী আজও স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে রয়েছে। পূর্বাপর পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখে

আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মঞ্চে বসে মিশ্রিত শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে থাকার সময় যে বিস্ময়কর অনুভূতি আমার মনের মধ্যে জেগেছিল তা শুধু তারাই পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবেন, যারা ১৯৪৫ সালের সেই বিশেষ দিনটির বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন।

জারী সম্মেলনের প্রচারাভিযান শুরু হওয়ার প্রায় সংগে সংগেই আমাদের বিরুদ্ধেও সত্য-মিথ্যা নানান রকম পাল্টা প্রচার আরম্ভ করে দেওয়া হল। নেতৃত্বে রইল ভূস্বামী ও মহাজন-সম্প্রদায়, আর সক্রিয় সহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে ভূমিকা নিল স্থানীয় সরকারী প্রশাসন ও পুলিস অফিসারবৃন্দ।

আমাদের প্রচার-সভা নির্দিষ্ট ছিল তালওয়াড়া গ্রামে। সেটা ছিল বাজারের দিন। সভাশেষে ফেরার সময় দেখা হল কমরেড রেদেকারের সংগে। তিনি ছিলেন নারগোলের একজন স্কুল-শিক্ষক। ঐ দিন স্কুল ছুটি ছিল, সেই সুযোগে তিনিও সেদিন সভায় যোগ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন।

কমরেড দলভি ও আমি সম্মেলনের প্রচারের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কয়েকদিন ধরেই এক কাপ ভালো করে চা বা একটু ভালো খানাও জোটেনি। চারদিন স্নান হয়নি, চুলে যে ভালো করে চিরুণী চালাব তারও সময় করে উঠতে পারিনি। পরবর্তী গ্রামে পৌঁছানোর আগে, প্রচণ্ড একটা ইচ্ছে জাগলো মনের মধ্যে—কোথাও একটু দাঁড়িয়ে যাই, এক কাপ গরম চা খাই, স্নান করে নিয়ে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিই। শিরগাঁওতে বহু ধনাঢ্য ভূস্বামীর বাড়ি। ইতিপূর্বে কোনদিন সেখানে যাইনি। জায়গাটা দেখাও যাবে আর ঐ ফাঁকে খাওয়া-দাওয়ারও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে অর্থাৎ একই সংগে 'রথ দেখা আর কলা বেচা'—এই যৌথ উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সেই দিকে পা চালালাম। যদিও আমাদের ভ্রমণ-সূচীর তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট গ্রামে আমাদের সোজা চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে হাজির হলেই তো সংগে সংগে বৈঠক করা যাবে না। কারণ দিনের বেলায় তা করা যায় না—তখন গ্রামের সব লোক বেগার খাটতে চলে যায়। সে যাই হোক, হাতে রয়েছে পুরোটা দিন। কাজেই সেখানে গিয়ে অলস মুহূর্ত কাটানোর থেকে শিরগাঁওতে কাটালেই বরং কাজের কাজ হবে।

গণেশ-মন্দির

তালওয়াড়া থেকে পায়ে হেঁটে ভিলাড় স্টেশনে পেঁছে গেলাম। সেখান থেকে শিরগাঁও আরও তিন মাইল। এতদূর হেঁটে যেতে আদৌ আর ইচ্ছে হচ্ছিল না। যেহেতু তখনো ট্রেন আসতে দেরি ছিল, তাই তখনো পর্যন্ত স্টেশনে কোন টাঙ্গাও ছিল না। সেখানেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আজকের মতো, তখনকার দিনে স্টেশনে বা কাছাকাছি কোন চা বা কফির দোকান ছিল না। শিরগাঁও রাস্তার উপর একটা ছোট্ট দোকান ছিল। একজন তার নিজের বাড়িতেই দোকানটা করেছে, নিজেই চালায়। প্রথমে দোকান-মালিকের কাছ থেকে জল চেয়ে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেললাম, তারপর চা-এর অর্ডার দিলাম। যদিও চা-টা তেমন ভালো হয়নি তবু বেশ তৃপ্তি করেই খেলাম। ট্রেনের সময় হয়ে আসছিল, লোকজনও প্লাটফর্মে অনেক এসে গেছে, আসছে আরও। স্টেশনের বাইরে অনেক টাংগাও এসে জমা হয়েছে। বেশিরভাগ যাত্রীই ভূস্বামী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। চুলে আমার তেলও পড়েনি, আর চিরুণীও দেওয়া হয়নি। গরমের দিন, ধূলিধূসরিত পরিধেয়, গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরতে ঘুরতে ঘামে সব চটচটে হয়ে গেছে। দিন তিনেক ধরে স্নানও হয়ে ওঠেনি। একটি দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠেছি। স্টেশনে আগত মধ্যবিত্ত ভদ্রমহোদয়েরা আমাদের দেখেই আমাদের পরিচয় সম্বন্ধে অনুমান করতে পেরেছিল। তাদের ঘৃণাপূর্ণ, অর্থবহ দৃষ্টিতে আমাদের মূল্যায়নে একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠেছিল—যেন বলতে চায় "তোমরা যে কে বাবা, তা আমরা ভালো করেই জানি"। আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে, বেশ ইংগিতপূর্ণ ভাবেই কৌতুকছলে নিজেদের মধ্যে পরস্পরের দিকে ইসারা করে নানারকম মন্তব্য করতে লাগল। আমরা তাদের প্রতি কোন গুরুত্বই দিলাম না। জানি তো, তাতে কিছু লাভ হবে না। আমরা তিনজন একটা টাংগা ঠিক করে শিরগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

শিরগাঁও-এর মূল রাস্তায় আমাদের টাংগা গিয়ে পড়ার সংগে সংগেই সেখানকার মানুষগুলো আমাদের উদ্দেশ্যে এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলো যে, মনে হয় ছোটখাট একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে। সমস্ত জায়গাটা যেন কাঁপছে। কেউ কেউ ছুটে ভিতরে চলে গেল, দরজা ধড়াধড় বন্ধ করে একটু আড়কপাটি করে সেই ফাঁক দিয়ে কেউ কেউ দরজার ছিদ্র দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে আমাদের দেখিয়ে কী সব বলতে লাগল। মুখে তাদের যেন সেই ভাব, "ঐ যে দেখ দেখ, সেই লোকগুলো আমাদের গ্রামেও এসে গেছে।" নারী, পুরুষ, শিশু—সবাই বারান্দার রেলিংয়ের উপর ধনুকের মতো বেঁকে, ঝুঁকে পড়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগল। যারা আমাদের উপস্থিতি তখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করেনি, আমাদের দেখানোর জন্য তাদের উদ্দেশ্যে হাক ডাক-দিতে লাগল। অন্যান্য প্রতিবেশীরাও হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল, কেউ রাস্তার ধারে, কেউ চৌরাস্তার মোড়ে ভীড় জমাল। তারা আমাদের ব্যাপারে উৎসুক হয়ে পড়ল। ঐ গ্রামে এই আমাদের প্রথম পদার্পণ। আমরাও হতচকিত হয়ে গেলাম, কোথায় যাব কী করব, কিছুই

বুঝে উঠতে পারছিলাম না। টাঙ্গাওয়ালা জিগ্যেস করল, "কোথায়, কার বাড়িতে নিয়ে যাব আপনাদের?" উত্তরে আমরাই বা কী বলি? কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, গ্রামের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন মন্দির থাকবেই থাকবে। অন্ধকারে যেন একটা ক্ষীণ আলোক রশ্মি দেখতে পেলাম। বললাম—"চলো, গণেশ মন্দিরে নিয়ে চলো।" কাজ হল তাতে। সত্যিই গ্রামে একটা গণেশ-মন্দির ছিল—সেখানেই আমাদের নিয়ে গেল। নেমে মন্দিরের মধ্যে ঢুকলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দা, তার এক কোণে সিমেন্ট বাঁধানো একটা বেঞ্চি। ঝুলিঝোলা সেখানে গিয়ে রাখলাম। উদ্দেশ্য ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই কাটিয়ে দেব। কাছাকাছি কোন ইঁদারা আছে কিনা—তার খোঁজে মন্দিরের পিছনের দিকে গেলাম। ঐ সময় পিপ্পুটকর নামে এক বালক সেখানে এসে হাজির। মনে হয় সে মন্দিরের পুরোহিত। আমাদের বলল, "মন্দিরে আপনাদের থাকা চলবে না। গ্রামের বর্ষীয়ানদের নির্দেশ। আপনারা বরং এখান থেকে চলে যান।" এই নির্দেশ বহন করেই সে এসেছিল। একটা অপ্রত্যাশিত জটিলতা সৃষ্টি হল, খুব বিপদে পড়ে গেলাম। সেখানে কোন জানাশুনা ওয়ারলিও ছিল না। কেউ আমাদের চেনে না। আর সমাজের তথাকথিত ঠিকাদার, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আমাদের এমনই শত্রু বলে মনে করে যে, মন্দিরেও আমাদের কিছুক্ষণ থাকতে দিতে চায় না। ওদিকে টাঙ্গাওয়ালাও তখন চলে গেছে। কঠিন পরিস্থিতি, কি করবো বুঝে উঠতে পারলাম না, স্নান করার জন্য একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম, একটুও বিলম্ব সইছিল না। পুরোহিত বালককে বললাম, "তোমার গ্রামের বর্ষীয়ানরা যা বলে বলুক, যা খুশি করুক, এখানেই আমরা এখন থাকবো। আমাদের উপস্থিতি যদি তাদের পছন্দ না হয়, তাহলে গ্রামের সবাইকে নিয়ে একটা বৈঠক ডাকুক। তারাও যদি না চায়, তখন দেখা যাবে কী করা যায়।" উত্তর শুনেই তো বালকটি ক্ষেপে অস্থির, গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। শিরগাঁওতেই দিনটা কাটাবো বলে দৃঢ় সংকল্প করলাম। কিন্তু এই গ্রামে আমরা যে একেবারেই নতুন, ওদিকে আমরা আসায় ভূস্বামীও বিগড়ে গেছে, তাই ভাবলাম অন্য একটা থাকার জায়গা সন্ধান করে নেওয়াটাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এটাও ঠিক জানতাম যে, কাছাকাছি কোন আদিবাসী বস্তি থাকলে, সেখানে আমাদের থাকার কোন সমস্যা হবে না।

অন্যান্য সম্ভাবনার ধান্দায় কমরেড দলভি ও আমি বেরিয়ে পড়লাম। একটু পরেই কমরেড দলভি এক কামারের ইঁদারায় আমাদের স্নানের একটা সুবন্দোবস্ত করে ফিরে এল। আমাদের একটু দয়া করার অনুরোধ করাতেই

কামার খুব একটা চিন্তা না করেই বলে ফেলল, "নিশ্চয়ই, স্নান করবেন, এতে আমার কোন আপত্তি নেই। আর আপত্তি থাকারই বা কী আছে ? আমার ই'দারা তো আর উঠিয়ে নিয়ে কোথাও পালাচ্ছেন না ? আরাম করে স্নান করুন।" আমরা ছুটলাম তার ওখানে স্নান করতে। কমরেড দলভি আমার জন্য এক বালতি জল তুলে দিল। আমি তার জামাটায় সাবান ঘষে দিলাম। আর এক বালতি জল তোলার জন্য বালতিটা নীচে ছেড়েছে এমন সময় হঠাৎ কামারের ঘরের মধ্যে থেকে গর্জন করতে করতে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। চিৎকার করে বলল, "কেন আপনারা আমাদের ই'দারায় স্নান করতে এসেছেন ? জল নেবেন না আপনারা। স্নান করার ইচ্ছে হয়েছে তো রাস্তার অপর ধারে সরকারী ই'দারায় যান না ? যান—জিনিসপত্র নিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে চলে যান।" সে আমাদের তাড়াতাড়ি বিদেয় করার জন্য খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল, শুধু জামা-কাপড়গুলো নিয়ে দূরে ছু'ড়ে ফেলাই বাকি রাখল। এত কিছুর পর, আর সেখানে স্নান করি কি করে ? স্নান করার সব আশায় ছাই পড়ল একেবারে। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, গ্রামের আমীর ও ক্ষমতাশালী মাতব্বররা ওদের খুব ভয় দেখিয়েছে। এইজন্যই রূপ বদলে গেছে একেবারে। নিদারুণ হতাশ হয়ে মনের দুঃখ মনে চেপে জামা কাপড় নিয়ে মন্দিরে ফিরে এলাম।

এই ঘটনায় আমার জিদ্ আরও বেড়ে গেল। অন্যত্র কোথাও স্নানের বন্দোবস্ত করা যায় কি না, সেই উদ্দেশ্যে আবার বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের বহিপ্রান্তে একজন মুসলমান চুড়িওয়ালীর সাক্ষাৎ মিলল। নিজের বাড়িতেই তার স্বাধীন ব্যবসা, জমিদারের ভয়ভীতির কাছে তাই তাকে সব সময় মাথা নত করতে হত না। তার বাড়ির ভিতরে আলাদা স্নানঘরের ব্যবস্থা। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা, অপেক্ষাকৃতভাবে ভালোই ব্যবস্থা। সাগ্রহে ব্যবহারের অনুমতি দিল সে। অবশেষে একটা গতি হল। আরাম করে স্নান করলাম। শরীর থেকে ময়লা বেশ ঘষে ঘষে তুলে পরিষ্কার করে স্নান করলাম। মনের দিক থেকেও বেশ তাজা ঝরঝরে বোধ হল। মেয়েটিকে আন্তরিক অভিনন্দনে অভিষিক্ত করে আবার মন্দির-প্রাঙ্গণে ফিরে এলাম। ওদিকে কমরেড দলভিও রাস্তার কু'য়াতে স্নান সেরে নিয়েছিল। কিন্তু কমরেড রেদেকার মন্দিরের বারান্দাতেই আমাদের জিনিসপত্র আগলে বসেছিলেন। স্নান তো হল, এবার পরবর্তী কাজ হলো মধ্যাহ্ন-আহারের একটা ব্যবস্থা করা। গ্রামটা বেশ বড়, কিন্তু হোটেল, রেস্তোরা বা সরাইখানা ছিল না। কমরেড দলভি আঁধেরপাড়ায় আদিবাসীদের ওখানে খাওয়া-দাওয়ার একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা দেখার উদ্দেশ্যে চলে গেল। কমরেড রেদেকার

শিরগাঁওতে তার ছাত্রদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে সম্ভবপর সমস্ত সূত্রই অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তবুও সৌজন্যের খাতিরে সাহস করে অন্তত একটু সময়ের জন্য হলেও এসে দেখা করে গেল। আবার কেউ কেউ ভীতুর মতো জবাব পাঠালো "বাড়িতে মায়ের অবস্থা খুব খারাপ", অথবা কেউ বলে পাঠালো "বাড়িতে কেউ নাই, সব বাইরে বেড়াতে গেছে", অথবা কেউ বা স্পষ্ট ভাবেই জবাব দিল "অসম্ভব! বাড়িতে মহিলা-মহলের আপত্তি আছে।" অবশেষে কমরেড রেদেকারের কোনো ছাত্রের বাড়িতে আতিথেয়তা ব্যবস্থার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়ে আমরা কমরেড দলভির প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আঁধেরপাড়ায় আতিথেয়তা

কিছুক্ষণ পরে কমরেড দলভি আঁধেরপাড়ায় এক আদিবাসীর ওখানে আমাদের খানার ব্যবস্থা সেরে ফিরে এল। একটা চা-এর দোকান থেকে কিছু পকৌড়ি (Bhajias) কিনে নিয়ে জিনিসপত্রসহ আঁধেরপাড়ায় চললাম। ঐ আদিবাসীটির সংগে ইতিপূর্বে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। আমাদের যাওয়ার পর আমাদের অতিথিসেবক হাত-মুখ ধোয়ার জল দিল। তারপর খুব সংকোচের সংগেই আমাদের জিগ্যেস করল। "সত্যিই আপনারা এখানে খাবেন তো?" তার ধারণা ছিল—আমাদের মতো সুশিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর মানুষরা কি আর তাদের বাড়িতে খাবে? তাই ব্যাপারটা বার বার জেনে নিয়ে স্থির নিশ্চয় হতে চাইছিল। তখনো তার মনের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। যখন বললাম, খাবো বলেই তো এলাম, তখন খুব খুশী হয়ে উঠল। বাড়ির গৃহিণী ইতিপূর্বেই ধান কুটে রেখেছিল, এবার চাল পাছড়ে পরিস্কার করে নিয়ে উনানে চড়িয়ে দিল। তখন দুপুর একটা বেজে গেছে, খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই বললাম - শুধু ভাত হলেই চলবে, আর তরিতরকারির জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। ভাত হয়ে যাওয়ার সংগে সংগেই, আমাদের নিয়ে আসা পকৌড়ি মাখিয়ে নিয়ে ভরপেট ভাত খেলাম। গৃহস্বামী দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তার সংগে কথা বলতে বলতে অনেক খবরই সংগ্রহ করলাম। প্রাণ খুলে কথা বলছি দেখে সেও খুব খুশী হল। জারী সম্মেলনের কথা, গ্রামে আসার পর সবাই কেমন আমাদের আপ্যায়ন করল—সে সব কথাও হল। বন্ধুর মতো আমাদের আচরণ দেখে খুবই অবাক হয়ে গেল তারা, এই সব কাহিনী শুনে আমাদের আপন জন বলে মনে করল।

বেলা প্রায় তিনটে বাজে, ঘরের দরজার বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসে শুয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম। একটা চারপায়া পড়ে ছিল সেখানে। তাতে কমরেড দলভি ও কমরেড রেদেকার ভাগাভাগি করে শুয়ে পড়ল। কারুরই অবশ্য আমাদের ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে কথাবার্তাই চলতে লাগল। বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার সময়, রৌদ্রের উত্তাপ কমে এলে, ভিলাড় গ্রামে বৈঠক করতে যাবো ঠিক করেছি। আলাপ-আলোচনা চলছে, এমন সময় শ্রী আরেকর নামে এক ভূস্বামী সেখানে হাজির। এসেই হুংকার দিল, "এ্যাই, কে আছেরে বাড়িতে?" আমরা নীরব অভ্যর্থনা জানালাম। তাতে একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে, সোজা এসে চারপায়ার উপর বসে পড়ে আমাদের সংগে কথা বলতে লেগে গেল, "জানেন, ঐ পিপুটকরটা একেবারে হাঁদারাম! একেবারে ছেলে মানুষ, আর আনাড়ি। ও কী জানে? ও ব্যাটা আপনাদের সংগে নিশ্চয়ই খুব আজে বাজে কথা বলেছে! এখন আপনারা গ্রামের মধ্যে চলুন। অন্ততঃ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে এক কাপ চা খেয়ে যাবেন চলুন। যেতেই হবে কিন্তু আপনাদের।" গত তিন-চার ঘন্টার মধ্যেই এমন কি জাদুকরী ঘটনা ঘটে গেল যে, এমন হৃদয়-পরিবর্তন? আমরা তো শুনে হতবাক্! কী কারণ থাকতে পারে? অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম। পরে অবশ্য সব জানতে পেরেছিলাম।

আমরা আঁধেরপাড়ায় চলে আসার পরই, গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর এক-জায়গায় জুটেছিল। যে ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেই বিষয়ে সবাই যৌথভাবে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখল। সকলেই মোটামুটি ব্যাপারটায় বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একজন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্র মহিলাকে শুধু যে তাদের গ্রামে সামান্য একটু স্নান পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি তাই নয়, এমন কি তাঁকে একরকম কুকুর লেলিয়ে তাড়িয়েই দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো পরোয়া নেই। কিন্তু তাদের এহেন অনুশোচনা-মূলক মনোভাব যে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিল তা নয়, বরং এক ধরনের গর্বিত মনোভাবই আচরণে ফুটে উঠেছিল। এ ব্যাপারে দৃষ্টিকোণ হয়তো এই রকমের ছিল, "সত্যিই আমরা লোকগুলোকে গ্রাম থেকে একেবারে তাড়াতে পেরেছি, কেমন, তাই নয়? একেবারে নিঃশ্বাস ফেলারও সময় দিইনি।" কিন্তু সম্পূর্ণ কায়েমী স্বার্থের কথা বিচার-বিবেচনা করেই তাদের ঐ রকমভাবে সুর নরম করতে হয়েছিল। এখন তারা ঘটনার প্রতিক্রিয়া কী ঘটতে পারে, সেই নিয়ে একটু ভীত হয়ে পড়ল। আদিবাসীদের মধ্যেই ভূস্বামীরা বাস করে। গ্রামের চারপাশেই আদিবাসী। ক্ষেতিতে কাজের সময় বা অন্য কোন কাজকর্ম দেখাশুনা করার সময় যে তাদের আদিবাসীদের ঘন বসতির মধ্যেই কয়েকদিন

কাটাতে হয়। সগালের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আদিবাসীরা যদি একেবারে বিগড়ে যায় —তাহলে কী হবে? কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এ সব ভেবে তারা খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। সেইজন্য শ্রীআরেকর মারফত আমাদের আমন্ত্রণ করে ব্যাপারটার ফয়সালা করাটাই তারা নিরাপদ বলে ধরে নিয়েছে। তাদের প্রস্তব আমরা সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলাম। এতে — ওয়ারলিদের ভালো মন্দ কিছু যায়-আসে না।

হঠাৎ এসে-যাওয়া সুযোগটির সদ্ব্যবহার আমরা অন্যভাবে করলাম। বেধড়ক কতগুলো বাস্তব সত্য কথা আরেকরকে শুনিয়ে দিলাম। অসহায় ওয়ারলিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ভূস্বামীদের অত্যাচার আর শোষণের বোঝার একটা বাস্তব চিত্র তার সামনে হাজির করলাম। এও জানিযে দিলাম যে, কেন আমাদের ওপর এমন হামলা-হয়রানি করা হয় তার কারণও আমরা জানি। আমরা জানি এটা হলো আমাদের কাজকে ব্যর্থ করে দিয়ে চিরতরে আমাদের হাত থেকে ভূস্বামীদের আত্মরক্ষার একটা কৌশলমাত্র। কিন্তু আমাদের এমন চোখা চোখা অভিযোগ তার মোটা চামড়া ভেদ করতে পারল না। খুব কৌশলে উত্তরগুলি পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে গিয়ে, উল্টে বরং আমাদেরই বিনামূল্যে কয়েকটা উপদেশ দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করল, "দেখুন যারা এমন করে সমাজ-সেবা করতে চান, সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করেন, তাদের সবসময়ই সবরকম দুঃখ কষ্ট, মান-অপমান বরদাস্ত করে নিতে হয়। ভেবে দেখুন তো, প্রয়াত আগরকরকে কি অপমান সহ্য করতে হয়েছিল—তাকেও প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল।" তার দার্শনিক বক্তব্য শুনে হাসি আর চেপে রাখতে পারলাম না। "জমিদারী অত্যাচারের দিন সীমিত হয়ে আসছে"—এই হুঁসিয়ারি আবার তাকে জানিয়ে দিযে আমরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর কমরেড রেদেকার নারগোলের দিকে, আরেকর শিরগাঁওয়ের দিকে আর কমরেড দলভি ও আমি ভিলাড় অভিমুখে রওনা হলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পর একটা সন্দেহ জাগল মনের মধ্যে। আমরা চলে আসার পর, ক্ষমতাধর ভূস্বামীরা যদি আঁধেরপাড়ায় গিয়ে আমাদের আশ্রয়-দাতাকে ধমকাতে শুরু করে! যদি মারধোরই দেয়, তাহলে তো আদিবাসীদের মনোবল ভেঙে যাবে, আর জারী সম্মেলনের প্রচার-কার্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে! জমিদার সত্যিই যদি এসে তার উপর কোন জুলুম করে—তাহলে সে কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে সে-সব বিষয়ে তো কিছু নির্দেশ তাকে দিয়ে আসা খুবই জরুরী। তাই কমরেড দলভি খুব দ্রুত আবার আঁধেরপাড়ায় ফিরে গেল এবং এ-বিষয়ে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল।

কমরেড দলভি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি একটা পাথরের ওপর বসে রইলাম। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে কমরেড দলভি প্রচণ্ড মানসিক উদ্দীপনা নিয়ে ফিরে এল। আঁধেরপাড়ার ওয়ারলিরা বেজায় খুশী। একজন ওয়ারলি এবং তার পরিবারের লোকজনের সামনেই আমরা একজন জমিদারকে জমিদারি অত্যাচার সম্বন্ধে বেশ ভালো ভালো বাক্যবাণে ধরাশায়ী করে দিয়েছি, একেবারে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছি—এতেই তারা অবাক হয়ে গেছে খুব। বংশপরম্পরা ধরে যে বিক্ষোভ তাদের মধ্যে জ্বলছে, তারই একটু ছেঁকা তো আজ আমরা আরেকর মশাইকে দিয়ে দিয়েছি। এমন অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে তারা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। যে কথা তারা বলে পাঠিয়েছে তার মধ্যে তাদের মনের জোর ফুটে বেরুচ্ছে—"বহিনজীকে বলে দেবেন—কোন চিন্তা নেই। যা হয় হবে, মরতে হয় মরবো, কিন্তু জমিদারকে আর ভয় করবো না।" আদিবাসীদের সামনেই জমিদারকে এমনভাবে 'জোঁকের মুখে নুন দেওয়ার মতো' নাস্তানাবুদ করতে তারা কখনো দেখেনি। তাদের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। তাদের মনের কথাই যে আমরা বলেছি। তাদের উদ্বেলিত উদ্দীপনার স্পর্শে তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ায় আমাদেরও একটা নতুন-অভিজ্ঞতা হল। আমরাও খুশিতে ভরপুর হয়ে ভিলাড়ের পথে এগিয়ে চললাম।

আমরা চলে আসার পরও অনেকদিন ধরে ওয়ারলি কিসান আর ভূস্বামী-বর্গের কাছে আমাদের শিরগাঁও পরিদর্শনের কাহিনী মুখ্য আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্থান গ্রহণ করেছিল। তারপর থেকে আমাদের পরবর্তী কার্যকলাপ ও গতি-প্রকৃতির উপর উভয়বর্গেরই একটা সতর্ক আর উৎসুক দৃষ্টি পড়েছিল।

অতীত অতীতের গর্ভেই সমাহিত থাক

আট বছর পর ১৯৪৫ সালের মে মাসের সেই দিনের সেই বিশেষ স্মৃতি, সেই শিরগাঁওতেই মঞ্চের উপর বসে থাকার সময় আবার মনের পাতায় ভেসে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৪ সাল—নদী দিয়ে অনেক জলই বয়ে গেছে, অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ১৯৫৩ সালে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র পরিষদের ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ে কথাবার্তা বলার জন্য আমাকে শিরগাঁও যেতে হয়েছিল। ঐ সময় বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই শ্রীভালামামা খড়পেকর বললেন, "দেখুন, অতীত অতীতের মধ্যেই বিলীন হয়ে যাক। আসুন, আমরা অতীতকে ভুলে গিয়ে সামনে এগিয়ে চলি।" আমিও এই কথার সমুচিত জবাব দিলাম। তার ফলে বৈঠকের মূল সুরটাই সঠিক পর্দায়

বাঁধা হয়ে গেল। বৈঠক বেশ রুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেই শেষ হল। ঐ দিন আমি শ্রীনিলুভাউ আরেকরের বাড়িতে অবস্থান করলাম। সেই থেকে আজ পর্যন্ত শিরগাঁও গেলেই আমি আরেকরের গৃহেই অবস্থান করি। নিলুভাউর পত্নী শ্রীমতী লীলাতাঈ আরেকর, তার অগ্রজ শ্রীতাতিয়াসাহেব আরেকর আর তাদের উভয়ের সন্তান-সন্ততিরা আজও আমাকে পরিবারের আপনজন বলেই শ্রদ্ধা করে।

মূলত, তাদের পরিবারকে কখনও রাজনৈতিক পরিবার বলা যায় না। 'সংযুক্ত-মহারাষ্ট্র-' প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ছিল তাদের রাজনীতির সীমাবদ্ধতা। মারাঠী ভাষাভাষী জন সমষ্টির সংখ্যাধিক্য রয়েছে এমন ষোলটি সীমান্তবর্তী গ্রাম গুজরাটের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেই গ্রামগুলিকে মহারাষ্ট্রের মধ্যে পুনর্ভুক্ত করার জনপ্রিয় দাবির মধ্যেই তাদের যা কিছু রাজনীতি কেন্দ্রীভূত ছিল। অন্যান্য বিষয়ে তাদের রাজনীতি-বিমুখতা সত্ত্বেও, নানারকম সরকারী অননুমোদনের কোপদৃষ্টিতে তাদের পড়তে হয়েছিল। তার কারণ, আমাদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও সহৃদয় আতিথেয়তা। কাজেই এমনতর বিধিলঙ্ঘনের জন্য সরকারী যন্ত্র উঠে পড়ে লাগল তাদের সমুচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। এই ভাবে ১৯৫৪ সালের পরেও নানাভাবে তাদেরকে হয়রানি ভোগ করতে হয়েছিল। জংগলের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য যে বন্দুক তাদের ছিল, সেটিও তারা বাজেয়াপ্ত করে ছিনিয়ে নিয়েছিল। নানা রকম আর্থিক দণ্ডও তাদের ভোগ করতে হয়েছিল। এই সব বিপর্যয়কর, অপমানজনক ঘটনা সত্ত্বেও, শ্রীনীলুভাউ আরেকর কোনদিনও মনের দিক থেকে ভেঙে পড়েননি। মানবিক-সম্পর্কের সাধারণ সৌজন্যবোধ তিনি কোনদিন বিস্মৃত হননি। ১৯৫৪ সালের পর থেকে শিরগাঁও-এর অধিকাংশ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আমাদের প্রতি তাদের সৌহার্দ্যমূলক হস্ত প্রসারিত করতে শুরু করেছিল।

যে শিরগাঁও গ্রামে ১৯৪৫ সালে একবিন্দু পিপাসার জল সংগ্রহ করাও আমার পক্ষে দুষ্কর কার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই শিরগাঁওতেই ১৯৫৪ সালে সভামঞ্চে এক গুচ্ছ ফুল উপহার দেওয়া হল আমাকে। যে সমস্ত মানুষগুলির আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে মধ্যবিত্তদের মধ্যেও এমন বিরাট এক পরিবর্তন ঘটে গেল, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ দুটো জলে ভরে যায়।

গাছতলার আশ্রয়ে

খাত্তালওয়াড় গ্রাম প্রধানতঃ জমিদার ও মহাজনদের একটা দুর্ভেদ্য দুর্গ। সেখানে যখন সভা-সমিতি করতাম, আদিবাসীদের উপস্থিতি সেখানে খুব কমই হতো। জমিদারদের নাকের ডগায় মাথা উঁচু করে বৈঠকে যোগদান করার মতো মানসিক দৃঢ়তা তখনো তারা অর্জন করতে পারেনি। সেখানে

সভাসমিতি সত্যিই কোনরকম ফলপ্রসূ হতো না। শুধু হয়রানি আর পণ্ডশ্রম। কিন্তু, বলতে গেলে একরকম জমিদারদের নাকের ডগাতেই একটা সভা করে জমিদারদের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদমূলক আক্রমণ আমরা চালিয়েছিলাম, সেই সংবাদের রোশনী-ছটা ঝড়ের মতো পেঁছে গেল জঙ্গলে ওয়ারলিদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে তার অনুকূল প্রভাব পড়ল।

সেই খাত্তালওয়াড় গ্রামে শ্রী আপ্তাজী কালে নামে জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি ছিলেন লোকমান্য তিলকের একজন অনুগামী। তাদের বংশ-গৌরবের জন্য তারা গর্ববোধ করত। "এক-পয়সা-ফান্ড"-আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর আমাদের সভা-সমিতিতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতেন।

খাত্তালওয়াড়ের পিম্পুটকর পরিবারের পৈতৃক ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ বিশাল। পরিবার-প্রধানের মৃত্যুর পর পুরো জমিদারি পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব বর্তায় তার বিধবা পত্নীর উপর। আশ-পাশের গ্রামে সেই বিধবা "সালু পাটলীন" (Salu Patlin) নামে পরিচিত ছিল। তার ভাই শ্রীবীরকর ছিল গ্রামের "পুলিস পাটিল" (Patil)। দিদির প্রতিনিধি হয়ে সেই জমিদারি দেখাশুনা করত। তার চালচলন আচার আচরণে মনে হতো সেই যেন আসল জমিদার। সেই অনগ্রসর গ্রামে মুকুটবিহীন ক্ষুদে রাজার মতো ছিল তার দোর্দণ্ড-প্রতাপ। হাতে চার আঙুলে চারটে আংটি, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে, গরিব মানুষগুলোর মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াত ঐ মহারাজ-বাহাদুর। আমাদের ভাষণ হুবহু টুকে নেওয়ার জন্য একবার সে এসে হাজির হল আমাদের এক বৈঠকে। ভাষণের মর্মার্থ বুঝতে পেরেই একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। বস্তুতঃ সারা গ্রামটাই গরম হয়ে উঠল আমাদের ধৃষ্টতা দেখে। আমরা কিনা তাদের গ্রামে বৈঠক করতে গিয়েছি? বীরকর ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মতো ছোটাছুটি করতে লাগল—কী ভাবে আমাদের একেবারে খতম করে দেওয়া যায় তাই নিয়ে সে বাড়িতে বাড়িতে চালাতে লাগল বৈঠকের পর বৈঠক ও নানান আলাপ-আলোচনা। আমাদের রাজনীতি, আমাদের ভাষা ও বক্তৃতার বিষয়গুলি যেন তাদের কাছে নূতন ও পীড়াদায়ক। এই সভার আগে এমনিতেই গ্রামের লোকজন আমাদের প্রতি আতিথেয়তা দেখাতে চাইতো না, পরে তো পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে উঠল।

আপ্তাজী কালের এক ছেলের একটা ছোট্ট হোটেল ছিল গ্রামের মধ্যে। মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরটা দুভাগ করা হয়েছিল—সামনের দিকে হোটেলের কাজ; পিছনের দিকটা ফাঁকা থাকত। "কি? আমি কাউকে ভয় করি নাকি? চলুন, আমার হোটেলে চলুন, আমি আপনাদের থাকার জায়গা

দেব। বেশ সাহসী বীরের মতো এই কথা বলে সে আমাদের পিছনের দিকে ফাঁকা জায়গাটায় থাকতে দিল। ঘৃণা আর কৌতুক মেশানো দৃষ্টিতে গ্রামের লোকেরা উঁকি মেরে দেখতে লাগল আমাদের। কিন্তু তাদের কেউ আমাদের সংগে কোনো কথাই বললে না।

আন্তাজী কালে খবর পেলেন যে আমরা ওখানে আছি। সংগে সংগে দুপুরে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তাঁর পত্নীকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গ্রামের সাধারণ বিরুদ্ধাচরণের পরিপ্রেক্ষিতে তার এই আমন্ত্রণে বেশ কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। পরে জানতে পেরেছিলাম—ভদ্রলোক একটু খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁর বদ্-মেজাজের বেশ খ্যাতি আছে। গ্রামের কারুর সংগে তার তেমন মিলমিশ ছিল না। এই জন্য কেউ তার ব্যাপারে মাথা গলাত না।

পয়সা-ফান্ড (Paise fund) কালেক্‌সনের সময় ঐ কালেজী একবার পুণায় আমার পিতা প্রয়াত লক্ষ্মণ রঘুনাথ গোখলের কাছে এসেছিলেন। তাঁর এখনো মনে ছিল যে, আমার পিতা তাঁকে আড়াইশ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। খাওয়া-দাওয়া, স্নান-টানের ব্যাপারে খুব অসুবিধে চলছিল। তাই শ্রীমতী কালে আমন্ত্রণ জানানোর সংগে সংগেই তার প্রস্তাবে স্বীকৃতি জানালাম। বাড়িতে যাওয়ার পর বাড়ির মেয়েরা সাদর অভ্যর্থনা করল। কালেজী কিন্তু বাইরেই বসে রইলেন, অন্দর মহলে একবারও আমার খোঁজ-খবর করতে এলেন না। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার হোটেলে ফিরে এলাম। সেখানে আমার কিছু লেখার কাজ সেরে নিলাম। তারপর দুদিনের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে অন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। দুদিন পরে আবার খাত্তালওয়াড়ে ফিরে আসবো—তাই বাকী মাল-পত্তর হোটেলেই রেখে গেলাম।

দুদিন পরে যখন ফিরে এলাম—দেখি, সারা গ্রামের পুরো পরিবেশটাই একেবারে বদলে গেছে। এক হাতে ছড়ি, আর এক হাতে বন্দুক নিয়ে 'পুলিশ-পাটিল' শ্রীযুত্ বীরকর মহারাজ সারা গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সন্ত্রাস-সৃষ্টি করেছে, বেশ সুচারু রূপেই তার ক্রিয়া-কলাপ চালিয়েছে। কালেজীর ছেলেকে হোটেলে এসে এক ধমক দিতেই তার সাহস-ভরা আগের মনোভাবে চিড় ধরে গেছে। পুলিস-পাটিল প্রত্যেক গ্রামবাসীকেই বেশ ঠিক ভাষায় শাসিয়ে গেছে। "মনে রেখো সব, কেউ যদি লোকগুলোকে আশ্রয় দাও, কোন রকম মদত দাও তো দলাই-মাড়াই করে ছেড়ে দেব, গ্রামের মধ্যে ঢুকতে দেব না একেবারে।" গ্রামের ভূস্বামীবর্গ সবাই তার এই আচরণে পুরো সমর্থন জানিয়েছে। এ হেন পরিস্থিতিতে, প্রচার-বৈঠক সেরে যখন খাত্তালয়াড়ে ফিরলাম, তখন কে আর আশ্রয় দিতে সাহস করবে? সবাই ভীতচকিত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়েই রইল।

শিরগাঁওতে যা ঘটেছিল, খাণ্ডালওয়াড়েও ঠিক সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কালের হোটেলের সামনে একটা গাছতলায় জিনিস-পত্তর নিয়ে বসে আছি। সংগে আর কেউ নেই। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি ঘনিয়ে এল। কি করি? কোথায় যাই? কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। মনে মনে কিন্তু বেশ কৌতুক বোধ করছিলাম—মনুষ্য-প্রকৃতির কী বিচিত্র খেয়াল! তালাবন্ধ হোটেলঘর। অনর্থক বাইরেই বসে আছি। একবার তো ঐ ঘর আমায় আশ্রয় দিয়েছে, তাই তাকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। বসেই রইলাম। শোয়া তো দূরের কথা, সেখানে রাত্রি কাটানোই যে মুস্কিল ব্যাপার। সনজন স্টেশনে প্রতীক্ষালয়েই রাত্রিটা কাটিয়ে দেব—এই ভেবে জিনিসপত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। একটু এগুনোর পর আবার ভাবতে ভাবতে থেমে পড়লাম, স্টেশন প্রায় তিন মাইল দূরে, ওখানে পেঁছাতেই তো অনেক রাত্রি হয়ে যাবে। সংগে কেউ নেই, নির্জন পথ। রাত হলে কাক-পক্ষীও চোখে পড়বে না। সংগে সংগেই ফিরে পড়লাম। রাত্রি নেমে আসার পর গ্রামগুলোও মড়ার মতো পড়ে থাকে। খাণ্ডালওয়াড়ে যখন আবার এসে পেঁছালাম, রাত্রি তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন। চারিদিকে নৈস্তব্ধের রাজত্ব। দোকানদারী সব বন্ধ হয়ে গেছে। জমিদারদের দেউড়ি অর্গলবন্ধ হয়ে গেছে। তখনকার দিনে ভূস্বামীরা হামেশাই তাড়ি বা মদ্যপান করত। খানা-পিনাপর্ব মহাসমারোহে শেষ করে সবাই তাবা শান্তিতে নিদ্রামগ্ন। তারা ধরেই নিয়েছে—একবার যেমন শিরগাঁওতে করেছিলাম—ঠিক তেমনই হয়তো এবারও কোন আদিবাসীর ঘরে রাত্রির মতো আশ্রয় নিয়েছি। গ্রামে কোন বিজলী আলো ছিল না। দোকানখানি বন্ধ হওয়ার সংগে সংগে গ্যাস-বাতিও সব নিভে গেছে, কোন ঘরেও আর আলো জ্বলছে না। পথ ঘাটে ঘন অন্ধকার। কেই বা আর এখন বাইরে আসার সাহস করবে?

কালের হোটেলের সামনে সেই গাছতলায় আবার এসে দাঁড়ালাম। অত রাত্রিতে আর কোথায়-ই বা যাব? ওয়ারলিদের পাড়াগুলো কোনদিকে তাও জানতাম না। পুঁটলির মতো করে কাপড়গুলো সব বেঁধে, গাছের গুঁড়িটার পাশে রেখে, তারই উপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা চাদর-মুড়ি দিয়ে বসে রইলাম। বৃক্ষতলে অবস্থান ছাড়া রাত্রি কাটানোর আর তো কোন পথ নেই। এক একটা মুহূর্ত কাটছে, মনে হচ্ছে যেন একটা যুগ। খুট্ করে একটু শব্দ হলেই শিউরে উঠছি। ভয়ে শরীর শিউরে উঠছে। এভাবে বসে বসে সারা রাত্রিটা কাটাতে হবে। সময় যেন কাটতেই চায় না। ধীর শম্বুক গতি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ রাস্তার ওপারের একটা ঘর থেকে একজন বাইরে বেরুল। আমাকে সেখানে দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। দেখে

তো প্রথমেই খুব ঘাবড়ে গেলাম। পরে বুঝলাম—একজন সামান্য গরিব মানুষ। নিজের ঘরেই ছোট্ট একটা মামুলি চায়ের দোকান চালায় সে। কাছে এসে বলল, "বহিনজী, কী করি বলুন তো! জলে বাস করে তো আর কুমীরের সংগে বিবাদ করা যায় না! গাঁয়ে বাস করতে হলে জমিদার বাবুদের মর্জিমতো থাকতে হবে—তাদের চটাতে গেলেই বিপদ!" তারপর একটা ছোট্ট ঘটিতে করে চা তৈরী করে এনে আমায় দিল। মনের ঐ পরিস্থিতিতে চা যেন মৃত-সঞ্জীবনীর মতো মনে হল। চরম তৃষ্ণার্তের মতো চা খেতে লাগলাম। সে বলল, "ইচ্ছে হয় তো এখানে ঘুমিয়ে পড়তেও পারেন। আমরা পাশেই রইলাম। কোন ভয় নেই এখানে। এই বলে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তিন-চার জন আদিবাসী এসে হাজির হল। কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালাল। সারারাত আমার পাশে বসে রইল। বার বার আমাকে ঘুমিয়ে পড়ার অনুরোধ উপরোধ করতে লাগল। ভগবানই জানেন—কী করে ওরা খুঁটিনাটি সব খবর রাখত—আমি কোথায় আছি, কি করছি? আমার গতিবিধির উপর সব সময় একটা নজর রাখত—কিন্তু বাইরে সেটা কোনদিন প্রকাশ পেত না। যখনই কোন বিপদে পড়তাম, যখনই প্রয়োজন পড়ত, ঠিক যেন ম্যাজিকের মতো, সব সময় তারা এসে হাজির হতো—আমায় বিপন্মুক্ত করত। আমার প্রতি তাদের এই দৃঢ় নিষ্ঠার নতুন পরিচয় উপলব্ধি করতে পেরে আমার দেহমনের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল। ওয়ারলিদের সাহচর্যে সারাটা রাত কাটিয়ে দিলাম বসে বসে। ভোরে আলো ফুটতেই তারা চলে গেল সব। সকাল বেলায় হোটেল থেকে জল নিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে ফেললাম। তারপর চা খেলাম।

পরবর্তী বৈঠকের জন্য যাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত কী যেন এক দুর্বোধ্য কারণে সেই হোটেলের সামনেই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। গত রাত্রির ঘটনার কথা ভাবছি। এমন সময় আন্তাজী কালে সেখানে এসে হাজির, আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললেন—গাঁয়ের কিছু উপদ্রবকারী লোক এসে তাঁর স্ত্রীকে খুব প্ররোচিত করে গেছে। বলেছে, "আপনি যে ভদ্রমহিলাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনে তার সংগে একাসনে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছেন, উনি তো প্রায়ই আদিবাসীদের ঘরে একসংগে খান-দান। দেব-ধর্ম, ব্রাহ্মণের আচরণীয় কোন শাস্ত্রীয় বিধিবিধানই মানেন না, অস্পৃশ্যতা স্বীকার করেন না। আর উনি তো এক স্বারস্বত ভদ্রলোককে বিয়ে করেছেন"। এই সব শুনেই তো তাঁর স্ত্রী ক্ষেপে আগুন। পতি-পত্নীতে খুব ঝগড়া হয়ে গেছে—নানান্ তর্কাতর্কি আর তার জের ধরেই দুদিন

তাঁকে না-খেয়ে উপবাসে কাটাতে হয়েছে। শ্রীমতীর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে আমি তার বাড়িতে গিয়েছি, সেখানে খেয়েছি, এতেই তার বাড়ি অপবিত্র হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা খুব ধর্ম-পরায়ণা। পবিত্রতা শুচিতা-সম্বন্ধীয় সমস্ত শাস্ত্র-বিহিত নিয়ম-কানুন তিনি নিষ্ঠাভরে মেনে চলেন। অনেক বাক্-বিতণ্ডার-পর, ঘরে বাইরে গোমূত্র ছিটিয়ে সব কিছু শুদ্ধ করে, আর শ্রীযুক্ত কালের দু-দিন উপবাস করা হলে পর তবেই শ্রীমতী কিছুটা শান্ত-মূর্তি হতে পেরেছেন।

এই সব ঘটনার কথা স্বয়ং কালেজীই আমাকে বলেছিলেন। আমাকে নিজের ঘরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে না পারার অক্ষমতায় ভদ্রলোক খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। সব শুনে আমার খুব কষ্ট হল। বললাম তাঁকে, "এমনই যখন ব্যাপার ঘটতে পারে বলে জানেন তো—আমায় আমন্ত্রণ করতে গেলেন কেন? আমার জন্যই আপনাদের স্বামী-স্ত্রীতে এমন বাদ-বিসম্বাদ হয়ে গেল—আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি কোন রকমে এখানে চালিয়ে নিতে পারতাম" এই বলে কালেজীকে বোঝাতে লাগলাম,—"এতে—আপনার কোন দোষ নেই।" তিনি উলটে বলতে লাগলেন, "ছাড়ুন তো ও সব! এটা কি নতুন নাকি? আগে একবার এই রকম মহর্ষি কার্ভেজীকে আমার বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজের আমন্ত্রণ করেছিলাম—তখনো ঠিক ঐ লোক-গুলোই ঐরকম ঝুট-ঝামেলা পাকিয়েছিল। এতো হামেশাই ঘটে—ঘটবে।" তাঁর সংগে এই সব কথাবার্তা চলছে, এমন সময় শ্রীকর্হাড়কর নামে এক ভদ্র-লোক আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক ইন্সিওর্যান্স কোম্পানির একজন এজেন্ট। কালেজী তার সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এর পর থেকে, অনেক বছর ধরেই, যখনই খাত্তালওয়াড়ে গিয়েছি – তখনই শ্রীমতী কর্হাড়কারের আগ্রহাতিশয্যে তাদের বাড়িতেই থাকতাম। আমাকে বাড়িতে আদর-আপ্যায়নের পিছনে তাদের মনের মধ্যে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, যখনই যেতাম, কোন সময়ই তাদের অভ্যর্থনায় ত্রুটি ঘটত না।

আদালতের এক কক্ষে

উম্বরগাঁওয়ে যে অবস্থা, দহানুতেও তেমনি বিপজ্জনক অবস্থা। সেখানে বৈঠক, সভা বা অফিস—যে কোন প্রয়োজনেই হোক, কোন ঘর ভাড়া পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠত। কারণ সব বাড়িরই মালিক হচ্ছে সেই ভূস্বামীবর্গ। দহানু তহশীলে আন্দোলনের গতি খুব দ্রুত তীব্রতা লাভ করল। আদি-বাসী ও ভূস্বামী উভয় তরফ থেকেই অভিযোগ পালটা-অভিযোগের বন্যা

বইতে শুরু হল। জমিদারের তরফে মামলা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট উকিলরা নিযুক্ত থাকত। আর আদিবাসীদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য সুদক্ষ উকিল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত। কারণ উকিলদের যথাযোগ্য ফি-এর বিরাট খাঁই মেটানোর সাধ্য তাদের ছিল না। আমরা তাই থানা জেলা-সদর থেকে শ্রীভাড়কমকর নামে একজন আইনজীবীকে সেখানে সারাক্ষণের কর্মী হিসেবে মামলা পরিচালনার জন্য বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করালাম। তিনি অনেক কষ্টে ম্যাজিস্ট্রেটের কাচারি বাড়ির কাছাকাছি জনৈক ফাটকজীর বাড়িতে এক কোণের দিকে একটা ছোট কামরা উকিল হিসেবে ভাড়ায় পেলেন। সেখানে শ'য়ে শ'য়ে কৃষক আসতে লাগল নানারকম উপদেশ পরামর্শের সাহায্যের জন্য। "আমাদের আপন জন একজন উকিল সাহেব দহানুতে এসেছেন আমাদের স্বার্থ পরিরক্ষণের জন্য"—এই চিন্তাতেই তাদের মনের জোর প্রচণ্ড বেড়ে গেল। কিন্তু এই সুব্যবস্থা বেশিদিন চালানো গেল না। ভাড়কমকরজীর ছিল কাশি-হাঁপানির টান। দহানুর আর্দ্র জলবায়ু তার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। তাই সেই জায়গা ছেড়ে চলে আসতে তিনি বাধ্য হয়ে ছলেন।

উকিল সাহেব ফিরে যাওয়ার পর, তার কামরাটি আমাদের ছেড়ে দিতে হয়েছিল সংগে সংগেই; সেটা আর আমরা পেলাম না। শ্রীনানহু বেন্দু ঘরাট নামে একজন কিসানকে দিয়ে আমরা শ্রী বরজোর শেঠ, সুগন্ধি শেঠ প্রভৃতি ভূস্বামী ও দহানুর দারোগা সাহেব শ্রী সার্লাভির বিরুদ্ধে একটা মোকদ্দমা দায়ের করেছিলাম। মামলাটা ঐ সময়ে বহুল প্রচারিত হয়ে উঠেছিল। কোর্টে শুনানীর জন্য মামলাটা উঠেছিল তখন। সাক্ষী হিসাবে জেলা কালেক্টর শ্রী বেড়েকর, কমরেড পারুলেকর ও আমাকে শুনানীর সময় হাজিরা দিতে হতো। সেজন্য অন্যান্য পার্টি-কর্মকর্তাদের নিয়ে আমরা দহানুতে উপস্থিত হয়েছিলাম মামলাতে হাজিরা দেওয়ার জন্য, আর সটান গিয়ে পেঁছালাম উকিল সাহেবের ভাড়াকরা ঘরটায়। তিনি তো তখন সেখানে থাকতেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন একজন পার্টি-কর্মী, তাই আমরা ধরেই নিয়েছিলাম—ঘরটা নিশ্চয়ই আমরা ব্যবহার করতে পারব। ঘরটা-খুবই সংকীর্ণ, একটিমাত্র কামরা—আর তার সংগে লাগোয়া একফালি বারান্দা। পুরো বাড়িটার জন্য ছিল একটা সার্বজনীন ইঁদারা। দুদিন পরেই কিন্তু ঘরটা ছেড়ে দিতে হল।

সব জায়গারই আমাকে একটা চিরন্তন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো—সেই স্নানের সমস্যা। প্রথম দিনটা স্নান না করেই কাটিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় দিনে ইঁদারার পাশের ছোট স্নানঘরটা ব্যবহারের অনুমতি পেলাম কোন

রকমে। কুয়ো থেকে জল টেনে তোলার অভ্যাস কোনদিনই আমার ছিল না। এই প্রথম নিজে জল তুলে স্নানের ব্যবস্থা করতে হল আমাকে। যেই কোন রকম করে জল তুলতে আরম্ভ করেছি, বাড়ির সব মধ্যবিত্ত মেয়েরা, আমার সেই অনিপুণ প্রচেষ্টা দেখে বাইরে বেরিয়ে এসে উপহাস-চকিত দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখতে লাগল, হাসাহাসি চলল নিজেদের মধ্যে। খুব খারাপ লাগল, হতাশ হয়ে পড়লাম, নিজের প্রতি নিজে খুব অনুকম্পা বোধ করলাম। ভাবলাম—আজ যদি আমি কোন কংগ্রেস পার্টির কর্মী হতাম বা মহিলামণ্ডলের কোন কর্মকর্ত্রী হতাম, কমপক্ষে হতাম যদি একজন শুধুমাত্র ভ্রমণবিলাসী, তাহলে এটা হলফ করে বলতে পারি যে এই ভদ্রমহিলারাই তখন আমার ওপর কত কৃপাবর্ষণ করত, কত আদিখ্যেতা দেখাত। হয়ত নিজেরাই গরম জল নিয়ে এসে হাজির হতো আমার স্নানের জন্য, আর স্নানপর্বের পর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে 'শাকান্নভোজনের' জন্য পীড়াপীড়ি করত। আমাকে তখন তাদের আপনজন মনে করে কত ছোটাছুটি-ই না করত, কত কষ্ট না করত আমারই জন্য। কিন্তু এরা হচ্ছে তারাই, যারা কোনদিন আমাদের কাজ, তার লক্ষ্য আর তার ফলাফল, তা সে ভালোই হোক আর খারাপই হোক, কোন কিছুর সংগে পরিচিত হওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করে না, তাদের এহেন ঔৎসুক্যহীন নির্লিপ্ততায় অবাক হয়ে গেলাম, তাদের এই আত্ম-সন্তুষ্টিতে তাদের জন্য অনুকম্পা বোধ করলাম। কেন তাদের এই ঔদাসীন্য? আমাকে তাদের এত ভয় কেন? হয়তো তাদের এই মৌলিক ভয়ের সংস্কারবশতই আমার ও আমার আদর্শ থেকে অনেক দূরেই তারা নির্লিপ্ততার বোরখা পরে অবস্থান করত। জন্মজন্মান্তর ধরে তারা তাদের এই গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে শুধু শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরেই তারা এমনভাবে অভ্যাস-সংস্কারের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে! তাদের এই সংকীর্ণ জীবনধারায় তাদের প্রতি ঘৃণা জেগে উঠল মনের মধ্যে। খুব স্বাভাবিকভাবেই, তাদের পাশাপাশি আদিবাসী মেয়েদের বৈপরীত্য ভেসে উঠল চোখের ওপর। কত কষ্ট তাদের, কী হাড়ভাঙগা পরিশ্রম করতে হয় জীবিকার জন্য, তবুও কিন্তু কত স্বচ্ছন্দে জীবনের মাধুর্যটুকু উপভোগ করার যোগ্যতা আছে তাদের। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর পূর্ণতা পায় মনের মধ্যে। আমার তো এই সব মধ্যবিত্ত-সুলভ মনোভাবের মানুষগুলোর থেকেও আদিবাসীদের জীবনবোধ অধিক কার্যকরী বলে মনে হল। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কোনক্রমে স্নানটা সেরে নিয়ে কামরায় আবার ফিরে এলাম।

এসে দেখি, ইতিমধ্যেই অনেক আদিবাসী তাদের নানান অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম সব সেরে যখন উঠলাম, তখন প্রায় গোধূলি নেমে এসেছে। রাত্রির খানা-তৈরির যোগাড়-যন্ত্র করতে শুরু করেছি, এমন সময় এক উকিল সাহেব থানা জেলা সদর থেকে আমাদের অংগনে এসে হাজির, সংগে তার স্ত্রী। আমাদের ওপর চোখ পড়ার সংগে সংগেই তারা আরম্ভ করল,—"এই কামরা শ্রীভাড়কমকর ভাড়া করেছিলেন। আমরা তার নির্দেশ নিয়েই এখানে এসেছি। এক্ষুনি আপনাদের ঘর খালি করে দিতে হবে।" আমরাও সংগে সংগে অনুমান করলাম যে বাড়িওয়ালীর তরফ থেকেই এরা এসেছে, কারণ সে ভদ্রমহিলা আমাদের তাড়াতে চায়। কোন ভাড়াটিয়া ভাড়া দিতে না পারলে বাড়িওয়ালা তাকে উচ্ছেদ করার জন্য যেমন গরম মেজাজে কথা বলে—ঠিক সেইরকমই ছিল এদের কথা-বার্তার ঝাঁজ। আমাদের অন্যান্যরা কেউ কোন কথা না বলে চুপচাপ রইল। শেষে আমি বললাম, "দেখুন, আমিও তো একজন ভদ্রমহিলা। এই রাত্রিতে এই মুহূর্তে অন্যত্র কোথায় আর যাই বলুন তো?" কিন্তু এই যুক্তি তাদের বধির কর্ণে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারল না। উকিল সাহেবের ধর্মপত্নীর ক্রোধের মাত্রাটাই যেন খুব বেশি বলে মনে হল। আমাদের কোন কথা শুনতেই চায় না—একেবারে নারাজ; বারে বারে একই কথা বলতে লাগল, "এই মুহূর্তেই ঘর ছেড়ে দিতে হবে।" আমরাও বলতে পারতাম, "ভাড়কমকরজীর লিখিত নির্দেশ না দেখানো পর্যন্ত আমরাও এক-পা নড়ছি না।" কিন্তু তাদের ঐ-ধরনের উদ্ধত মেজাজ দেখে আমাদের সকলেরই আত্মাভিমানে ঘা লেগেছে। তাই কমরেড পারুলেকর বলে উঠলেন "বরং গাছতলায় রাত কাটাবো, তবুও এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। কমরেড বীরকর তো ঘরের মধ্যের জিনিসপত্র বেঁধে-ছেঁদে বের করতে যতটুকু সময় লাগে, তার থেকে এক সেকেন্ডও বেশি থাকতে রাজী নয়। ভাবলাম, সামনে এখনো দীর্ঘপথ, কত বড় বড় লড়াই পড়ে আছে, লড়তে হবে। এদের সংগে কথা কাটাকাটি করে মূল্যবান সময়ের অপচয় করা মোটেই সমীচীন নয়। সংগে আমাদের জিনিসপত্র সামান্যই থাকত। বাইরে সব এক জায়গায় করা হল। এমন সময়, পরের দিন যে উকিল আমাদের হয়ে লড়বে, সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ শ্রী গোদিওয়ালা এসে হাজির।

সামনে আমাদের এখন বিরাট সমস্যা। এত লোক কোথায় যাবো? স্টেশন যাওয়ার রাস্তার মোড়ে একটা বিরাট গাছ আছে—গাছটা ঘিরে চারদিকে বেল পাথর দিয়ে বেদী বানানো আছে। ঠিক করে ফেললাম—আর কোথাও কোন বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব না হলে ঐখানে ঐ গাছতলাতেই আমরা রাতটা কাটিয়ে দেব।

একটা অদ্ভুত যোগাযোগ হয়ে গেল। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পাশেই আমাদের কমরেড দাজী নাগারকরের ভগিনী শ্রীমতী যমুনাবাঈ ফাটক কিছু-দিনের জন্য ওখানে এসেছিলেন আমরা যেখানে ছিলাম ঠিক তার উল্টো দিকে। আমি তাঁর কাছে সন্ধান নিতে গেলাম—যদি রাত-কাটানোর মতো কোন জায়গার সন্ধান তিনি দিতে পারেন। উনি সংগে সংগেই বললেন, "এর জন্য এত দুশ্চিন্তা কেন? এত রাত্রিতে আর কোথায় যাবেন? এই বারান্দা তো বেশ প্রশস্ত আর পরিষ্কার, এখানেই আজ রাতটা কাটিয়ে দিন, কাল সকালে ঠিক করবেন পরবর্তী ব্যবস্থা কী করা যেতে পারে।" এই শুনে জিনিসপত্র আনতে চলে গেলেন। এই ফাঁকে যমুনাবাঈজী বারান্দাটা ঝাড়ু দিয়ে সাফ করে দিয়েছেন—আমাদের জন্য পানীয় জলের বন্দোবস্তও করে রেখেছেন। সে সময়ে প্রয়াত নানাসাহেব ফাটক ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী যমুনাবাঈ স্টেশনের পাশেই থাকতেন। অনেক সময় তাঁদের বাড়িতে আমি গিয়ে থেকেছি। পরিবারের সবাই আমাকে খুব ভালবাসত। আন্দোলনের পরবর্তী মাস-গুলোতে আমাদের কাজকর্মও বেড়ে গেল অনেক, সব সময় আদিবাসীদের আনাগোনার আর কোন বিরতি রইল না। অবস্থা বুঝে ঠিক করলাম—এত ভীড় করে তাদের বাড়িতে থাকাটা যুক্তিসংগত নয়। তাই আর থাকতাম না সেখানে। কিন্তু জানতাম—কোনদিন সেখানে থাকতে গেলে আমার অসুবিধা হবে না—আমার জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। আজ পর্যন্তও তাদের সংগে একটা গভীর বন্ধুত্বের সংযোগ-সূত্র বজায় রয়েছে।

পরের দিন সকালের সবচেয়ে জরুরী কাজ হয়ে দাঁড়াল—থাকার জায়গা ঠিক করা। কারণ খোলা বারান্দায় দু'দিন ধরে থাকা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার। পরদিন সকাল ন'টার কাছাকাছি ওখানকার জজ শ্রীযুত হাকিম সাহেবের সংগে দেখা করলাম। বুঝিয়ে বললাম "এই মামলার সাক্ষী-সাবুদ আমরা, তাই আমাদের এখন দহানুতে থাকতেই হবে। কিন্তু এখানে থাকার মতো জায়গা মিলছে না। বাড়ির মালিকরা কেউ আমাদের থাকার জন্য ঘর দিতে রাজী নয়। তাই খুব অসুবিধের মধ্যে পড়েছি।" হাকিম সাহেব সংগে সংগেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সমুদ্রের ধারে আদালত গৃহের একটা বিরাট খোলামেলা দালান ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। মেঝেটা কার্পেট দিয়ে ঢাকা। চমৎকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আদালতগৃহ দেখাশুনা করার জন্য যে সব আদিবাসী নিযুক্ত ছিল তারাই আমাদের চা খাবার ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে দিল। সমুদ্রের তীরে প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত দালানঘরে থাকা আমাদের পক্ষে বেশ বিলাসবহুল মনে হতে লাগল। দুটো দিন বেশ আরামেই কাটিয়ে দিলাম।

শুনানীর জন্য কোর্টে যখন মামলা উঠত, সমস্ত আদালত প্রাঙ্গণ দর্শনার্থী ও শ্রোতার ভীড়ে একেবারে ভরে উঠত। তাদের মাধ্যমেই আদালত-কক্ষে আমাদের অবস্থানের সংবাদ আগুনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই ছোট্ট শহরে এটাই আলোচনার প্রধান বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়াল। কেউ কেউ খুব আশ্চর্য হল আবার কারুর বা মনের মধ্যে আরও ক্রোধ সঞ্চার হল। স্বয়ং জজসাহেব আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এতে আমাদের মর্যাদা আরও বেড়ে গেল। সেখানের কাজ শেষ হয়ে গেলে পর আমরা জজসাহেবকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। কমরেড পারুলেকর ও আমাদের উকিল শ্রীগোদিওয়ালা বোম্বাই চলে গেলেন—আর আমরা গ্রামে ফিরে গেলাম আমাদের কাজে।

আস্তাবলের দিনগুলো

দহানুতে কাচারির আইনগত কাজকর্মের ব্যাপারে প্রায়ই যেতে হত। গিয়ে সব কাজ সেরে, সেইদিনই আবার অনেক দূরে কোন গ্রামে পায়ে হেঁটে ফিরে আসতে মোটেই আর ইচ্ছা হত না। তাই দহানুতে কোন আদিবাসীর বাড়িতে স্থান পাওয়া একান্ত জরুরী হয়ে পড়ল। দহানুতে অধিকাংশ ভূস্বামীদের বাসস্থান—বড় বড় সব বাড়িগুলিই সম্পন্ন ভূস্বামীবর্গের। সুতরাং তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করা একেবারেই নিরর্থক। গরিব মানুষদের মধ্যে সাহায্য সন্ধান করতে লাগলাম। অধিকাংশ গরিবরাই আবার ভূস্বামীদের অংগুলিহেলনে তটস্থ থাকতে বাধ্য হয়। এমন একজন লোকের সন্ধান পাওয়া দরকার, যে সাধারণতঃ একটু স্বাধীন সত্তার, স্বাধীন ব্যবসা নিয়ে থাকে, অন্যেরা যার ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামায় না—তেমন লোকই কেবল আমাদের থাকার জায়গা দিতে পারে। বাবু টাংগাওয়ালা এমনই একজন ব্যক্তি। সে তার আস্তাবলে আমাদের থাকার জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিল। শহরের এক প্রান্তে সমুদ্রের খাঁড়ি আর ম্যাজিস্ট্রেটের কাচারির কাছাকাছি এক জায়গায় তার বাড়ি। বাড়িটায় শুধু একটিই ঘর ছিল যা প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা আর ষোল ফুট চওড়া। একটা পার্টিসন দিয়ে আট ফুট চওড়া আর ষোল ফুট লম্বা একটা কামরা আলাদা করা হয়েছে। সেই কামরায় থাকে বাবু, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা। বাকী অংশটার মাঝামাঝি একটা কাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে কামরাটা দুভাগ করা হয়েছে। দেওয়ালে মাটি ধরানো হয়নি তেমন, অমসৃণ যেন হাড় বেরিয়ে আছে। তার এক পাশে থাকত তার ঘোড়াগুলো আর অন্য দিকটায় আমরা আমাদের অফিস করলাম। আমাদের দিকটায় কোন দরজার বালাই ছিল না। এটা যখন একটা আস্তাবল তখন

এর থেকে আর বেশি কী আশা করা যায় ? সর্বোপরি, টাঙ্গাওয়ালাজী তো বলেই দিয়েছে স্পষ্ট করে যে, সে কোনরকম মেরামত করে দিতে পারবে না, আর যদি নিতেই হয় তাহলে ঠিক যেমনটি দেখছি তেমনটিই নিতে হবে। ঘরটা নিয়েই ফেললাম আমরা। ভিক্ষার চাল তার আবার কাঁড়া আর আকাড়া, পছন্দ-অপছন্দের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।

আমাদের কার্যালয়ের জন্য ঘর আমরা পেয়েছি এতেই আমরা খুশী—তা সে যে ধরনের ঘরই হোক্ না কেন ! কিন্তু আমার সেই স্নানের জায়গার সমস্যা নিত্যস্থায়ী থেকে গেল—এতে মনটা একটু খুৎখুৎ করতে লাগল। আস্তাবলের পিছন দিকে একটা বিরাট পাথর পড়েছিল। ওখানেই সন্ধ্যা হয়ে গেলে পর স্নান সেরে নিতাম। রাত্রিতে ওদিকে তেমন যাতায়াত হত না—তাই সুবিধে ছিল।

হোটেল থেকে চা আনিয়ে আমরা খেতাম। দুপুরবেলায় শেউ (Shev) বা চিউড়া (Chivda) ইত্যাদি কোন কিছু খেয়ে নিয়ে কাজ চালিয়ে নিতাম। দিনভোর এই সব হাল্কা খাদ্য খেয়ে পেট মোটেই ভরত না—দারুণ খিদে লাগত, তাই কাজকর্ম সেরে রাত্রিতে ডাল-ভাত বা সব্জী-ভাত বানিয়ে নিতাম। দিনের শেষে রাত্রির ঐ খানাই ছিল আমাদের প্রধান খাদ্য, সারাদিন কাজের মধ্য দিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, তাই রাত্রিটাই ছিল প্রশস্ত সময়—ধীরে-সুস্থে খাওয়া-দাওয়ার সময় পেতাম। যে সব আদিবাসী কাজ নিয়ে দহানুতে আসত তারাও মাঝে মাঝে রাত্রিতে থেকে যেত। কাচারির কাজ-কর্ম সেরে যখনই আমরা ফিরে আসতাম তারপরই তারা তাড়াতাড়ি তিনটে পাথর দিয়ে তৈরী করা চুল্লী জ্বালিয়ে ডাল-ভাত রান্না করে ফেলত আমাদের জন্য। সেই খাদ্যই সবাই আমরা ভাগ করে খেতাম। ওয়ারলিরা আমাদের অন্যান্য অসুবিধারও কিছু কিছু সমাধান করতে সাহায্য করল। বাজার থেকে দুটো মাটির ঘড়া কিনে আনল জল রাখার জন্য। পরিচিত কোন লোকের কাছ থেকে খাওয়ার জন্য প্রথম প্রথম কলাপাতা চেয়ে আনত, পরে পরে প্রচুর পরিমাণে 'পাতার থালা' তৈরি করে রেখে যেত। ডাল-চাল হাঁড়িতেই রান্না করা হত। তারপর মনের আনন্দে সবাই মিলে খেতাম, ভালোই লাগত। কয়েকটা হাঁড়ি-কুঁড়ি দিয়েই কেমন সরল অনাড়ম্বরভাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, মানুষ কেমন মিতব্যয়িতার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে—ওখানেই তা ভাল করে বুঝতে পারলাম।

আমরা সব আস্তাবলেই চুল্লীর আগুনের আলোর পাশে বসে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আদিবাসী জীবনের সমস্যা, গ্রামের সাম্প্রতিক খবরাখবর, দহানুর জমিদারদের কার্যাবলী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতাম।

ঘুম না আসা পর্যন্ত এই রকম চলত। সবাই ঐ আস্তাবলেই ঘুমিয়ে পড়ত। আজও একটা কথা ভাবতে গেলেই কেমন যেন লোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। কখনও কখনও যখন আমরা খেতে বসতাম আর ঐ সময় হঠাৎ যদি জোরে একটা দমকা বাতাস উঠত, তখন একটা ধুলোর ঝড় বইত আর তার সংগে মিশত ঘোড়ার শুকনো মলের চাপ-চাপ গুড়ো। গোটা দেহে একেবারে ছেয়ে যেত, আর ভাতের উপরও একটা স্তর সৃষ্টি হয়ে যেত। কী আর করতাম? ওপরের ভাতের স্তর কিছুটা ফেলে দিয়ে বাকীটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতাম। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ই ছিল না। রাত্রিতে একটা পাতলা ছোট্ট সতরঞ্চ পেতে মাথার উপর পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে শুয়ে পড়তাম। রাত্রিতে হঠাৎ বাতাস উঠলে সেই ধুলো আর শুকনো অশ্বমলের স্তর জমত দেহের উপর। হঠাৎ কোন ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনিতে বা জোরে পা ঠোকার শব্দে ঘুমটা আমার প্রায়ই ভেঙে যেত। সকাল বেলায় ওয়ারলিরা ঘুম থেকে উঠে আমাদের অফিস-ঘর ভালো করে ঝাড়ু দিয়ে, নোংরা-জঞ্জাল পরিষ্কার করে তারপর চলে যেত। কারণ তাদের জায়গায় শীঘ্রই আর এক দল এসে পড়বে কাজ নিয়ে। এই রকমভাবেই চলতে লাগল কিছু দিন ধরে সেই আস্তাবলের মধ্যেই—কারণ অন্যত্র কোথাও আর বিকল্প ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে হল এই ভাবেই।

পুণার চার-তলা বিরাট বাড়িতে তিনতলার এক প্রশস্ত ঝকঝকে আলো-বাতাসযুক্ত শয়ন-কক্ষে দু দুটো পুরু গদি বিছানা শয্যায় আমি ঘুমাতাম। শুয়ে শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত পড়তাম। সেই আমি, সেই দিনগুলোতে আস্তাবলের ভূমি-শয্যায় কেমন আনন্দে কাটিয়ে দিয়েছিলাম সে কথা ভাবতে গেলে কেমন অবাক হয়ে যাই।

আর একটা ব্যাপারেও খুব আশ্চর্য লাগত। কে কি বলবে সে সব মোটেই পরোয়া না করে বাবু টাংগাওয়ালা কেমন করে আমাদের জন্য থাকার জায়গা ছেড়ে দিল! থাকার জন্য আমাদের কাছ থেকে ভাড়া বাবদ কিছুই নিত না, অথচ ঘরের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিচার করে অনায়াসেই সে আমাদের কাছ থেকে বেশ মোটা ভাড়া হাতিয়ে নিতে পারত। কিন্তু তা সে মোটেই করল না। এতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গরিব মানুষের হৃদয় কত বড় হতে পারে। বাবুর টাংগা আস্তাবলের বাইরেই পড়ে থাকত। সারাদিন ধরে সে টাংগা চালাত। রাতে কখন ফিরত আবার সকালে কখন কাজে বেরিয়ে যেত—কিছুই আমরা জানতে পারতাম না। তার স্ত্রী প্রতিবেশীদের নানা কথায় প্রভাবিত হয়ে আমাদের সংগ এড়িয়ে চলত। হয়তো বাবু আমাদের ঘর দিয়েছে, অথচ ভাড়া নিচ্ছে না—এতেই তার

মনোভাবটা আমাদের প্রতি বিরূপ ছিল। আজ সেই বাবু টাঙ্গাওয়ালার অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। সেই ঝোপড়ির জায়গায় আজ সে যথোপযুক্ত বড়োসড়ো বাড়ি বানিয়েছে। যখনই তার সংগে দেখা হয়ে যায় তখনই সেই আস্তাবলের দিনগুলোর কথা মনের পাতায় এসে ভীড় জমায়। আন্দোলনের সময় শত শত ওয়ারলিকে প্রতিদিন গ্রেপ্তার করে বন্দী করে রাখা হত দহানুর জেলখানায়। তাদের খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকারের সংগে বাবুর একটা চুক্তি হয়েছিল। এতেই তার অবস্থার পরিবর্তন হয়, তার আয় বাড়তে থাকে। আজও বাবু বেশ জোরের সংগেই বলে যে আন্দোলনের প্রতাপের জোরেই তার অবস্থান্তর ঘটেছে। আন্দোলনের 'পুণ্য'বলেই তার উন্নতি ঘটেছে। অনেক প্রখ্যাত ভদ্রমহোদয় বিরাট বিরাট ভাষণ দিয়ে থাকেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের অনুপ্রবেশ মোটেই ঘটতে দেওয়া উচিত নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। হয়তো তারা সুবিধা মতোই ভুলে যান এই সব প্রাণখোলা মন্তব্যগুলোর কথা—আন্দোলনের সময় প্রায়ই যা প্রচারিত ছিল। উপরন্তু তারা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার জন্য সাধ্যমতো কোনপ্রকার চেষ্টার ত্রুটি রাখত না। সমস্ত শক্তি, সমস্ত পন্থা তারা কাজে লাগাত। হয়তো তারা কিছুটা সফলও হত, কিন্তু তাতে আমাদের আন্দোলনে তেমন কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সমস্ত বাধা বিপত্তি প্রতিহত করে আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটত, তীব্রতা আরো বেড়ে যেত।

পাতিলের গৃহে

বাবু টাঙ্গাওয়ালার আস্তাবলে আমরা আমাদের অফিসের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলাম ; সংগে সংগে অন্য কোনো সুবিধাজনক ঘরের অনুসন্ধানও চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিছু দিন পর বাবুর আস্তাবলের কাছাকাছি একটা বড় বাড়িতে মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় একটা ছোট্ট ঘর পেয়ে গেলাম। বাড়িটা গ্রামের মোড়লের (পাতিল)। এই নতুন ঘরে আমাদের অফিস অনেকদিন চলেছিল। ১৯৪৬ সালে ২১শে নভেম্বর সরকারী আপদ্‌কালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে আমাদের থানা জেলা থেকে বহিষ্কার করে না দেওয়া পর্যন্ত ঐ ঘর আমাদের দখলে ছিল। ঐ এলাকার সারাক্ষণের কর্মী কমরেড কমা রণদিভের প্রধান কার্যালয় হিসাবে ঘরটা ব্যবহৃত হত। আস্তাবলের থেকে ঘরটা যে খুব উন্নত মানের ছিল তা নয়। কারণ ঘরটা ছিল খুবই সংকীর্ণ-পরিসর, তাছাড়া অন্যান্য অসুবিধাও প্রচুর ছিল। লোকে বলাবলি করত—ঘরটা নাকি ছিল আগেকার দিনের বন্দীশালা। মাঝখানে বর্গক্ষেত্রের মতো কিছুটা ফাঁকা জায়গা ও তার চার পাশ ঘিরে ছোট ছোট অনেক ঘর।

বাড়িটার নির্মাণ-প্রণালী দেখে উক্ত জনশ্রুতি আমরা সত্যি বলেই বিশ্বাস করতাম। সিঁড়িটা এত অন্ধকার যে নিজের নাকের ডগা নিজেই দেখা যেত না। দোতলায় এক কোণের দিকে একটা ছোট্ট কামরা আমরা পেয়েছিলাম। একটা মাত্র জানলা আর একটা দরজা। ওপরতলার অন্যান্য কামরার মতো আমাদেরটাও আট ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া। মেঝেতে টালির পরিবর্তে পেরেক দিয়ে কাঠের তক্তা বিছানো ছিল। হাত-মুখ ধোয়া বা বাসনপত্র ধোয়াধুয়ির জন্য কোন জায়গা ছিল না। ঘরের মধ্যে কোন নালী ছিল না—যেখান দিয়ে জল বেরিয়ে যেতে পারে। নীচের কুঁয়া থেকে জল উপরে তুলে আনতে হত। একটা বড় পাত্রে আমরা হাত-মুখ ধুতাম বা বাসনপত্র মেজে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতাম। তারপর জানলা দিয়ে ঐ ব্যবহৃত জল বাইরে ফেলে দিতাম। রান্না-বান্নার ব্যবস্থা তেমন হতই না, ঘরের মধ্যে শুধু সকাল সন্ধ্যায় চা তৈরী করা হত। বাইরে গিয়ে আমরা খেয়ে আসতাম। পুরো বাড়িটার মধ্যে কোন শৌচাগার ছিল না। সকাল বেলায় অন্যান্য ভাড়াটিয়ারা যখন উনুন জ্বালত, সমস্ত জায়গাটা ধোঁয়ায় ভরে উঠত, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, নাক-চোখ জ্বালা করত আর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত।

এত অসুবিধে অগ্রাহ্য করেও, যদি কেউ এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে, অন্ততঃ এখানে একটু শোয়ার মতো জায়গা মিলবে, তবুও কিন্তু নিস্তার নেই। একটু শান্তিতে ঘুমানোও সম্ভব নয় অসংখ্য ছারপোকার জ্বালায়। একেবারে সৈন্য-বাহিনীর মতো তাদের আক্রমণ কৌশল। মেঝের তক্তার ফাঁকে ফাঁকে তারা তাদের রাজত্ব কায়েম করেছে। সেখানে প্রথম রাত্রির অবস্থান কালে ছারপোকার অভ্যর্থনা যখন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠল, উঠে পড়ে টর্চ জ্বাললাম। দেখি সারা বিছানাটায় অসংখ্য ছারপোকা কিলবিল করছে। যেন অসংখ্য দাগে-ভরা মুখ মণ্ডল। এই দেখে ভয়ে কমরেড কমা ও আমি আর ঘুমানোর কথা ভাবতেই পারলাম না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে আলো জ্বেলে সারা রাত বসে রইলাম। পরের দিন জানতে পারলাম পুরো বাড়িটাতেই ছারপোকার রাজত্ব। অন্যান্য ভাড়াটিয়ারা সকলেই ছারপোকা রাজের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে, তাই তাদের কোন ভয়-ভীতি ছিল না। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম প্রথম নানারকম ওষুধ প্রয়োগ করে তাদের দাপট কমাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শত্রুরা সংখ্যায় এত ভারী যে সহজে তাদের নিশ্চিহ্ন করা মোটেই সম্ভব হল না। ক্রমে ক্রমে আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। মানুষ সত্যিই এক অদ্ভুত স্থিতিস্থাপক প্রাণী। যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীনই সে হোক্ না কেন —

ধীরে ধীরে সে পরিবেশে সংগে মানিয়ে নেবেই। আমাদের পাশের প্রতিবেশীর কামরায় এককোণে ছোট্ট একটা নালি মতো ছিল। সেখানে ধোয়াধুয়ি কাজ চলত। আমিও প্রতিবেশীর অনুমতি নিয়ে সেখানেই স্নান-পর্ব সেরে নিতাম। কিন্তু সবচেয়ে কষ্টকর সমস্যা দেখা দিল শৌচাগারের অসুবিধা নিয়ে। বাড়ির সমস্ত নারী-পুরুষ খুব ভোর বেলায় উঠে বাইরে সমুদ্রের খাঁড়ির কাছে প্রয়োজন মিটিয়ে আসত। আমার সংগী কমরেড রাঁও উক্ত পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু আমার অবস্থা নিতান্তই কাহিল হয়ে পড়ল।

পাতিলের বাড়ির কাছাকাছি দাঁড়েকার নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর বাড়ির অংগণে কাঁচা বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া একটা অস্থায়ী শৌচাগার-ধরনের ব্যবস্থা ছিল। চট দিয়ে ঘিরে আব্রু বজায় রাখা হত। দাঁড়েকারের আত্মীয় এক যুবক মাঝে মাঝে আমাদের এখানে দেখা করতে আসত। কখনো বা মাঝেমধ্যে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনাও করত। আমার শৌচাগারের সমস্যা বুঝতে পেরে সে আমায় বলল, "আপনি দাঁড়েকারের সেই অস্থায়ী শৌচাগার ব্যবহার করতে পারেন"। ছেলেটি আবার আমার প্রাথমিক ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে সংগে নিয়ে সেখানে গেল। সমস্যার সমাধান হল দেখে মন থেকে বিরাট একটা অস্বস্তির বোঝা নেমে গেল। আমাকে এভাবে সাহায্য করার জন্য তাকে আমি বারবার ধন্যবাদ জানাতে লাগলাম। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশিদিন কপালে সইল না। মাত্র ঠিক দুদিন সেই সুযোগ ব্যবহার করতে পেরেছি, তারপরই তৃতীয় দিনে ছেলেটি গভীর নৈরাশ্য নিয়ে এসে হাজির। বলল, "বাড়ির সবলোক আপত্তি করছে ব্যাপারটায়, আমি অসহায়, কি আর করি বলুন, আপনি আর সেখানে যাবেন না।" শ্রেণী-সংঘর্ষ তীব্র হওয়ার সংগে সংগে শোষকশ্রেণী যে কেমন নির্লজ্জভাবে সাধারণ সৌজন্যবোধটুকুও হারিয়ে ফেলে এতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আন্দোলনের ক্রমবিকাশের স্তরে প্রতি পদক্ষেপেই এমন কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হতে লাগল। কিন্তু সেই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য পথ ধরে এগিয়ে চলেছি—কোন বাধা-বিপত্তি, সমস্যার বেড়াজাল আমাদের আটকে রাখতে পারেনি।

সমস্ত কিছু বাধা-বিপত্তির মোকাবিলা করেই আমরা কাজ চালিয়ে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের চলার পথে যে সব বাধার কাঁটা ছড়ানো ছিল, তাতে আমাদের একদিক দিয়ে সুবিধেও হয়েছিল। ভূস্বামীরা যতই আমাদের বিপাকে ফেলতে লাগল, ততই বেশি বেশি করে আদিবাসীরাও আমাদের প্রতি বিশ্বাসের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ থানা জেলা থেকে আমাদের বহিষ্কারের আদেশ ঘোষণা পর্যন্ত, পাতিলের বন্দীশালার ঐ কামরাটি আমরা আমাদের প্রধান কার্যালয় হিসেবেই ব্যবহার করেছিলাম। সাধারণত অফিসের যেমন নানারকম বাধাবন্ধন থাকে, আমাদের তেমন কিছুই ছিল না। অবস্থানের দিক দিয়ে তেমন কোন ভাল জায়গাও ছিল না, প্রধান সড়কের ওপর নয়, গ্রামের এক সুদূরপ্রান্তে তার অবস্থান। আসবাবপত্র বলতে আদৌ তেমন কিছু ছিল না, একটা চেয়ার টেবিল পর্যন্ত নেই, এমনকি বাইরে একটা সাইনবোর্ডও ঝোলানো ছিল না। একই কামরা, রাত্রিতে থাকা-খাওয়ার কক্ষ হিসেবে, আর দিনের বেলায় অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হত। শুধু একটা শতরঞ্চি, আর একটা ছোট্ট বাক্স—এই নিয়ে সংসার আর অফিসও চলত। আমাদের অফিসঘরের এত তুচ্ছাতিতুচ্ছতা সত্ত্বেও, বড় বড় রথীমহারথী ভূস্বামীরাও বাধ্য হত এখানে প্রায়ই পদার্পণ করতে। ওয়ার্লিরাই বুক ফুলিয়ে গর্বভরে বলত, "আন্দোলনের সময় আমাদের দিয়ে ঘাসকাটাই-এর কাজ করাতে হলে যাও, আগে সেই লাল-ঝাণ্ডার অফিস থেকে অনুমতি-পত্র নিয়ে এস"। আর এই শুনে অসহায়ভাবে তারা ছুটে আসত। এই ছোট্ট সাধারণ ঘরটা হাজার হাজার আদিবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা আর সাহস-ভরসার প্রতীক-স্তম্ভ হয়ে উঠল। সাধারণ লোকের চোখেও এর গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে গেল, কারণ সরকারী গুপ্তচর বিভাগের টিকটিকিদের অনেকেই অফিসের চারদিকে দিনরাত ঘুর ঘুর করতে লাগল। শহর থেকে অনেক দূরে পুরানো বন্দীশালার ছোট্ট এক কোণের দিকে একটা প্রায়ান্ধকার ছোট্ট ঘর জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে হাজার হাজার মানুষের কাজকর্মের মধ্যে দিনরাত গমগম করত। এই সেই অফিস যেখান থেকে আমরা বন-বাদাড়ে গাছ-কাটার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে 'গাছ-কাটাই' শ্রমিকদের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলাম! আদিবাসীরা জমিদারদের প্রায়ই বলত "মোরগের চিৎকারকে রুদ্ধ করে সূর্য-ওঠা বন্ধ করার প্রচেষ্টা মূর্খতার নামান্তর ছাড়া আর কিছু নয়"।

ভূস্বামীদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত কোন ফল হল না। অত্যন্ত ক্ষতিকর বেগারী প্রথা বন্ধ হয়ে গেল। ঋণবন্ধ-ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেল। জমিদারের ক্ষেতে কাজ করার জন্য মজুরি দেওয়া শুরু হল। ঘাস-কাটাই ও জঙ্গল-কাটাই-এর মজুরিও বাড়াতে হল। জমিদার-প্রাপ্য ফসলের অংশ বা "খন্দ" (khand) খাজনা বে-আইনী বলে ঘোষণা হল। সাধারণ খাজনার (revenue) পাঁচগুণ নগদ মূল্য খন্দের জন্য নির্দিষ্ট হল। সমস্ত জমির মূল্যমান নির্ধারণ করা হল। আইন করা হল—জমির মূল্য কোন প্রজা

বারটা কিস্তিতে দিয়ে দিতে পারলেই তাকে আইনানুগভাবে মালিক গণ্য করা হবে। এইসব সুযোগ সুবিধার ফলভোগী হওয়ার পথে দাবি আদায়ের জন্য অনেক বাধা, অনেক আঘাত-যন্ত্রণা আদিবাসীদের সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আদিবাসীদেরই জয় হল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেগার-প্রথা খতম করো

টিটোয়ালায় মহারাষ্ট্র কিসান-সভা সম্মেলনে কমরেড গোবিন্দ দেবদেকর ও প'চিশ-তিরিশ জন আদিবাসী যোগদান করেছিল। সারা জীবন ধরে সমাজের উপরতলার মানুষের কাছ থেকে এই আদিবাসীরা শুধু ভয়, অসম্মান আর অবহেলাই পেয়ে এসেছে। টিটোয়ালা সম্মেলনে আমাদের কাছ থেকে তারা যে ভাবে সৌভ্রাতৃত্বমূলক উষ্ণ-অভ্যর্থনা পেল তাতে বিস্মিত হয়ে গেল, তাদের হৃদয় গভীরভাবে আলোড়িত হল। জীবনে তাদের এ এক নতুনতর অভিজ্ঞতা। তাদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ জেগে উঠল।

প্রায় দশ হাজার কৃষক ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। কৃষকদের এত বড় সমাবেশ তারা কখনো দেখেনি। সেই জনসমুদ্র তাদের মধ্যে যাদুদণ্ডের মতো কাজ করল। ঐক্যের মধ্য দিয়ে কী বিরাট শক্তি জন্মলাভ করতে পারে, তা তারা এই প্রথম অনুধাবন করতে পারল। শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের সামনে কথা বলতে সাধারণত তারা লজ্জাবোধ করত। এ ব্যাপারে তারা খুবই রক্ষণশীল। কিন্তু কৃষকদের সেই বিশাল সমাবেশ এবং সম্মেলনের পরিবেশ দেখে তারা এমনই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল যে, যখন সভায় "বেগারী খতম করো" এর প্রস্তাব উঠল এবং তার উপর ভাষণ শেষ হল, তা শুনে আদিবাসীদের মধ্যে একজন আপনা থেকেই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আমিও কিছু বলতে চাই"। বেগার-প্রথার যাঁতাকলে ওয়ারলিরা যে কী ভাবে পিষ্ট হচ্ছে সে বিষয়ে বেশ জোরালো বক্তব্য রাখল সে। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ দৃঢ়তার সংগেই বলতে আরম্ভ করল। যুগযুগ ধরে নিপীড়নের জগদ্দল পাথরের তলায় তাদের চিন্তা ভাবনা এতদিন চাপা পড়েছিল, অবশেষে তারা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেলো। সে ভাষণ ছিল বেশ সাবলীল, ফলপ্রসূ ও বাঙ্ময়। সে বলে চলল, কীভাবে ঠিক বর্ষারম্ভের আগেই নিজেদের জমি-জমা ফেলে রেখে আগেই ভূস্বামীদের জমি চষতে হয়। জমিদার মহাজনের জমিতে কাজ করতে অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই উঠত না, কারণ জোর-জবরদস্তি করে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। জমিদারদের

জমিতেই প্রথমে বীজ-বপনের কাজ ও অন্যান্য কাজ করতে হয়, তারপর নিজেদের চাষবাস। সুতরাং প্রথমেই তাদের জমিতে লাঙল দিতে হত, জমি চষতে হত, আর ওদিকে নিজেদের জমিগুলো ঠিক চাষের সময়েই অবহেলায় পড়ে থাকত। তাই ফসল যখন ফলত আবাদের কাজ পিছিয়ে পড়ার জন্য জমিদারদের ফলনের থেকেও কৃষকদের ফলন সব সময় খুব খারাপ হত। এইভাবে ফসল কম হওয়ার পরও ঐ সব ভূস্বামীরাই উলটে আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে আদিবাসীদের বলতেন, "দ্যাখ্ ব্যাটা দ্যাখ! আমার ক্ষেতে কেমন সুন্দর ফসল হয়েছে, আর তোদের? কিছু হয়নি। এত খারাপ হচ্ছে কেন তোদের? কেন জানিস্? তোরা যে সব জন্ম-কুঁড়ের দল! তোরা তোদের জমিতেও ঠিকমতো মেহনত করিস না"।

আদিবাসীটি আরও বলতে লাগল, "এমন কি আমাদের গরুর-গাড়ি-গুলোও বিনা-পয়সায় তারা ব্যবহার করে। একজনকে হয়তো জংগলে কাজ করতে পাঠিয়ে দিল, আরেকজনকে বাড়ির কাজে, তৃতীয় জনকে বাইরে অন্যত্র কোন কাজে—এইভাবে পরিবারের প্রতিটি লোকের কাছ থেকেই বেগার আদায় করে নেয়, তাদের শেষ রক্ত-বিন্দু নিঙড়ে নিয়ে……। কিন্তু এরপর থেকে ওয়ারলিরা আর ভেটির (বেগার) কাজ করবে না, অত্যাচার-নিপীড়ন আর বরদাস্ত করবে না"।

সে সময়ে, আমরা অবশ্য ঠিক মতো পরিমাপ করে উঠতে পারিনি টিটোয়ালা সম্মেলন আদিবাসীদের মধ্যে কতটুকু প্রভাব-ফেলতে পেরেছে—অথবা কতখানি গভীরে সেই প্রভাব অনুপ্রবেশ করেছে।

শুধু দেখলাম—সম্মেলন শেষে বাড়ি ফেরার সময় আদিবাসীরা চুপচাপ কয়েকটি লাল ঝাণ্ডা সংগে নিয়ে ফিরে গেল।

লাল ঝাণ্ডাকে তারা নিজেদের আপন বন্ধু আর পথ-প্রদর্শক বলে মনে করতে লাগল। যারা এসেছিল সম্মেলনে, আসার সময় ছিল এক মানুষ, আর ফেরার সময় আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। রূপান্তরিত হলো ভিন্ন ধাতের মানুষে। ভয়ভীতি ছেড়ে তারা নির্ভীক হয়ে উঠল। দৈনন্দিন—নিয়মিত কাজ-কর্মের দায়দায়িত্ব অন্যদের উপর সমর্পণ করে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই তারা লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল সম্মেলনের গৃহীত স্লোগান আর প্রচার করতে লাগল টিটোয়ালা সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য। ওয়ারলিদের মধ্যে নব-চেতনার সঞ্চার হল। বন-প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল নব-জীবনের আনন্দময় সেই ঘোষণা-বাণী—"বেগার-প্রথা খতম করো"।

সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাব যে কাগজ-পত্রেই সীমিত থাকবে কিংবা অ যে শুধু একটা সদিচ্ছা বা সদমনোভাব-জ্ঞাপক প্রস্তাব হিসেবেই থেকে যাবে— এ কথা ওয়ারলিরা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও মনের মধ্যে স্থান দেয়নি।

এই প্রস্তাব ছিল তাদের কাছে এক পবিত্র শপথ বাণী। যে কোন মূল্যেই হোক, তাকে সফল করে তুলতেই হবে—আর সেই ব্রত উদ্‌যাপনে তারা বদ্ধ-পরিকর হয়ে উঠল। আসলে এই ভেট্‌বিগার [Vethbigar] বা বেগার জিনিসটা কি? এটা হচ্ছে শোষণের এক উচ্চমানের সুসংগঠিত কৌশল। এই কৌশলের জালে আবদ্ধ হয়ে ওয়ারলি-প্রজারা ভূস্বামীদের স্বার্থপুষ্ট করার জন্য দৈহিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হত। অথচ প্রতিদানে একটি কানাকড়িও প্রত্যাশা করতে পারতো না। শ্রমের বিনিময়ে পেত শুধু কয়েকমুঠো নিম্নমানের চাল। সব সময়েই জমিদার প্রভুদের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হয়। নিজের কাজের জন্য প্রভুরা যে-কোন ঋতুতে, দিনের যে-কোন সময়ে ডেকে পাঠাতে পারে। যদি কোন প্রতিবাদ ওঠে বা কাজে যেতে টালবাহানা করে, তাহলে জমিদার বা তার দালালরা লাঠি-সোটা বা চাবুক দিয়ে মারপিট শুরু করে দেয়, এমন কি খুন-খারাপি করতেও মোটেই পিছপাও হয় না।

ভূমি-প্রজা হিসেবে কৃষককে যে জমি ভূস্বামী দেয়, সেই জমির জমিদার-প্রাপ্য অংশ বা খন্দ [Khand] খাজনা দাবি করে জমিদাররা কৃষকের উৎপন্ন ফসল থেকে। সঠিক প্রাপ্যাংশ থেকে আরও বেশী পাওয়ার লোভে ভূস্বামীরা হেঁচে শুরু করে দিয়ে ভুল বা মিথ্যা পরিমাপেরও আশ্রয় নেয়। এইভাবে যে ফসলের ভাগ ভূস্বামীরা কুক্ষিগত করে, সেই ফসল-ফলানোর জন্য চাষের কাজে একটা ফুটো পয়সাও তাদের খরচ করতে হয় না। 'খন্দ' যে শুধু ধান নিয়েই শেষ হত তা নয়, ধান ছাড়াও অড়হর, উরদ (urad), সীম প্রভৃতি অন্যান্য রবি-ফসল চাষ করলে তার থেকেও অংশ নিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই। যদি এই সব ফসলের ভাগ দিতে কোন কৃষক নিমরাজী হত, তাহলে তার কাছ থেকে আরও বেশী পরিমাণ ধান আদায় করা হত। মহারাজ বলতেন, "তোরা রবি-ফসলের ভাগ যখন দিতে অনিচ্ছুক, তখন বেশী বেশী করে ধান দিয়ে তা শোধ করতে হবে"। এই বাণী দিয়ে জোর করে 'খন্দে'রও বেশী ধান উঠিয়ে নিত। ওয়ারলিরা নিজের ক্ষেতে লাউ, কুমড়ো, শশা, ফুটি, তরমুজ প্রভৃতি চাষ করলে, তার ভাগও জমিদারের সেবার জন্য দিতে হত। শাক, সবজি, লংকা, বেগুন, ভেণ্ডি—সব কিছুই তাদের ভোগে লাগত। আর কোন ওয়ারলি যদি মুরগী চাষ করে থাকে, তাহলে তার মুরগী বা ডিম তো

মুসলমান ও পার্সি জমিদাররা ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যেত। বর্ষাকালে কর্তোলা (Kariola) বা কিকোড়া নামের এক ধরনের শাক্-পাতা খুঁজে আনতে পাঠানো হত ওয়ারলিদের। এটা জমিদারদের খুব মুখরোচক জিনিস। বনবাদাড়ে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে খুঁজে বেড়াত ওয়ারলিরা। কারণ, সন্ধান করে নিয়ে আসতে না পারলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে 'খন্দের' পরিমাণ আরও বেড়ে যেত। তার অর্থ আরও বেশী বেশী ধান জমিদারের গোলায় তুলে দিয়ে আসা।

জমিদার বাবুর ঘর-বাড়ি যখন ছাইতে হত, ডাক পড়ত ওয়ারলিদের। খবর পাওয়ার সংগে সংগে একটুও দেরি না করে ছুটে আসতে হত, আর বিনা পারিশ্রমিকে ঘর ছেয়ে দিয়ে আসতে হত। বাড়িতে জ্বালানি কাঠ অভাব পড়লে তক্ষুনি কাঠ চিরে টুকরো করে, বোঝা বেঁধে গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে বাবুদের বাড়িতে বেশ ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে আসার দায়-দায়িত্বও তাদের। গাড়িও মুফত। আর মেহনতও মুফত। এমনকি ছোটখাট কাজ, যেমন খাওয়ার জন্য পাতা সেলাই করে থালা তৈরি করা, পাতা সংগ্রহ করে এনে তৈরি করে এক জায়গায় বেঁধে হাজির করা অথবা বিড়ির জন্য আপ্তা (apta) সংগ্রহ করা—এও সেই ওয়ারলিদেরই কাজ। দাঁত মাজার জন্য দাঁতন কেটে এনে ভাল করে ছিলে-ছুলে পরিস্কার করে তাড়া বেঁধে বাবুদের বাড়িতে বাবুদের ব্যবহারের জন্য পেঁছে দিতে হবে। এই সব না করলে, হয় খাজনা বেড়ে যেত অথবা মারধোর খেতে হত।

শুধু মাত্র এই কাজের জন্যই যে ভেটির (Vethi) কাজ বা বেগার দিতে হত তা কিন্তু নয়, জমিদারের ক্ষেতের সমস্ত কাজ—বীজ বোনার জন্য জমি তৈরি করা, লাঙল করা, ধান রোয়া, নিড়ান দেওয়া, ধান কেটে ঝাড়াই-মাড়াই করা ইত্যাদি নিজের জমির কাজ ফেলে রেখে আগেভাগেই করে দিয়ে আসতে হত। এইভাবে জমি-চষা থেকে শুরু করে শস্যাগার পূর্ণ করা পর্যন্ত পুরো কাজই ওয়ারলিদের বিনা-মজুরিতেই করতে হত।

জমিদারদের দুটো করে থাকার জায়গা থাকতো। যে সব ওয়ারলিরা তাদের গরু-ছাগল-মুরগী পুষতো, তাদের দশ-বার মাইল বা তারও বেশী পথ পায়ে হেঁটে গিয়ে বাবুদের বাড়িতে প্রতিদিন দুধ, ডিম ও শাক্-সবজি পেঁছে দিয়ে আসতে হত। অবিশ্বাস্য ধরনের ভারী ভারী বোঝা ওয়ারলিদের পিঠে চাপিয়ে বেগার খাটিয়ে দশ-পনের মাইল দূরে পাঠিয়ে দিত। কারণ শত হলেও তারা তো ক্রীতদাস। ওয়ারলিরা আমাকে প্রায়ই বলত, তাদের পিঠের বোঝা এত ভারী হত যে, দরকারে শরীরের কোন জায়গা একটু চুলকে নেবে তারও উপায় থাকত না। তাদের পিঠ ও হাত-পা যন্ত্রণায় টানটান হয়ে যেত।

নিজেদের প্রয়োজনীয় সব কাজ জোরজুলুম করে বিনা পয়সায় আদিবাসীদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও, ভূস্বামীদের সন্তুষ্টি ছিল না। তারা ওয়ারলিদের নিরক্ষরতা ও অসহায়তার নিষ্ঠুর সুযোগ নিয়ে তাদের বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ বেগার প্রথার সাহায্যেই তৈরি করিয়ে নিত।

বংকাস ও কোচাই-এর শেঠবাহাদুরদের বাংলো পর্যন্ত যাতায়াতের নিজস্ব সড়কগুলো আদিবাসীদের বেগার শ্রমেই তৈরী করা হয়েছিল। কোচাই নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু; কাওয়াড হ্রদের বাঁধ—সমস্তই ওয়ারলিদের বেগার শ্রমে নির্মিত। একটা দুটো নয়, পরন্তু হাজার রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে ভূস্বামীরা যে মহাত্মার মতো জীবন উপভোগ করত, সে সমস্তই তাদের শোষিত প্রজাদের কঠোর পরিশ্রম মাধ্যমেই। বিপুল-বিত্তের হৈমপীঠে তাদের অভিষেক, বিশাল বাংলোয় তাদের অধিষ্ঠান—যার যাতায়াতের সড়কগুলিও সুনির্মিত ওয়ারলিদের দ্বারা। এমন কোন কাজ বাকী ছিল না, যা তারা মুফতে ওয়ারলিদের দিয়ে করিয়ে না নিত। যত হলেও ওয়ারলিরা তো 'ভেটিয়া' বা ক্রীতদাস। ঐ নামেই তাদের সব সময় সম্বোধন করা হত। "ভেটিয়াকে গিয়ে বলো" বা "ভেটিয়ার বেমার হয়েছে"—এই সব উক্তি বহুশ্রুতির পর্যায়েই পড়ে। যদি কোনদিন এই গোলামরা কাজ করতে বিন্দুমাত্র টালবাহানাও করতো তাহলে চাবুক সব সময় উঁচিয়ে রাখা হত তাদের দাসত্বের শৃংখলের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। এইভাবে ভূস্বামীরা বর্বর লোভের থাবায় ক্ষতবিক্ষত ও টুকরো টুকরো করে ওয়ারলিদের প্রতিটি রক্তবিন্দু শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দিত, তাদের রক্তহীন প্রাণ যেন সাদা খোলসের মতো পড়ে থাকত।

যে মুহূর্তে ওয়ারলিরা সিদ্ধান্ত করল যে, আর তারা ভেটিয়ার কাজ করবে না, তক্ষুনি সংগে সংগে জমিদার পুঙ্গবরা তাদের হাতিয়ারে শান দিতে আরম্ভ করল। জমিদার তরফের এই নতুন হিংস্র থাবার মুখোমুখি হয়ে তার মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত ওয়ারলিদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হল। এই লক্ষ্য সামনে রেখে, ১৯৪৫ সালের ২৩শে মে উম্বরগাঁও তালুকের জারীতে একটা কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে যোগদানকারী পাঁচ হাজার ওয়ারলির মধ্যে মেয়েরাই ছিল সংখ্যায় পাঁচ শ। সম্মেলন সফল করার জন্য সম্মেলনের আগের দিনগুলোতে কমরেড দলভি ও আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি; সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কৃষকদের পুরোপুরি ওয়াকিবহাল করার জন্য এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করা ও আমাদের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা ভালবাসা জাগিয়ে তোলার জন্যই আমরা গ্রাম-গ্রামান্তর পরিক্রমা করেছি।

এই সম্মেলনে কমরেড পারুলেকর সরল অনাড়ম্বর ভাষায় তার বক্তব্য রাখলেন। শ্রোতাদের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী প্রভাব পড়ল। এমনই তার প্রখর ব্যক্তিত্ব যে, যে মুহূর্তে আন্তরিকতা ভরা গম্ভীর কণ্ঠে তিনি ভাষণ শুরু করলেন, সমস্ত সভাস্থল যেন বিদ্যুৎ-চমকিত হয়ে উঠল, প্রতিটি শ্রোতা মোহিত হয়ে গেল। প্রচণ্ড উদ্দীপনা নিয়ে গ্রামে ফিরে চলল কৃষকরা, কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল "ভেটবিগারকে কবর দাও, ভেটি প্রথা ধ্বংস হোক।" সভা সমাপ্তির পরেও অনেকক্ষণ যাবৎ অনেকেই কমরেড পারুলেকরকে ঘিরে রইল।

এই সম্মেলনের পর থেকেই ওয়ারলিরা বেগারীর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করেছিল। আন্দোলনে সামিল হতে যারা অসম্মতি জানাল, তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হল। যারা প্রথম প্রথম ভয় পেয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। প্রতিরোধ আন্দোলনের শক্তি ও তীব্রতায় এমন অগ্রগতি ঘটল যে মাত্র তিন সপ্তাহের সময়সীমার মধ্যেই শত শত বছরের পুরাতন বেগার-প্রথা বর্তমান থেকে বিদায় নিয়ে অতীত ইতিহাসের পাতায় চলে গেল।

ওয়ারলিরা "বেগার না দেওয়ার" প্রচার করার সংগে সংগে জমিদাররাও তাদের "খাওটি" (Khawti) না দেওয়ার পালটা প্রচার শুরু করে দিল। জমিদারকে বেশি বেশি 'খন্দ' খাজনা দিয়ে দেওয়ার পর ওয়ারলিদের কাছে যেটুকু খাদ্যশস্য অবশিষ্ট থাকত, সেটুকু দিয়ে বড়জোর "হোলি" পর্যন্ত টেনে টুনে চালাতে পারত। তারপর শুধু টিকে থাকার জন্যই নয়, পরবর্তী ফসল না ওঠা পর্যন্ত কৃষিকর্মের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যও তাদের বাধ্য হয়েই জমিদারদের কাছ থেকে বীজধান ধার করতে হত। এভাবে ধান ধার করাকে বলে "খাওটি"। ফসল ওঠার পরই এই "খাওটি" চড়া হারে সুদ—ধানসহ ফেরত দিতে হত। এই সুদের হার পঞ্চাশ শতাংশ থেকে দু'শ শতাংশ পর্যন্ত চালু ছিল। কোন কোন জমিদার-মহাজন এক বস্তা ধানের পরিবর্তে ছ' মাসের মধ্যে তিন বস্তা ধান ফেরৎ নিত—এমন ঘটনাও শুনেছি। এটাকে কি সুদ বলা যায়, না বলতে হয় এক ধরনের লুটপাট? অন্যায়ভাবে এই লুটের বাহারকে অন্তত ব্যাজ বলা যায় না। জমিদার যদি 'খাওটি' দিতে অস্বীকার করে, ওয়ারলিদের কাছে তার অর্থ দাঁড়ায় এক ধরনের মৃত্যুদণ্ড—অর্থাৎ অনশনক্লিষ্ট হয়ে মৃত্যুপথ যাত্রা।

জারী সম্মেলনের পর, 'খাওটি দেব না'—জমিদারের এ ধমকানি ওয়ারলিদের মধ্যে আর তেমন কোন ভীতির সঞ্চার করতে পারল না। গাছ, পাতা, কন্দমূল খেয়েও থাকব, না হয় অনশনে কাটাবো, তবুও বেগার খাটতে

আর যাবো না, কোন রকম আত্মসমর্পণ করবো না—এমনি ছিল তাদের বিদ্রোহী মনোভাবের চড়া সুর। তাদের নিরন্তর প্রত্যাখ্যান চলতেই লাগল, ভূস্বামীদের ধমক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ওয়ারলিদের শ্রম ছাড়া তাদের জমিতে যে চাষই হবে না ; আর 'খাওটি' দেওয়া বন্ধ করে দিলে অমন যে চড়া হারের ব্যাজ, তাও যে মাঠে মারা যায়। তাই তাদের ধমকের বেলুন চুপসে গেল ধীরে ধীরে।

ওয়ারলিদের মধ্যে যারা "বেগার প্রথা খতম কর" আন্দোলনের বিরোধিতা করে, তাদের বিরুদ্ধে 'সামাজিক বয়কট'-এর কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যাদের এইভাবে 'বয়কট' করার দরকার পড়ত, তাদের বাড়িতে একটা করে হাড় ঝুলিয়ে রেখে আসা হত। যার বাড়িতে হাড় ঝুলবে—তার সমস্ত পরিবারটাই 'একঘরে' হয়ে থাকবে। সামাজিক বহিষ্কারের ঐটিই প্রতীক। তার অর্থ—সেই পরিবারের সংগে শুধু যে কোন রকম লেনদেনের সম্পর্ক থাকবে না, তাই নয়, গ্রামের অন্যান্যরা তার বাড়িতে একবিন্দু জলগ্রহণও করবে না। এমনি ছিল কঠোর বিধান। আমরা এই ব্যবস্থাকে কিছুটা প্রতিহত করলাম। কিছুদিনের জন্য কারুর সংগে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করা এক জিনিস, কিন্তু চিরদিনের জন্য কাউকে পুরোপুরি সমাজ থেকে বহিষ্কার করা অন্য ব্যাপার। খুব কঠোর শাস্তি হয় তাতে। ওয়ারলিদের সকলেরই সাংস্কৃতিক চেতনার মান খুব নীচু। বহিষ্কারের থেকেও, তাদের বুঝিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বলাটাই বরং কাজের কাজ হবে—এ ব্যাপারটাই তাদের বুঝিয়ে বললাম।

মে মাসে জারী সম্মেলনের পরই যখন চাষের সময় এল, আদিবাসীরা সবাই একবাক্যে "ভেটি"র কাজ করতে অস্বীকার করল। তখন মজুরি না দেওয়া ছাড়া জমিদারদের কাছে আর কোন গত্যন্তর রইল না—মজুরি দিতে তারা বাধ্য হল।

উম্বরগাঁও তালুকে আমাদের আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সেখানেই আমাদের সংগঠন বেশ মজবুত করে গড়ে তোলা, এবং তারপর দহানু তালুকে আন্দোলনের প্রসার ঘটানো। কিন্তু আদিবাসীদের নিজস্ব ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল। জারী সম্মেলনের সংবাদ শুনে দহানুর কিছু অধিবাসী নিছক কৌতূহলের বশে লালঝাণ্ডার সভায় কেমন জমায়েত হয়, কী বলে তারা, তাই শোনার জন্য সম্মেলনে এসেছিল। লাল ঝাণ্ডা যে জমিদারদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, এ বিশ্বাস তাদের ছিল। বেগারির বিরুদ্ধে উম্বরগাঁওতে ঐক্যবদ্ধ সফল সংগ্রামের সংবাদ শুনে তারাও অধৈর্য হয়ে পড়ল, উদ্দীপিত হয়ে উঠল। কোন আহ্বানের অপেক্ষা না রেখেই তারাও তাদের আন্দোলন শুরু করে দিল। লাল ঝাণ্ডা

ওড়াতে ওড়াতে গ্রাম গ্রামান্তরে তারা ঘুরতে লাগল। বৈঠক ও সভা করতে লাগল—সভায় হাজার, দু হাজার লোক জমতে লাগল। জারী সম্মেলনে তারা যা শুনে এসেছিল, তাই মূলধন করে তারা বক্তব্য রাখতে লাগল। আর কিছু তাদের বলার মতো জানা ছিল না। সেখানের কিসানরা অত্যাচার, নিপীড়ন, বেগার জোর-জুলুম প্রভৃতির জগদ্দল পাথর সমূলে উৎপাটিত করে দূরে নিক্ষেপ করার জন্য এমনই উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিল যে, এইসব সভায় জমায়েতের সংখ্যা আট-দশ হাজারকেও ছাপিয়ে গেল। প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেল সাধারণ আদিবাসীদের মধ্যে। আরও বক্তার প্রয়োজন অনুভব করল ওয়ারলিরা। কল্যাণে আমার কাছে খবর আসতে লাগল ওখানে তাড়াতাড়ি গিয়ে সভা-ভাষণ প্রভৃতি পরিচালনার জন্য। [আমি ঐ সময় কল্যাণেই থাকতাম] "......তারিখে সভা আছে, লাল ঝাণ্ডা আপনাকে ওখানে গিয়ে ভাষণ দেওয়ার জন্য নির্দেশ জানাচ্ছে" ইত্যাদি বার্তা ঘন ঘন আসতে লাগল। অনেক সময় যথাসময়ে সংবাদ এসে পেঁছাত না, ফলে আমিও ঠিক ঠিক হাজির হতে পারতাম না। তবুও কিন্তু তাতে আন্দোলনের গতি প্রতিহত না হয়ে আরও জোর কদমে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, সঠিক পথে। এইসব সভাকে উদ্দেশ্য করে ১৯৪৫ সালে ২২শে অক্টোবর তারিখে "বোম্বাই ক্রনিক্‌ল" পত্রিকায় নিম্নলিখিত সমাচার প্রকাশিত হয়েছিল ঃ—

"যে সব আদিবাসীরা কাল পর্যন্তও সহজবশ্য, স্বভাবভীরু, দারিদ্র্য জর্জরিত ছিল, আজ তারা সবাই হঠাৎ শ্রেণী-সচেতন হয়ে উঠছে এবং লাল ঝাণ্ডার তলায় ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সারা তালুকের বিভিন্ন জায়গায় জনসভা হচ্ছে। মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে মানুষ জনসভাগুলোতে যোগদান করছে। হাতে থাকে লাঠি। অভূতপূর্ব সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রচণ্ড জোয়ার।"

কমরেড দলভি যখন দহানুতে হাজির হল, তখন প্রায় পনের থেকে কুড়ি হাজার আদিবাসী নরপাদ (Narpad)এর বেলাভূমিতে ক্ষেতের কাজে মজুরি নির্ধারণের উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হয়েছে। "বেগার দোব না, কাজের জন্য মজুরি দিতেই হবে"—এই দাবিতে তারা কৃতসংকল্প। কমরেড দলভি তাদের কশবাড়ের (Kasbar) পাহাড়ী-উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে হাজির করল। আজ সেখানে "কৃষি-মহাবিদ্যালয়" স্থাপিত হয়েছে। তারপর কমরেড দলভি তাদের কয়েকজন প্রতিনিধির সংগে যুক্তি-সংগত মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাল। তারপর সবাইকে শান্তিপূর্ণ-ভাবে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করল।

হাজার হাজার আদিবাসী হাতে লাঠি-সোটা নিয়ে, বেশ সুসংগঠিতভাবে

নরপাদ থেকে দহানু হয়ে কশবাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে দলবদ্ধভাবে—এই দৃশ্য দেখে ভূস্বামীরা নিজেদের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল তারা। সেই সুসংবদ্ধ পথ-দৃশ্য তাদের মনের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করল, খুব ঘাবড়ে গেল তারা। এই ভূস্বামীরা এতদিন ওয়ারলিদের লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করতেই অভ্যস্ত ছিল। এতদিনের সেই শোষণের শিকারগুলোকেই আজ লাঠি-হাতে অভিযান করতে দেখে ভূস্বামীদের মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শৈত্য-প্রবাহ বয়ে গেল। সারা দেহ দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। কিন্তু কোন আদিবাসীই লাঠির অপপ্রয়োগ করল না। বেশ ভাব-গম্ভীর ও শান্তিপূর্ণভাবে সারিবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলার সংগে গ্রামের উপর দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। কোন কোন জমিদারের মুখ দিয়ে বিস্ময়ের ঠেলায় ফস্কে বেরিয়েই গেল, "বাপ্‌রে বাপ্, এত লোক? যে কোন সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে! সত্যিই ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু কৈ? কোন দুর্ঘটনা তো কিছুই ঘটল না? এই কমিউনিস্টগুলো সত্যিই কেমন শৃঙ্খলা শেখাতে পারে, এদের অনুশাসন বাস্তবিকই বেশ দৃঢ়মূল"। অত্যাচারীদের নাকের ডগা দিয়েই আদিবাসীরা চলে গেল, কিন্তু কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করল না। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এটা, বিশেষ করে আমাদের বিরুদ্ধে যারা "হিংসার উদ্‌গাতা" বলে অভিযোগ আনে—তাদের এটা সবিশেষ অনুধাবন করা উচিত।

আদিবাসীদের লক্ষ্য ছিল যতদূর সম্ভব শক্তিশালী ও বিরাট করে ঐক্যের মাধ্যমে সংগঠন গড়ে তোলা। কারণ অভিজ্ঞতা তাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, একতা যত বিশাল ও যত অটুট হবে, তার শক্তিও ততই বৃদ্ধি পাবে। কোন্ জনসভা কত বিশাল হয়েছে, কত লোকের জমায়েত হয়েছে—তা পরিমাপ করার জন্য কোন পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিতির প্রমাণ স্বরূপ, প্রত্যেককেই একটা করে পাথরের টুকরো এনে জমা করতে বলা হত। মোটা-মুটি ঐ পাথরের স্তূপ যত বড় হবে, সভার সাফল্যও ততই বৃদ্ধি পাবে—এই ছিল তাদের সাদামাটা হিসাব। দহানুতে গিয়ে এমন অনেক প্রস্তর-স্তূপের নমুনা আমি দেখেছি। বিশাল বিশাল জনসমাবেশের সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাকে তারা দেখিয়েছে।

যেমন কোন যন্ত্রদানব সামান্য একটি 'সুইচে'র স্পর্শে গতিময় হয়ে ওঠে, তার প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগে প্রাণ স্পন্দন সঞ্চারিত হয়, ঠিক তেমনি লাল ঝাণ্ডার সক্রিয় সহায়তায় 'কৃষক-আন্দোলন'ও সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, দিন যত যেতে লাগল তার গতিবেগও ততই তীব্রতর হতে লাগল। ভূস্বামী-সৃষ্ট সমস্ত প্রতি-রোধের পাহাড় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আদিবাসী সংগঠনের এতখানি

শক্তি অবশ্য আমাদের প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না। তাদের ঐক্যবদ্ধ, গতিশীল ও প্রচণ্ড উদ্দীপনার কথা—আমরা পূর্বাহ্নে অনুমান করতে পারিনি। আদিবাসীদের অকল্পনীয় ঐক্যবোধ, তাদের দৃঢ় সংকল্প, এমন কি প্রয়োজনক্ষেত্রে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করার দৃঢ়মূল নিষ্ঠার বলেই যুগযুগান্ত প্রবহমান বেগার-প্রথা সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেল, আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে এই প্রথার যা কিছু কুফল—যেমন দৈনন্দিন প্রহার, দমন-পীড়ন ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হয়ে গেল। আদিবাসীদের এই নব-আবিষ্কৃত আস্থা-বোধ, তাদের শক্তি-সাম্য এমনই তুঙ্গে উঠেছিল যে তাদের দিকে একটা আঙুল পর্যন্ত তুলতেও কেউ সাহস করত না। এইভাবেই আদিবাসীরা তাদের প্রথম বিজয়-সাফল্য অর্জন করল।

সপ্তম অধ্যায়

ঋণবদ্ধ দাসদের (বিবাহিত) মুক্তি-সংগ্রাম

বহু শতাব্দী ধরে এই সব এলাকায় 'বিবাহিত দাস' [Debt-marriage Slave] প্রথা প্রচলিত ছিল। বাস্তবে এরা ছিল ঋণগ্রস্ত দাস। বিবাহের সময় আদিবাসীরা মালিকের কাছ থেকে ঋণ নিত। পরিবর্তে মহাজন-মালিকের বাড়িতে তাকে দাস-বৃত্তি করে ঋণ শোধ করতে হত। এই জন্যই এই নিয়মকে বলা হত বিবাহিত-দাস-প্রথা। থানা-গেজেটিয়ারের প্রথম খণ্ডে ১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠায় এই প্রথার বিশেষ বর্ণনার সন্ধান মেলে :

"মারাঠা শাসনকালে আদিবাসীদের অনেক উপজাতিই ছিল গ্রামের অভিজাত উচ্চ-বর্গীয় মহাপ্রভুদের কেনা গোলাম। ইংরেজ শাসনের পর 'গোলাম' শব্দটা নামে অন্তর্হিত হল শুধু, কিন্তু বাস্তবে, স্থায়ী জংগল-উপজাতির মধ্যে গোলামি কায়েম হয়ে বসে রইল। গোলামরা তথাকথিত নামমাত্র স্বাধীনতা পেল বটে—কিন্তু তার ফলস্বরূপ তারা নতুন এবং আরও কঠিনতর মালিকের যাঁতাকলে আটকে পড়ল। পূর্বে তাদের বিয়ের খরচা মালিকরাই দিয়ে দিত। কিন্তু এখন তাদের নিজেদেরই মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। তাদের অনেকেরই প্রয়োজন মেটাতে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকাও খরচ করার মতো সামর্থ ছিল না, তাই অধিকাংশকেই কোন না কোন মালিকের কাছে বছরভোর কাজ করে দেওয়ার চুক্তিতে টাকা ধার নিতে হত। সাউকরদের অসতর্কতায় এবং মহাজনদের কৌশলে এই ঋণের মাত্রা বাড়তে থাকে, আর তার জের ধরেই বছরের সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে প্রায় সারা জীবনটাই লেগে যেত। আবার কখনো বা বংশানুক্রমিকভাবে দাসত্বের শৃংখল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকত।"

এই বিবাহিত-দাস প্রথা বা ঋণবদ্ধ দাস প্রথা [illegible] লোমহর্ষক; বস্তুত-পক্ষে বিবাহিত দাস মালিকের কেনা গোলামেরই মতো, তার থেকে ভালো কিছু নয়। পার্থক্য শুধু এই যে, ক্রীতদাস বা গোলাম কেনা-বেচা চলত বা পণ্যের মতো বিনিময় করা হত আর বিবাহিত-দাস একই মালিকের অধীনেই থাকত। কোন কোন আদিবাসীর কাছ থেকে দু'একটা দৃষ্টান্তের কথা শুনেছি—"আমার মালিক আর এক ভূস্বামীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে তার

কাছে তার ঋণ শোধ করার জন্য বিবাহিত-দাসকে হস্তান্তর করে দিয়েছে"। অবশ্য এমন দৃষ্টান্ত খুবই বিরল—সচরাচর দেখা যেত না।

বিবাহেচ্ছু আদিবাসীকে, তাদের রীতি-রেওয়াজ অনুসারে, বিবাহের আনুষ্ঠানিক কাজ-কর্মের উদ্দেশ্যে কমপক্ষে এক শ' থেকে দু'শ টাকা পর্যন্ত খরচ করার জন্য তৈরি হতে হত। বিয়ের কথা উঠলেই সবার আগে যে প্রশ্নটা গভীর সমস্যা হয়ে দেখা দিত তা হচ্ছে—এত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? চিরদিন তারা বিনা মজুরিতেই কাজ করত। তাই প্রয়োজনের সময় দু'চারটে পয়সা জোগাড় করাও তাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। এত টাকা যোগাড় করা তো অনেক দূরের কথা। বিবাহ-প্রথা প্রাকৃতিক ও সামাজিক দৃষ্টিতে একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রথা। আদিবাসী উপজাতিরা এই প্রথার উপর দারুণ গুরুত্ব দিত। তাদের সমাজে অবিবাহিত পুরুষকে বিবাহিতের থেকে ছোট বা নীচু মনে করা হত। সুতরাং বিবাহ জরুরী বিষয়ের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু সেই অবশ্য-করণীয় ব্যাপারটার কথা ভাবতে গেলেই সমস্যার পর সমস্যার ভয়াল রূপ দীর্ঘকায় হয়ে উঠত; ভাণ্ডার যে শূন্য, কোথায় মিলবে তার মূলধন? কাজেই জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকেই কর্জ নেওয়া ছাড়া সমস্যা-সমাধানের দ্বিতীয় কোন পথই খোলা থাকত না। টাকা ধার নেওয়ার সময় মহাজনের সংগে চুক্তিতে আসতে হত। সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে, ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত, মালিকের বাড়িতে নব-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই যে-কোন রকম কাজ-কর্ম করতে হত। আর ধূর্ত মহাজনের হিসাব-নিকাশ এমনই সূক্ষ্ম কৌশলে চলত যে অধমর্ণের ঋণ কোনদিন আর পুরোপুরি শোধ করা যেত না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হয়তো কেটে যাচ্ছে—এমন কি অনেক সময় সারা জীবনটাই দাসখৎ দিয়ে কেটে যায়। আর একপুরুষে শোধ না হলে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ঋণের বোঝা তাদের সন্তান-সন্ততিদের ঘাড়ে এসে পড়ত। জোর করে তাদের ছেলেদের দিয়ে "প্রতিশ্রুতি-পত্র বা হাতচিটা" লিখিয়ে নিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে ঋণ-শোধের পালা অব্যাহত থাকত। এইভাবে পরিবারের পর পরিবার দাসত্ব-শৃঙ্খলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে থাকত।

বিবাহ-ঋণের উপর যে সুদ আদায় করা হত, তার হারও খুব চড়া। আমি তো এমনও শুনেছি যে প্রতি মাসে একশ টাকা পিছু ছ' টাকা করে সুদও চাপিয়ে দেওয়া হত অর্থাৎ প্রতি একশ টাকায় বছরে শুধু সুদ গিয়ে দাঁড়াত বাহাত্তর টাকা। ওয়ারলিরা অজ্ঞ, অশিক্ষিত; জমিদার-মহাজনের হিসেবকেই সঠিকভাবে মেনে নিতে বাধ্য হত। সহরবাসীরা খুব স্বাভাবিকভাবেই অবাক হয়ে ভাবত, বিবাহিত দম্পতি বছরের পর বছর

লাগাতার কাজ করে চলেছে, বিনিময়ে যে মজুরি তারা পাচ্ছে তাই দিয়েই তো কয়েক বছর পরেই ঋণ শোধ হয়ে গিয়ে তাদের মুক্তি পাওয়ার কথা, অথচ হচ্ছে না কেন ? প্রশ্নটা সোজা, আর প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু খুব সোজা। বিবাহিত দাস-দম্পতি বেতন বাবদ কিছুই পেত না। সারা বছর কাজ করার পর পুরুষটিকে দেওয়া হত একটা ল্যাংগোটি আর কুর্তা, বরাত খুব ভাল হলে জুটত মাথার পাগড়ি বাঁধার জন্য এক টুকরো কাপড়, মাঝে-মধ্যে বিড়ি-তামাক ; আর মেয়েটি পেত চোলি আর সাড়ি—যার দৈর্ঘ্য কস্মিন-কালেও পুরো ন' গজ হত না। এই হচ্ছে তাদের সারা বছরের পাওনা। বেতন বলে কোন টাকাকড়ি কপালে জুটত না। আর তাই ঋণ-পরিশোধও কোনদিন হয়ে উঠত না! প্রয়োজনের সময় শেঠ-মহারাজ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে, এটাই তো পরম সৌভাগ্যের কথা ! তাই আপাত সৌভাগ্যের প্রসাদটুকু শিরোধার্য করে নিয়েই স্বামী-স্ত্রী জীবনের বাকী দিনগুলো বিনা ওজর-আপত্তিতে মহারাজের সেবা করে যাবে শেষ শ্রম-শক্তিটুকুও নিবেদন ক'রে। আর বিনিময়ে পাবে জীবন-ধারণের জন্য 'পালা'-পাতায় ঢেলে দেওয়া কয়েক মুঠো মোটা চালের ভাত, আর একটুকরো নুনের ডেলা, কখনো-সখনো ভোজ্য-বস্তুকে আরও উপাদেয় করে তোলার জন্য ভাতের সংগে জুটত একটু ডাল। এমনতর বিধি-ব্যবস্থায় ঋণমুক্তি কোন দিনও আর সম্ভব হয়ে উঠত না। এইভাবে নব-বিবাহিত দম্পতি অবশিষ্ট জীবন-টুকু, 'ভৃত্য' থেকে ধীরে ধীরে 'ক্রীতদাসে' রূপান্তরিত হয়ে যেত। আর তাদের জীবদ্দশা শেষ হয়ে এলে, ঋণের শিকলটা আবার তাদের উত্তরাধিকারীদের আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলত। নিয়ম হচ্ছে—বিয়ের ঠিক পরেই, নতুন বর-বধূকে মহাজনের বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে। যেখানেই বলা হবে সেখানেই থাকতে হবে। আর কপালে যে কাজের বোঝা চাপানো হবে তাই-ই করতে হবে। কোন কোন জমিদার স্বামী-স্ত্রীকে এক জায়গায় একত্রে থাকার অনুমতি দিত, আবার কেউ কেউ তাদের পৃথক অবস্থানের বিধান করত ; স্বামীকে পাঠানো হত শহরের বাড়িতে কাজ করতে, আর স্ত্রীকে আটকে রাখত ক্ষেত-খামারের কাজে গ্রামের বাড়িতে। এইভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ব্যবস্থায় চোখ ফেটে তাদের জল গড়িয়ে আসত। কারণ এই অপকৌশলের পিছনে যে বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, তা তারা ভালোভাবেই জানত। মেয়েটিকে তার স্বামীর কাছ থেকে আলাদা করে রেখে, জমিদার মেয়েটিকে নিঃসংকোচে, নির্বাধায় স্বেচ্ছামতো উপভোগ করার পরিকল্পনা নিশ্চিত করে রাখত। মালিক যেমন তার সম্পত্তি ভোগ করে, এও ঠিক তেমনি। এই প্রথা-পদ্ধতির কথা শুনে 'মূর্তিমন্ত গোলাম-

গিরি' (দাস-অবতার) নামে মারাঠি উপন্যাসের কাহিনীগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। সংগে সংগে মনের মধ্যে স্থির বিশ্বাস জন্মাল, ঘটনাগুলো শুধু উপন্যাসের কল্পিত দৃশ্য-সজ্জাই নয়, কঠিন-কঠোর বাস্তব সত্য। এই প্রথাকে বদলানোর জন্যই আমি ও আমার স্বামী পবিত্র শপথ নিয়েছিলাম।

বিবাহিত দম্পতীদের নানান ধরনের কাজ-কর্ম করতে হত। ভোর সকালে সকলের আগে ঘুম থেকে উঠতে হত, আর রাত্রিতে মালিক ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘুমানোর সুযোগ মিলত। সারাদিন চলত কর্মযজ্ঞ –ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করা, উঠোন ঝাড়ু দেওয়া, জল ছড়িয়ে ধুলোবালি পরিষ্কার করা, বাসন-পত্র ধুয়ে-মেজে সাফ করা, কাপড় কাচা, কুঁয়ো থেকে সারা-দিনের প্রয়োজনীয় জল তোলা, রান্না-বান্নার যোগাড়-যন্ত্র করা, কখনো সখনো রান্না পর্যন্ত করা, খাওয়া-দাওয়ার পর ধোয়া-মোছা করা, ধান-গম ভাঙিয়ে চাল-আটা তৈরি করা, খাটাল পরিষ্কার করা, গাই-দোয়া, সন্ধ্যে বেলায় বাতি জ্বালা, টাঙ্গা থাকলে পরিষ্কার করা, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দেওয়া, মালিকের গা-হাত-পা টিপে দেওয়া, মালিকের মর্জি-মতো ভারী বোঝা নিয়ে দশ-পনের মাইল পর্যন্ত যাতায়াত করা, তিনি ঘোড়ায় চড়ে গেলে তার ঘোড়ার পিছনে পিছনে ছোটা অথবা টাঙ্গা চালালে তার পিছনে ছোটা, মালিক মুখের কথা খসালেই পায়খানা-পর্যন্ত পরিষ্কার করা—ইত্যাদি, ইত্যাদি হাজার ধরনের কাজকর্ম। বিনা-পারিশ্রমিকে দিন রাত ধরে এত-সব খুঁটিনাটি কাজ করে তারা মালিকের জীবনকে পরম আরামদায়ক ও সুখী-সমৃদ্ধ করে তুলত। এই সব বিবাহিত দাসদের আমি জিজ্ঞেস করতাম "কী ব্যাপার! তোমার নিজের স্ত্রীর ইজ্জৎ লুটছে মালিক, আর তুমি তা বরদাস্ত করছ কী করে? তোমরা পালিয়ে বাঁচছ না কেন?" জবাব দিত তারা, "পালিয়ে যাবোটা কোথায় দিদি? মেরে-পিটে আবার ধরে নিয়ে আসবে।" কথাটা সত্যিই বটে। তাদের দুনিয়া সীমিত এবং আরও সংকুচিত হয়ে গেছে তাদের নিঃস্বতা, রিক্ততার ফলে। পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র কোথাও কাজে লাগলে, নতুন মালিক যদি জানতে পারে যে তারা পালিয়ে এসেছে, তাহলে পিঠ মোড়া করে বেঁধে পুরানো মালিকের কাছে আবার পাঠিয়ে দিত। আর গ্রাম ছেড়ে অন্য কোন গ্রামে পালিয়ে গেলে, মালিক তার ভাইয়া (Bhaiyya), সর্দার বা পাঠান পাঠিয়ে তাদের সন্ধান চালাত। ঐ যন্ত্র-দানবগুলো তাদের খুঁজে বের করে পিটতে পিটতে টেনে হিচড়ে ভুস্বামীর সামনে হাজির করত। তারপর তাদের আবার ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে মালিক পিটুনি লাগাত। শুধু তাদের মেরেই ক্ষান্ত হত না, এমন কি তাদের মা-বাবা, ভাই-বোনদেরও প্রহার করত "কেন পালিয়েছিল তোদের ছেলে? আমার সব টাকা ফেল এখনই।"

এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েই বা ফলটা কী ?. আদালতে সুরাহা হওয়ার কোন আশাই নেই। তাদের এই দুর্ভাগ্য প্রসংগে রিপোর্ট করতে গিয়ে শ্রী সীমিংটন বলেছেন—"দেনাদার যদি ধার শোধ করতে ঢিলেমি করত বা কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ করত, অথবা কাজ করতে অসন্তোষ প্রকাশ করত, তাহলে ভূস্বামীর দালালরা বা তার পাঠান বা চৌকিদার তাদের ধমকাত, তাদের উপর হামলা করে প্রচণ্ড মার-ধোর করত। আর দেনাদার যদি কাজ করতে অস্বীকার করত, যে কাজ করার জন্যই সে ঋণের বিনিময়ে দায়বদ্ধ, তাহলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাজানো মামলা দায়ের করা হত। পরম দুঃখের সংগেই আমাকে আজ বলতে হচ্ছে যে অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরাও এক অদ্ভুত পক্ষপাতদুষ্ট বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সব সাজানো মামলার বিচার-বিবেচনা করতেন।"

বিলাস-বৈভবের মধ্যে বাস করত ভূস্বামীরা, আর বিবাহিত দাসরা কাঠের পুতুলের মতো তাদের চারপাশে সব সময় মহারাজের খেয়াল-মর্জিমতো ঘুর-পাক খেত। মুখে একটা নির্লিপ্ত বোকা-বোকা ভাব সব সময়েই ফুটে উঠত। মাথা নীচু করে ঘাড় গুঁজে তারা যখন কাজ করে চলত, তখন সন্দেহ জাগা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে, লোকগুলো বোবা, কালা বা অন্ধ নয় তো! কিন্তু যখনই তারা লাল ঝাণ্ডার সমর্থন পেল, উৎসাহ-উদ্দীপনা পেল, তখন হাজার হাজার বিবাহিত-দাস তাদের মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, ছুঁড়ে ফেলে দিল হীন-দায়বদ্ধ জীবনের শিকলগুলো আর প্রাণভরে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আপন অভিজ্ঞতায় তারা এই শিক্ষাই পেয়েছিল যে, একা-একা বিচ্ছিন্ন-ভাবে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস চালালে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। বিবাহিত দাসদের মুক্ত করার পরিকল্পনা আদিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে নিজেরাই করেছিল এবং তার কার্যকরী রূপও দিয়েছিল কিসান-সভা তার জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। লাল-ঝাণ্ডার সমগ্র আন্দোলন তাদের কাছে মুক্তি-আন্দোলনরূপেই পরিগণিত হয়েছিল। বিবাহিত-দাসদের মুক্ত করার প্রশ্নটি সেই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অংগরূপে তারা ধরে নিয়েছিল। তারা সভা-সমিতি ডাকত, হাজার হাজার মানুষ তাতে যোগদান করত। সভায় আগত সমস্ত আদিবাসীরা চারটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে চারটি ভিন্ন-ভিন্ন দিকে মিছিল করে ভূস্বামীদের বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হত। সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ-কারীরা উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দিত—"সুডকা মড়কা ঘো, সুটুন পড়" (Sudka-madka gho, sutun Pad), আক্ষরিক অর্থে যার অর্থ হলো, "তোমাদের ঐ ছেঁড়া কাপড় আর মাটির পাত্রগুলো নিয়ে বেরিয়ে এস, আমাদের সংগে

যোগ দাও, মুক্ত হও।" তাদের সম্বল বলতে তো ছিল শুধু পরনের কাপড় আর দু একটা মাটির থালা বা ভাঁড়, সেইগুলিই নিয়ে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানানো হত। "দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হও"—বিবাহিত দাসদের প্রতি এই ছিল উদাত্ত আহ্বান। এই স্লোগান শোনার সংগে সংগেই তারা স্বামী-স্ত্রী দ্রুত বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে মিছিলের সংগে সামিল হয়ে যেত। তিন দিন ধরে মিছিলগুলো গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াল, শত শত বিবাহিত-দাসদের মুক্ত করল। তাদের পক্ষে একক প্রচেষ্টায় যে কাজ ছিল অসম্ভব, সেই কাজই ঐক্যবদ্ধভাবে সমবেত প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। পিছনে ছিল তাদের শুধু একমাত্র লাল ঝাণ্ডার সমর্থন। যে সমস্ত ভূস্বামীরা তখনো পর্যন্ত বিবাহিত দাস-দম্পতীদের মালিকানা জন্ম-সিদ্ধ অধিকার বলে ধরে নিয়ে তাদের সংগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপভোগ করার মতো আচার-আচরণ করত, তারাই লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিল আসতে দেখেই দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে নিজেদের বন্দী করে ফেলল, মুখে তাদের প্রতিবাদের ক্ষীণ-কণ্ঠও ধ্বনিত হল না, কোন সাহসই করল না। আদিবাসীরা শান্তভাবে, বেশ শৃঙ্খলার সংগেই দাসত্ব-বদ্ধ ভাই-বোনেদের দাসত্বের পিঞ্জর থেকে মুক্ত করে নিয়ে এল। কোন ভূস্বামীর গায়ে একটা আঁচড়ও পর্যন্ত পড়ল না।

দহানু তালুকে দাসত্ব-মুক্ত দম্পতীদের কয়েকটি সভায় আমি গিয়েছিলাম। দেখেছি, তাদের মুখগুলো এক নতুন আশার আলোয় ঝলমল করছে, সে মুখ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় আনন্দে ভরপুর। বর্ণনার অতীত তাদের সেই আনন্দোচ্ছ্বাস। তাদের মুক্তি কী ভাবে ঘটল, কি কি ঘটল, মালিকের কেমন দুর্গতি হল—এই সব কাহিনী সঠিকভাবে আমাদের কাছে বলার সময় তাদের চোখে-মুখে খুশির ঝলক উছলে উঠত, পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করত গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টিতে। নওসী নামে একটি মেয়ে মাত্র একটি বাক্যে তার সমস্ত অভিজ্ঞতার সারাংশ করে দিল, "নরক-কুণ্ড থেকে মুক্তি পেলাম"। অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটির সংগে গল্প করলাম, শুনলাম তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতাবহুল নারকীয় জীবনের রোমহর্ষক কত কাহিনী।

একটা কথা এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার। কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন ঃ টাকা যোগাড় করতে না পারলে কি ওয়ারলিদের বিয়ে করা অসম্ভব হয়ে পড়ত? আদিবাসীরা এই সমস্যার সমাধান নিজেরাই খুঁজে নিয়েছিল। বিবাহোৎসবের নানান আচার-অনুষ্ঠানের জন্যই বেশ কিছু টাকার দরকার। নিজেরাই তারা সিদ্ধান্ত করেছিল যে টাকা পয়সা না থাকলে তারা বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যাবে না। শুধু মাত্র, প্রথা-

নুযায়ী মেয়েটিকে একটা শাড়ি, জামা আর চুড়ি দেওয়া হত। তারপর ছেলের বাড়িতে ছেলে আর মেয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো একসংগে বসবাস করত। তাদের ভাষায় এই বিবাহ-অনুষ্ঠানের নাম "কোরড" (Korceda), মেয়েটি সন্তান-সম্ভবা হয়ে পড়লে খুব অধৈর্য হয়ে পড়ত, ছেলেটিকে তাড়া লাগাত বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য "ভার্যা (varya) বর্ষণ উৎসবের" জন্য [Rice-(Varya) throwing ceremony]। এই অনুষ্ঠান করে নেওয়ার পরই বিবাহ বিধির পূর্বে গর্ভজাত সন্তান তাদের সমাজে বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে জাত-সন্তানের মতোই স্বীকৃতি ও সমান মর্যাদা লাভ করত। কিছুদিন আগেই এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬৭ সালে ভাদোলি গ্রামে রূপজী ওঝারিয়া নামে এক ওয়ারলি টাকা পয়সা সংগ্রহ করে একই সঙ্গে তার নিজের ছেলের বিয়ে ও তার নিজের বিয়ের রীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী অনুষ্ঠান-উৎসব করেছিল। এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায়—নিজের ও আপন সন্তানের বিবাহ অনুষ্ঠান একই সংগে ঘটেছে। আন্দোলনে সাফল্যের পর আদিবাসীরা কাজের বিনিময়ে মজুরি পেতে লাগল। এই ভাবে টাকা-পয়সা উপার্জন করে তাই দিয়ে আপন সন্তানের সংগে, একই সময়ে নিজেরও বিবাহ বিধি সম্পূর্ণ করে নেওয়ার সুযোগ পেত। তা না হওয়া পর্যন্ত উপরি-উক্ত 'কোরড' প্রথানুযায়ী তারা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মতো এক সংগে দাম্পত্য-জীবন যাপন করত। পয়সার অভাবে নিজেদের রীতি-অনুযায়ী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের বিয়ে হত না।

আমাদের সমর্থন লাভের পর বিবাহিত দাসদের দু'ভাবে সমস্যা সমাধান হল, প্রথমত গোলামির বেড়াজাল থেকে তারা মুক্ত হল, আর দ্বিতীয়ত তারা মজুরি লাভের সুযোগ পেল, তাই দিয়ে বিয়ের জন্য খরচ করার ক্ষমতাও অর্জন করল। ওয়ারলি সমাজে বরপাত্রকে পাত্রীর বাবাকে পণ (dowry) দিতে হয়। বিয়ের পর বধূ যদি নিজেকে অসুখী মনে করে, তাহলে স্বামীকে পরিত্যাগ বা তালাক দেওয়ার স্বাধীনতা আছে তার। তবে সেক্ষেত্রে সর্ত থাকছে যে, পাত্রপক্ষ যে যৌতুক বা পণ দিয়েছিল, পাত্রীর বাবাকে তা আবার ফেরৎ দিতে হয়। তাদের ভাষায় এই প্রথাকে "দাওয়া" (dava) বলা হয়। আর যদি মেয়েটি আবার অন্য কাউকে বিয়ে করে তাহলে তার নূতন স্বামী সেই "পণ" পূর্বতন স্বামীকে ফেরৎ দেবে। এই সব আচার বা নিয়ম সম্বন্ধে গ্রাম্য-প্রধানরা বৈঠকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিত। প্রধানদের জন্য তারপর সুরাপানের ব্যবস্থা হত। স্বামীর সংগে যদি কোন স্ত্রীর বনিবনা না হয়, বা স্বামী যদি স্ত্রীকে মারধোর করে অথবা মেয়েটির সংগে যদি অন্য কোন ছেলের প্রণয় জন্মায়, তাহলে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে আসার স্বাধীনতাও রয়েছে তার। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম স্বামী যখন 'পণ' ফেরৎ না পেত,

তখন ঝগড়া-ঝাটি ও মারপিট পর্যন্ত শুরু হয়ে যেত। আবার গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ডেকে তখন মিটমাটের ব্যবস্থা হত।

কোন বিশেষ মেয়েকে বিবাহেচ্ছু কোন ওয়ারলির যদি পণের টাকা দেওয়ার মতো সংগতি না থাকে, তাহলে ছেলেটির অসুবিধা দূর করার জন্য আর এক ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হত। এমন ক্ষেত্রে বিয়ের আগে ছেলেটিকে ভাবী শ্বশুর মশায়ের বাড়িতে গিয়ে থাকতে হয়। অবশ্য যথাসম্মানে তাকে নিয়ে আসা হয়, শ্বশুর মশাইকে দু জন গ্রাম-প্রধান সংগে নিয়ে ছেলেকে তার বাড়ি থেকে আনতে যায়। গ্রাম-প্রধানদের সামনে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে, সে তার শ্বশুর বাড়িতে তিন থেকে পাঁচ বছর বসবাস করবে। এই রকম কড়ার বা চুক্তি হওয়ার পর ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠান করা হত।

যদি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছেলেটি মেয়েটির বাড়িতে বাস করে এবং পরিবারের একজন সদস্যের মতোই কাজ-কর্ম করে, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, সে 'পণ' পরিশোধ করেছে এবং তখন বিয়ের অনুষ্ঠান করা হয়। এইভাবে চুক্তিবলে যে ছেলে শ্বশুর বাড়ি বাস করে তাকে একটি বিশেষ নামে অভিহিত করা হতো, সেই বিশেষ অভিধা হল "ঘরোয়া বা খান্দাড্যা" [gharora or khandadya].

অষ্টম অধ্যায়

লাল-নিশান দিল আহ্বান

অক্টোবর মাসে দশহরার কাছাকাছি সময়ে পালঘর, দহানু, ভোইসর, উম্বরগাঁও, ভিলাড় প্রভৃতি স্টেশনের প্লাটফর্মে দলে দলে আদিবাসীদের বসে থাকতে দেখা যায়। সংগে থাকে তাদের ঘর-সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি জিনিস—কয়েকটা মাটির থালা, ঘটি, ডিস্, ছেঁড়া চাটাই, বিড়ির জন্য আপ্টা-পাতার বাণ্ডিল, আর লাঠি। লম্বা লম্বা চুল চূড়ার মতো টান করে বাঁধা, পরণে লাঙ্গোটি—এই হচ্ছে পুরুষদের পোশাক বলতে যা বোঝায়; আর মেয়েদের পরণে দেখা যায় কোন রকমে লজ্জা নিবারণের মতো এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়, চুলগুলো তেলের অভাবে রুক্ষ, বহুদিন চিরুণি না পড়ায় জট পাকিয়ে গেছে। সংগের ছেলে-মেয়েগুলো সম্পূর্ণ উলঙ্গ। প্লাটফর্মে বসে বসে ঘেমে পচে মরছে—আর একটা উৎকট গন্ধ গোটা স্টেশন এলাকাটায় ছড়িয়ে পড়েছে।

এই সব ওয়ারলিরা প্লাটফর্মে জমায়েত হয়েছে কেন? কি করতে এসেছে তারা? ঘটনা হচ্ছে ভূস্বামীরা তাদের চালান দেবে বিভিন্ন গ্রামে "ঘাস কাটাই"-এর জন্য, তাই তারা অপেক্ষারত। দশহরার পর থেকে তিন চার মাস যাবৎ এই অঞ্চলে বেশ কাজের সাড়া পড়ে যায়। ধান কাটা, ধান ঝাড়া এবং ঘাস কাটা—এগুলোই হচ্ছে এই সময়ের প্রধান কাজ। যথাসময়ে এসব কাজ না হলে হাজার হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

এই অঞ্চলে ঘাসের ব্যবসা বেশ বড় ধরনের ব্যবসা। সফলা স্টেশন ছাড়িয়ে গেলেই পশ্চিম রেলপথের রাস্তার দু ধারেই দেখা যায় লম্বা লম্বা সবুজ ঘাস বহুদূর পর্যন্ত মাথা উঁচিয়ে ছড়িয়ে আছে। কিছু কিছু বুনো ঘাস এমনিই জন্মেছে। আর কিছু কিছু বিশেষভাবে চাষ করা হয়েছে। রেলওয়ে লাইনের পূর্বদিকের পাথুরে পাহাড়ী এলাকার জঙ্গলে আর বাঁধের ওপর পতিত জমিতে ঘাসগুলো জন্মায়ও প্রচুর, মালিকরা সযত্নে চাষ করে। ঘাসের জমিগুলোকে বলে "ঘাসের মোরা" (Moras)। হাজার হাজার একর জমিতে এই ঘাস জন্মায়। জমির মালিকরা চড়া মুনাফায় ঘাস বিক্রী করে দালালদের কাছে। শুধুমাত্র এই ব্যবসা থেকেই লক্ষপতি হয়ে উঠেছে মালিকরা।

ঘাস কাটার জন্য নির্দিষ্ট সময় এলেই মালিকদের হাজার হাজার মজুরের দরকার হয়ে পড়ে যথাসময়ে সে কাজ শেষ করার জন্য। কারণ ধান কাটা আর ঘাস কাটার কাজ একই সংগে শুরু হয়ে যায়। তাই চাষীরা নিজেদের ধান কাটা-ঝাড়ার কাজ ফেলে রেখে মালিকদের ঘাস কাটার জন্য যেতে রাজী হয় না। যথা সময়ে ঘাস কাটার কাজে আসার জন্য, তাদের মধ্যে উৎসাহ বা প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মালিকরা তাদের মজুরির উপর আগাম দিয়ে দেয়। আর এভাবে আগাম নেওয়ার অর্থ হয়ে দাঁড়ায়—চাষী তার শ্রম বন্ধক দিয়ে দেয় মালিকের কাছে, ফলে ডাক পড়লেই ঘাস কাটার জন্য সে যেতে বাধ্য থাকে।

মজুর ধরার জন্য মালিকরা দালাল নিযুক্ত করে, আবার দালালরা নিযুক্ত করে সর্দার (foreman)। সাধারণত হোলির পর থেকেই ওয়ারলিদের ঘরে আদৌ কোন শস্য থাকে না। এই সময়ে সর্দাররা গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অভাবী লোকগুলোকে দশ থেকে পঁচিশ টাকা আগাম দেওয়ার টোপ ফেলে। এই টাকার একাংশ তখনি দিয়ে তাদের ঘাস কাটার জন্য কড়ারবন্ধ করে ফেলে। পরে ঐ টাকা তাদের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া হয়। ঘাস কাটার সময় এগিয়ে এলেই আগাম নেওয়া দায়বন্ধ লোকগুলোকে এক জায়গায় হাজির করানো হয়, নিকটতম রেল স্টেশনে গরু-ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে, ট্রেনের কামরায় গাদাগাদি করে ভরে ঘাসের মাঠে চালান করে দেওয়া হয়। যারা একটু টাল-বাহানা করে, তাদেরকে গালি-গালাজ করে মারতে মারতে, জোর করে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়। এক বোঝা কাটা ঘাসের ওপর দালালরা মুনাফা পায় পঞ্চাশ পয়সা—একটা আঙ্গুল পর্যন্ত নাড়তে হয় না তা আয় করতে। আর সর্দাররা এই মরসুমে মাইনে বাবদ পায় প্রতি মাসে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা।

নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সময়ের মধ্যেই ঘাস কাটার কাজ শেষ করে ফেলার ব্যাপারে মালিকরা খুবই আগ্রহী। ঘাস যদি বেশী দিন রাখা হয়, তাহলে সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, ফলে ওজন কমে যায় আর গুণগত মানও নষ্ট হয়ে যায়। মালিকরা তখন তাদের আশানুরূপ দাম পায় না। আবার বৃষ্টি-ভেজার পর বা শিশির-ধোয়ার পর ঘাস যদি ভিজে থাকে তাহলে ঘাসের রং কালচে হয়ে যায়। ফলে তারও মান কমে যায় আর ঠিক ঠিক দাম পাওয়া যায় না। সেই জন্যই দালাল আর সর্দাররা এমন উন্মত্তভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করে ফেলার জন্য বেশি বেশি "মজুর বাঁধার" কাজে দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দেয়। আগাম দিয়ে হাজার হাজার ওয়ারলিদের বেঁধে ফেলা হয়। আবার অনেকে আগামবন্ধ না হয়েও কাজে আসে। কাজের সময় পুরো মজুরি তারা পায়।

ঘাস কাটার সময়ে, সফলা স্টেশন থেকে শুরু করে এগুলেই রেলের কামরার মধ্যে থেকেই দেখা যাবে সারির পর সারি ঘাস-মজুরের দল, নুয়ে পড়ে কাজ করে চলেছে। এ দৃশ্য পথের দু ধারেই দেখা যায়। ঘাস কাটার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে মাঠের মধ্যেই থাকতে হয়। শীতের রাতে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে তারা পড়ে থাকে। বৃষ্টি নামলে অবস্থা খুব করুণ হয়ে দাঁড়ায়। কষ্টের সীমা থাকে না তখন। দিনের বেলায় কাজ চলার সময় মালিকের চৌকিদার আর সর্দাররা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়—কাজের গতি যাতে না ঝিমিয়ে পড়ে, তাই অবিরাম চিৎকার করে চলে, "হাত চালাও, হাত চালাও"। মাথার ওপর সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ, দরদর করে ঘামতে থাকে মজুরগুলো। পিপাসা লাগলে এক ফোঁটা জল খাওয়ার এক মুহূর্তেও সুযোগ পায় না। বেচারারা দু'এক টান বিড়ি টেনে নেবে তার ফুরসুৎও মেলা দায়! চৌকিদার বা সর্দারের মোটা লাঠির প্রচণ্ড আঘাত কখন অপ্রত্যাশিতভাবে পিঠে এসে পড়বে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, সেই ভয়েই তারা ঘাড় গুঁজে কাজ করে যায়। মাঝে মধ্যে বিনা অপরাধেও লাঠির আঘাত নেমে আসে। শুধু অপরাধ করলেই যে আঘাত পড়বে এমন কোন কারণ নেই—তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্যই সেই "প্রয়োগ-বিধি" চালিয়ে রাখা হয়।

কেবল ঘাস কাটলেই কাজ শেষ হয় না। তারপরও, অনেক কাজ করতে হতো। পাঁচশো পাউণ্ড ওজনের বড় বড় বোঝা বাঁধতে হয় তাদেরকেই। মোটা-মুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে তাদের, কতগুলো ঘাস বাঁধলে পাঁচশ পাউণ্ড ওজন হবে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে সেই কাজ তারা প্রায় আন্দাজেই করে যায়। বোঝাগুলোকে তারপর এক জায়গায় গাদা দিয়ে রাখতে হয়—যাতে রোদ-জলে খারাপ না হয়ে যায়। তারপর সেগুলোকে চাপ দিয়ে বেঁধে বড় বড় গাঁট বা বেল তৈরি করে গুদামে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আবার রেল স্টেশনে নিয়ে গিয়ে রেলগাড়িতে বোঝাই করতে হয়। কাটা থেকে শুরু করে বোঝাই দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজই "ঘাস-কাটাই"-এর কাজের মধ্যে পড়ে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই সমস্ত কাজের জন্য আদিবাসীরা মজুরি হিসাবে পেত সাকুল্যে কয়েক আনা পয়সা বা তাড়ির দাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঘাস থেকে বেশ মোটা দাম পাওয়া যেত। ঘাস বিক্রী করে মালিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটলেও, মজুরদের মজুরি কিন্তু তখনো দুই থেকে চার আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। বেশিরভাগ ঘাসই বেগার প্রথার মাধ্যমে কাটিয়ে নেওয়া হত। দারিদ্র্যপ্রপীড়িত ও অনশন-ক্লিষ্ট ঐ মেহনতী মানুষগুলোকে প্রায়ই স্টেশনে দেখতাম—তারা চলেছে

লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার মুনাফা মালিকের পকেটে তুলে দিতে ; আর আমার মনের মধ্যে তখন তুফান উঠত, ক্রোধের আগুন জ্বলতে থাকত। একথা সত্যিই যে, "আত্ম-স্বার্থ হচ্ছে একটা যূপকাষ্ঠ—যেখানে সমগ্র মানবিক মূল্যবোধকে বলি দেওয়া হয়"।

কিসান সভা সিদ্ধান্ত নিল—ঘাস-কাটাই-এর কাজে মজুরি বাড়াতে হবে। আদিবাসীরাই ভেবে চিন্তে ঠিক করল যে প্রতি ৫০০ পাউন্ডের ঘাসের বোঝার জন্য আড়াই টাকা মজুরি হবে ন্যায্য দাবি। মালিকরা যে বিরাট মুনাফা পায়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই মজুরি প্রায় নামমাত্রই বলা যায়। মজুরির পরিমাণটা ঠিক করার সময় মালিকদের ঘাসের ব্যাপারে যাবতীয় খরচের কথাই বেশ সযত্নে খুঁটিয়ে দেখা হল—আগাছা পরিষ্কার, রক্ষণাবেক্ষণ, মজুরি, গাঁট বাধার জন্য প্রেস, তারের দাম, গুদাম-ভাড়া, রেলের কামরায় নিয়ে গিয়ে বোঝাই দেওয়া, পরিবহন ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি—ইত্যাদি সমস্ত খরচই খতিয়ে দেখা হল। এই সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে নীট মুনাফা হতো প্রতি ৫০০ পাউন্ডে দশ থেকে এগার টাকা। কাজেই আমাদের দাবি সম্পূর্ণ বাস্তব-সম্মত বলেই মনে হল। তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই একটি সাংবাদিক সম্মেলনে যে উক্তি করেছিলেন তার থেকেও আমাদের দাবির যৌক্তিকতার সমর্থন মেলে। তিনি বলেছিলেন—"চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড ওজনের যে ঘাস পুড়ে গেছে তার দাম এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশি।" এই হিসাব অনুযায়ী, প্রতি ৫০০ পাউন্ড ঘাস থেকে মোট লাভ পাওয়া যায় ১৮ টাকা ৭৫ পয়সা। তাহলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে—মজুরদের নামমাত্র কয়েক আনার তুচ্ছ একটা মজুরি দিয়ে মালিকরা কি বিশাল পরিমাণ টাকার মুনাফা লুটত। সুতরাং জংগলে প্রতি ৫০০ পাউন্ড ঘাস কাটার জন্য ২ টাকা ৫০ পয়সা এবং সমুদ্র-তীরভূমিতে তিনটাকা মজুরি দাবি সম্পূর্ণ বাস্তব-ভিত্তিক। ভূস্বামীরা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করল। ফলে আন্দোলনের হাওয়া বইতে শুরু করল।

"বেগারি খতম করো" এবং "বিবাহিত দাসকে মুক্ত করো"—পূর্ববর্তী এই দুইটি আন্দোলনের সময় ওয়ারলিরা ঐক্যের গুরুত্বের কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিল। অতীত সাফল্যের অভিজ্ঞতার উপর আস্থা রেখেই তারা ধর্মঘটের পথে এগিয়ে গেল। একটি ওয়ারলিও কাজে গেল না। ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হল।

ধর্মঘটের প্রাথমিক স্তরে, মালিকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করল ধর্মঘটীদের ঐক্যকে ভেঙ্গে ফেলতে। নিতান্ত মামুলি অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের গ্রেপ্তার করিয়ে ফাটকে আটকে দিল ; তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু

করা হল। এই সব প্রচেষ্টাকে আদিবাসীরা নিছক অযথা হয়রানি বলেই ধরে নিল। কিন্তু এর ফলে তাদের মনোভাব আরও উগ্র এবং তিক্ততর হয়ে উঠল।

তখন মালিকপক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপের জন্য প্রার্থনা করে বসল—সেই পুরানো কাঁদুনি গেয়ে যে কমিউনিস্টরা মজুরদের সহিংস আন্দোলনের জন্য উসকানি দিচ্ছে। কিন্তু তাদের ওজর-আবদার সরকারী সমবেদনা আকর্ষণে ব্যর্থ হল। কারণ সকলের কাছেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, হরতাল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল। তখন আরেকটি অনুরোধ নিয়ে তারা কালেকটারের কাছে ধর্ণা দিল। এবার মালিকপক্ষ দাবি করলো যে সরকারী হস্তক্ষেপ করতে হবে না: তবে প্রচুর সংখ্যক চৌকিদার ভাড়া করার অনুমতি তাদের দিতে হবে যাদের দিয়ে ওয়ারলিদের শায়েস্তা করা যাবে। এ কথা কয়েকজন মালিক নিজেরাই আমার কাছে পরে ফাঁস করে দেয়। এই দ্বিতীয় অনুরোধও প্রত্যাখ্যাত হল। তখন, আদিবাসীদের উত্তম শিক্ষা দেওয়ার অভিলাষে এক ঘৃণ্য নারকীয় ষড়যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এল ভূস্বামীরা। এই ষড়যন্ত্র সফল হলে সরকারকে বাধ্য হতে হবে হস্তক্ষেপ করে গুলি-গোলা চালিয়ে তাদের উপর দমন-পীড়ন চাপিয়ে দিতে।

জমি মালিকদের ষড়যন্ত্র

তালওয়াড়া গ্রামে লাল ঝাণ্ডার অনেক মিটিং হয়েছিল। এই ঘটনাকে ভিত্তি হিসেবে কাজে লাগিয়ে সমস্ত ভূস্বামীরাই এক যোগে ১৯৪৫ সালের ১০ই অক্টোবর রাত্রি ৮টার সময় প্রায় ১৫০০ বর্গ মাইল এলাকায় একটা গুজব রটিয়ে দিল, "দিদিমনি (Bai) তালওয়াড়া গ্রামে মধ্যরাত্রে একটা জনসভা ডেকেছেন। ঐ সভা ভাঙার জন্য জমিদাররা প্রচুর গুণ্ডা ভাড়া করেছে। দিদিমণির জীবন বিপন্ন। তাই লাল ঝাণ্ডা আহ্বান জানিয়েছে যে, দিদিমণির জীবন রক্ষার জন্য সমস্ত আদিবাসীরাই কাটারি, কুড়াল, লাঠি ইত্যাদি হাতের কাছে যে হাতিয়ার পাবে তাই নিয়েই যেন ঐ সভায় হাজির হয়"। নানান উপায়ে এই গুজব একসংগে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হল—রাস্তায় চলাচলকারী ট্রাক, দোকানদার এবং ভূস্বামীদের ক্ষেত-খামার, জমিদারি এলাকা ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে।

কৌশলটা কার্যকরী হল। সাদাসিধে সরল প্রাণ ওয়ারলিরা এই গুজব, তক্ষুণি সত্যি বলেই মেনে নিল। যে সব আদিবাসী অতো রাত্রিতে সেই আহ্বানে সাড়া দিতে ভয় পেল—তাদের বাড়ির মেয়েরাই তাদের তিরস্কার করতে লাগল, "বহিনজীর জীবন যখন বিপদাপন্ন তখন কোন্ মুখে বাড়িতে

বসে থাকবে তোমরা ?" সুতরাং বেরিয়ে পড়ল তারা, হাতের কাছে যা কিছু পেল তাই হল তাদের হাতিয়ার। শুধু একবার মাত্র থমকে দাঁড়িয়ে ভগবানের কাছে মানত করল। উপলাতু গ্রামের এক বৃদ্ধ বলেছিল "দিদিমণির জীবন বিপন্ন শুনে মানুষগুলো নিজেদের ভাতের থালা ফেলে রেখেই বেরিয়ে পড়েছিল। হাতের লাঠিটা শুধু নিয়ে নিয়েছিল।" লাল ঝাণ্ডা ও আমার উপর ওয়ারলিদের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভূস্বামীরা এই নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রচেষ্টা চালিয়েছিল! মধ্যরাত্রের মধ্যেই প্রায় দশ হাজার আদিবাসী তালওয়াড়া গ্রামে সমবেত হয়েছিল, হাতে তাদের পাঁচমিশালী অস্ত্র-সম্ভার। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ মাইল দূর থেকে হেঁটে এসেছে। কিছুদিন পরে পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট আমাকে বলেছিলেন, "চারদিক থেকে আদিবাসীরা দলের পর দল যেন ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়ছিল। ভোরের মধ্যেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় তিরিশ হাজার।"

তালওয়াড়ার সভায় ওয়ারলিদের সমবেত হওয়া—এটা ছিল ভূস্বামীদের চক্রান্তের একটি অংশ। এই চক্রান্তের অপর অংশ হচ্ছে—পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয় যে, হাজার হাজার আদিবাসী কমিউনিস্টদের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য একজায়গায় জমায়েত হয়েছে ; অতএব পুলিসী সাহায্য চাই জীবন রক্ষার জন্য।

অতঃপর রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য পারিষদবর্গ সহ পুলিস সুপারিনটেনডেন্টের আবির্ভাব ঘটল। ঘটনার সত্যাসত্য নিয়ে কোন রকম নিরপেক্ষ অনুসন্ধান না করে ভূস্বামীদের কথার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই তাদের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে তারা পুলিস-গাড়ির মাথার ওপর চড়ে বসল এবং সভারম্ভের জন্য অপেক্ষারত, সমাগত আদিবাসীদের উপর গুলি চালিয়ে দিল। ১০ তারিখ রাত্রি থেকে ১১ তারিখ বিকেল পর্যন্ত আমেদাবাদ-বোম্বাই প্রধান সড়কের উপর পুলিস ভ্যান টহল দিতে লাগল, সংগে সংগে চলল নিরপরাধ আদিবাসীদের উপর বুলেট-বর্ষণ। পাঁচজন আদিবাসী গুলির আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, আর আহত হল শিশু-যুবা-বৃদ্ধ নিয়ে শত শত নিষ্পাপ মানুষ। গুলি চালনার ফলে কতজন মানুষ আহত হয়েছিল, তার সঠিক সংখ্যা আমরা কখনও নির্ধারণ করতে পারিনি।

ওয়ারলিদের কোন অপরাধ নেই, অথচ পুলিস লাল ঝাণ্ডার উপর আক্রমণ চালাচ্ছে তাই তারা লাল ঝাণ্ডার সম্মান রক্ষার জন্য ঝাণ্ডা ঘিরে চারপাশে বসে রইল ; বুলেট নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তাদের উপর—সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ; মনের মধ্যে তখন শুধু একটি মাত্র ধ্যান-জ্ঞান—লাল ঝাণ্ডার সম্মান তাদের রাখতেই হবে। এহেন দুর্জয় সাহস শরীরে রোমাঞ্চ এনে দেয়,

প্রশংসায় শির অবনত করতে বাধ্য করে। সেই দিন ঐ জায়গায় যে রক্ত ঝরে পড়েছিল, সেই রক্তের দাগ, লাল ঝাণ্ডার আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

১১ তারিখ বিকেলেও যখন সভা পরিচালনা করতে বা ভাষণ দিতে কেউই এল না তখন আদিবাসীদের মধ্যে সংশয় দেখা দিল। একজনকে পাঠিয়ে দিল থাল্ডালওয়াড়ে আমাদের অফিসে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করার জন্য। সে সময় কমরেড কাশী রণদিভে অফিসে পৌঁছে গিয়েছিল। গুলি-চালানোর সংবাদে সে তো স্তব্ধ হয়ে গেল। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। তক্ষুনি তালওয়াড়ায় চলে গেল। আদিবাসীদের কাছে ব্যাপারটার সত্যতা সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করল এবং শান্তিপূর্ণভাবে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। এমনকি তখনও, যখন সে তাদের বোঝাচ্ছিল, পুলিস আবার গুলি চালিয়ে দিল। বুলেটের আঘাতে কমরেড জেঠিয়া গাংগড়ের জীবন দীপ চিরতরে নিভে গেল।

প্রায় পনের ঘণ্টাকাল তারা গুলিবর্ষণের পরোয়া না করেই সেখানে বসেছিল। যদি কমরেড রণদিভে গিয়ে সেই দৃশ্যপটে না পৌঁছাত, তাহলে আরো কতক্ষণ যে তারা ঐরকম চালিয়ে যেত—তা বলা কঠিন। যুক্তি তাদের খুব সরল "লাল ঝাণ্ডার নির্দেশে আমরা এখানে এসেছি—আবার লাল ঝাণ্ডা আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমরা যাই কি করে"? ১৫ ঘণ্টা ধরে পুলিসের গুলিচালনাতেও যাদেরকে ছত্রভঙ্গ করা যায়নি তারাই আবার এইভাবে লাল ঝাণ্ডার একটি মাত্র কথাতেই ফিরে যেতে রাজী হল। কিন্তু যখন তারা ফিরতে লাগল, যে প্রবঞ্চনা, যে চাতুরি তাদের উপর করা হয়েছিল যার ফলে তাদের পাঁচটি সংগী মৃত্যুর কবলে চলে গেল, সেই চিন্তা তাদের মনের মধ্যে গভীরভাবে দাগ কেটে বসে গেল—একটা লাল টকটকে ক্ষত সৃষ্টি করল, ক্রোধের আগুনের শিখাটা মনের গভীরে অনির্বাণ জ্বলতে থাকল।

সরকার নিজেদের এই স্বেচ্ছাচারী দমন-ক্রিয়াকে সমর্থন করতে গিয়ে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা সৃষ্টির অভিযোগ নিয়ে এল। তাদের বক্তব্য—হাজার হাজার সশস্ত্র আদিবাসী তাদের প্রতি পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করেছিল। এই প্রসংগে, ১৯৪৫ সালের ২৫ শে অক্টোবর "বোম্বে ক্রনিকল" পত্রিকায় আদিবাসী সেবা মণ্ডলের একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ে সেবা মণ্ডল ছিল কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট, বর্তমানে তা সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট। তাতে জানা যায়: "গুলি চালনা যুক্তিসংগত হয়েছিল কি না অথবা এটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল কি না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত করে কিছু সিদ্ধান্ত করতে পারছি না। তবে এটা অবশ্য পরিষ্কার যে, পুলিস

ভ্যান গাড়ির ছাদ থেকে গুলি চালিয়েছিল, আর সে গাড়িটা তখন এক ধরনের সাঁজোয়া গাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। অপর দিক থেকে পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ থাকলেও পাথরের আঘাতে কোন পুলিস আহত হয়েছে কি না তা জানা বা শোনা যায়নি। আমাদের আশংকা—নির্বিচারে, বেপরোয়াভাবে গুলি চালানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করি ঘটনাটি নিয়ে নিরপেক্ষ ও খোলাখুলি ভাবে একটি তদন্ত হওয়া উচিত।"

সরকারী পর্যায়ে, গুলি চালনার ঔচিত্য অনৌচিত্য নিয়ে কোন তদন্ত করা হয়নি। বিভাগীয় পর্যায়ে যে তদন্ত হয়েছিল, তাতে না কি তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে গুলি চালনা অনুচিত হয়েছে। তৎকালীন প্রচারিত একটি দৈনিক পত্রিকা "চিত্রা"য় প্রকাশিত তথ্য থেকে এ সংবাদ জানা গিয়েছিল।

গুলি চালনার পর বল্গাহীনভাবে দমন-পীড়ন চালানো হল। লাঠি বা ঐ জাতীয় জিনিস নিয়ে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল পুলিস, পাঁচের অধিক লোক এক জায়গায় একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ হল। কমরেড দলভি ও তার সংগে আরও চার পাঁচ জন নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং প্রায় একশ পঁচিশ জন আদিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হল।

১১ তারিখ সকালে কমরেড কাস রণদিভে কল্যাণে আমাদের বাড়িতে এসে কমরেড পারুলেকর ও আমার কাছে গুলি চালনার সংবাদ জানালো।

৯ই অক্টোবর পর্যন্ত এলাকায় ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সরকার পক্ষে জেলা কালেক্টর ওয়ারলিদের জমি ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ঐ ৯ই অক্টোবর। আমি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। সরকারী মতেই পরিস্থিতি তখনো পর্যন্ত স্বাভাবিকই ছিল।

মিটিং বা জনসভার সংবাদ একেবারে নির্জলা মিথ্যে গুজব। এমন কোন সভার পরিকল্পনা ছিল না। আমি তখন কল্যাণে অসুস্থ। আমাদের কর্মীরা তখন খুবই ব্যস্ত, গ্রামে গ্রামে ঘুরে আগামী নির্বাচনের জন্য ভোট দানে উপযুক্ত আদিবাসীদের নাম নথিভুক্ত করাচ্ছে এবং ভোটার হওয়ার আবেদনপত্র পূরণ করিয়ে নিচ্ছে। গুলি বর্ষণের সংবাদে আমরা তো হতবাক্, স্তম্ভিত। জমিদারদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত-জালের কথা না জানতে পারা পর্যন্ত এ ধরনের মর্মন্তুদ ঘটনার পিছনে সঠিক কারণ যে কী তা বুঝতেই পারছিলাম না। তাতে আমরা সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করলাম।

১১ই অক্টোবর কমরেড পারুলেকর বোম্বাই-এর তৎকালীন 'মিল্ক কমিশনার' শ্রী এম. ডি. ভাটের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। তার মর্ম

হচ্ছে যে তিনি উম্বরগাঁও ও দহানু তালুকের অদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের উভয়ের সংগেই আলোচনায় বসতে চান। কারণ ঐ পরিস্থিতিতে বোম্বাই শহরে ঘাস সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। 'ঘাস-কাটাই'-দের ঐ ধর্মঘটের ফলে বোম্বাইতে ঘাস সরবরাহ ব্যবস্থার মারাত্মক অবনতি হয়েছে আর তারই জের ধরে দুধ সরবরাহ কাজেও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

১২ তারিখে আমরা শ্রীভাটের সংগে দেখা করলাম। উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য চেষ্টা চালাতে তিনি অনুরোধ করলেন। ঐ অঞ্চলে অত্যাচার, দমন-পীড়নের যে নতুন নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই কথা ও আমাদের গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতার কথাও তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন "এ ব্যাপারে কী করা যায় আমরা দেখছি, আপনারা এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ুন। একটা সমঝোতা করুন। এটা আমাদের অভিপ্রায় যে তারা যে কোন একটা চুক্তিতে আসুক—যাতে আর কাল-বিলম্ব না করে ঘাস কাটাই-এর কাজ আরম্ভ করা যায়।" তিনি যা বললেন তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে নিয়ে আমরা ১৩ তারিখে সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়লাম। বোম্বাইতে দুগ্ধ পরিস্থিতি এমনই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে আমাদের আলাপ আলোচনা যাতে খুব দ্রুত গিয়ে শুরু করতে পারি তার জন্য সঞ্জনের মত একটা ছোট্ট অখ্যাত স্টেশনেও গুজরাট মেলকে থামিয়ে দেওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সঞ্জনে নামার সংগে সংগেই আমরা দমন ক্রিয়ার প্রথম সাক্ষ্য প্রমাণের আস্বাদ পেলাম। পুলিসের প্রকাশ্য নির্দেশ অনুসারে কোন টাঙ্গাওয়ালাই আমাদের নিতে চাইল না। তারপর যখন তারা শুনল যে বিশেষ করে আমাদের নামিয়ে দেওয়ার জন্যই গুজরাট মেল বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সঞ্জনে থেমেছিল, তখনই তারা আমাদের জন্য টাঙ্গার ব্যবস্থা করল।

থানা জেলার কালেক্টর গুলি চালনার পর সঞ্জনে এসে হাজির হয়েছিলেন। ১৪ তারিখে শ্রীযোগি দবিয়ারওয়ালার সঞ্জনস্থ বাংলো বাড়িতে গিয়ে আমরা জেলা কালেক্টরের সংগে দেখা করলাম। সভায় সশস্ত্র ভাবে আদিবাসীদের উপস্থিত করানোর পিছনে ভূস্বামীদের যে চক্রান্ত ছিল সে সম্বন্ধে যতটুকু আমরা জানতাম তা তাঁকে জানালাম। অপরপক্ষে জমিদাররাও তাকে অনুরোধ জানাল থানা জেলা থেকে আমাদের উপর বহিষ্কারের আদেশ জারি করার জন্য।

কালেক্টর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ধর্মঘটের মীমাংসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি ভূস্বামীদের তরফ থেকে শ্রী দবিয়ারওয়ালা, শ্রীদেবদেকর ও শ্রী পেথেকে আহ্বান জানালেন, আর কিসানসভার পক্ষ থেকে ডাকলেন কমরেড

পারুলেকর ও আমাকে। জমিদারপক্ষের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব হলো "আমরা কিসান সভা-টভা মানি না. আর কিসান সভার প্রতিনিধি হিসাবে তাদের সংগে কথাবার্তা বলতে মোটেই আগ্রহী নয়।" কালেক্টর, শ্রীবেদেকর শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন। "তাহলে আপনারা আমার সংগে কথা বলুন এবং তারাও আমারই সংগে কথা বলবেন।" প্রতি ৫০০ পাউন্ড ঘাসের জন্য ২ টাকা ৫০ পয়সা ও ৩ টাকার দাবি আমরা কালেক্টরের কাছে রাখলাম। বস্তুনিষ্ঠ হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করলাম যে, আমাদের দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত। ১ টাকা ৫০ পয়সার বেশি দিতে জমিদাররা রাজী হল না। কোন রকম সমঝোতায় আমরা আসতে পারলাম না, আলোচনা বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

আলোচনা বৈঠক ভেঙে যাওয়ার সংগে সংগেই দমন-পীড়নের মাত্রা আবার কুৎসিত আকার ধারণ করল। ১৯৪৫ সালের ১৫ই অক্টোবর কমরেড পারুলেকর ও আমাকে এবং আরও কয়েক জন কমরেডকে থানা জেলা থেকে বহিষ্কার করা হল। সেখান থেকে চলে আসার আগে আদিবাসীদের কাছে এই মর্মে এক বার্তা পাঠিয়ে দিলাম, "তোমরা সব ঐক্যবদ্ধ থাক। উদ্যম হারিয়ে ফেল না। ২ টাকা ৫০ পয়সা ও তিন টাকা মজুরি না দেওয়া পর্যন্ত কাজে যাবে না।" এই নির্দেশ নিয়ে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল সে ফিরে এসে রিপোর্ট করল যে, ওয়ারলিদের মনোবল অটুট, উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর এবং তারা কৃতসংকল্প। তারা এমনই সতর্ক ছিল যে, কোন দালাল শ্রেণীর লোককে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে যাতায়াত করতে দেখলেই তারা তাকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মনোভাবের লোক বলে সন্দেহ করত এবং তার গতিবিধির উপর সদা সতর্ক নজর রাখত। এমনই তাদের মনোবল যে, ধর্মঘট ভাঙার জন্য জংগলের মধ্যেও কেউ তাদের ছায়া ফেলতে সাহস করত না।

আমাদের বহিষ্কারের আদেশ ছিল সম্পূর্ণ বে-আইনী। পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট শ্রীশারিফ খান্ শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সেই আদেশ বাতিল করতে বাধ্য হল।

ভূস্বামীদের অভিপ্রায় ছিল—আমাদের নামে প্রচারিত একটি কল্পিত আদেশে আদিবাসীদের সশস্ত্র করে তাদের সেই কাল্পনিক সভায় উপস্থিত করা, পুলিসের গুলি চালনার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা, তারপর তাদেরকে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য তাদের ওপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া, আমাদের বহিষ্কৃত করা এবং সেই বহিষ্কারের আদেশ রদকরণের আগেই অত্যাচার চালিয়ে আদিবাসীদের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করা। পরিকল্পনাটা বেশ সাফল্যের সংগেই কার্যকরী করা হয়েছিল, কিন্তু আশানারূপ ফল

লাভ হল না। ধর্মঘট ভংগকারীরা ব্যর্থ হল। ভূস্বামীদের সমবেত প্রচেষ্টা শক্তি ও সম্পদ-পুষ্ট হয়েও প্রতিটি আক্রমণ তাদের বিরুদ্ধে একেবারে পৌরুষহীনরূপে প্রমাণিত হল। শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার বদলে চক্রান্তের এই শাণিত অস্ত্র আক্রমণকারীর পক্ষেই বুমেরাং হিসেবে দেখা দিল।

আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে আদিবাসীদের উপর এমন বীভৎস সন্ত্রাস চালানো হয়েছিল যে, তা শুনলে যে কোন বিবেকবান মানুষ লজ্জায় মুখ লুকোতে বাধ্য হবে। যে সব আদিবাসী জমিদারদের কাছে অনভিপ্রেত বলে বিবেচিত হত, তাদের নামের তালিকা পুলিসকে দেওয়া হল, তাদের গ্রেপ্তার করানো হল। কংগ্রেস দলের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে পরিচালিত আদিবাসী সেবা মণ্ডল ২৫-২৬ তারিখের বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকায় নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রকাশিত করেছিল ঃ

"আমাদের কাছে এই অভিযোগ আছে যে, ভূস্বামীরা সেইসব প্রজাদের নামের তালিকা তৈরি করেছিল—যারাই তাদের কাছে বিপজ্জনক বা অস্বস্তিকর বলে মনে হত এবং সেই তালিকা পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হত তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য। আদিবাসীরা ঐসব ভূস্বামীদের নাম আমাদের কাছে উল্লেখ করে গেছে। গুলি চালনার ঘটনার পর আশপাশের গ্রামের লোকেরা এমনই আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে তারা তাদের কুঁড়েঘরগুলো ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়ে জংগলের মধ্যে আত্মগোপন করেছে—এও আমরা দেখেছি, দশ বারো দিন যাবৎ তারা অনাহারে কাটাতে বাধ্য হয়েছে, নিজেদের আঘাতের কথাও বলতে তারা ভয় পায়, নিজেদের মতামত জানাতে চায় না তারা।

"তাদের ভয় যে, কোন রকম ঘটনা জানাতে যে কেউ এগিয়ে আসবে তাকেই গ্রেপ্তার করা হবে এবং তাদের এই আশংকাও মোটেই ভিত্তিহীন নয়।"

সন্ত্রাসের বল্গাহীন রাজত্বকালে জমিদারের গোলাবাড়িগুলোকে পুলিস তাদের প্রধান কার্যালয়রূপে ব্যবহার করত!

ধানোরী গ্রামে বুরুজোর নামে এক জমিদারের জমি, ক্ষেতখামার ও গোলাবাড়ি ছিল। ইন্সপেক্টর সালভি এবং অন্যান্য পুলিস সেই জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছিল। একদিন জেহাংগী প্যাটেল, সুকুন্দচাঁদ মাড়োয়ারী এবং ধানোরী গ্রামের প্রধান পুলিস বুরুজোর শেঠের বাড়িতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের আদিবাসীদের ডেকে পাঠাল। তাদেরকে ডেকে পাঠানোর সুস্পষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে তাদের বিরুদ্ধে বে-আইনীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অভিযোগের সত্যতা অনুসন্ধানের অছিলায় আদিবাসীদের প্রচণ্ড মারধোর করা হল। নানহু ঘরাট নামে একজন আদি-

বাসীকে মারতে মারতে একেবারে সংজ্ঞাহীন করে ফেলা হয়, তার প্রায় মরার অবস্থা হয়ে যায়। নানহুকে ২২শে অক্টোবর বুরজোর শেঠের বাড়িতে ডেকে পাঠানো হল। আসার পথে তাকে ছড়ি দিয়ে পেটানো হয় তারপর বাড়ির অংগনের ভিতরে এনে একটা মোটা কাপড়ে চারটে পাথর বেঁধে তাই দিয়ে তার হাত, পা, তলপেট, পিঠে ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রচণ্ড প্রহার করা হল। মারের আঘাত যাতে দেহের উপর না ফুটে ওঠে সেই দাগ প্রতিহত করার জন্য কাপড়ে পাথর বেঁধে মারা হত। তার কানের উপর প্রচণ্ড ঘুষি মারা হল। প্রাণভরে মারার পর তাকে নুইয়ে দাঁড় করিয়ে তার লাঙ্গোটি খুলে ফেলা হল। তারপর তার দেহের পিছন দিকে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে একটা জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল নানহু। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরও প্রহার-পর্ব চলতে লাগল। এহেন জঘন্য ঘটনা পুলিস ইনসপেক্টর ও দলের অন্যান্য পুলিসের চোখের সামনেই ঘটানো হল। জ্ঞান থাকার সময় নানহু বারবার ইনসপেক্টরকে কাতরস্বরে মিনতি জানিয়েছিল, "হুজুর, আমার বাপ-চৌদ্দপুরুষে কোনদিন আমাদের কোন বন্দুক ছিল না, আমাকে আপনি মেরে ফেললেও আমি আমার ঘর থেকে একটাও বের করতে পারব না"। সারারাত ধরে সেই উঠানে নানহুকে ফেলে রাখা হল। একটু খাবার, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেওয়া হল না। নানহু বুরজোর শেঠকে বলতে শুনেছিল—সে দারোগা সাহেবকে বলছে, "এ আর এমন কি দাওয়াই হল, এ যথেষ্ট নয়। লাঠিটা যদি পাছার [illegible] মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হত, তাহলে একটা কেন, দুটো পর্যন্ত বন্দুক বেরিয়ে আসত"। পরের দিন নানহু আর চলতে পারল না। যে পুলিসগুলো নানহুকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল তারাও সমবেদনার সুরে পরস্পর বলতে লাগল, "এমন পাপ করে ও লোকগুলো ক্ষমা পাবে কোথায়?"

পুলিসের উপস্থিতিতেই ভূস্বামীরা লাড়কিয়া তামুবড়ার বুকের উপর ঘুষির পর ঘুষি চালাল, তাকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে আগাপাছতলা পিটলো। চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তুলে বনবন করে ঘোরাল। হীরা রামজীকে মেরে একেবারে তুলোধুনো করে ফেলল। ওসারবীরার ইয়ানসিয়া জুনিয়া শনি-ওয়ারীকে মারধোর করা হল, কারণ হচ্ছে, যে সভায় সে গিয়েছিল সেই সভায় যে ভাষণ দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক বিবরণ সে দিতে পারেনি। পসরিয়া রামা শানিওয়ারকেও সভায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রহার করা হল। কানহিয়া তানহিযা ঘরাটের স্ত্রী তাকে বাঁচাতে এসেছিল বলে তাকেও বাদ না দিয়ে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হল। লাড়কিয়া হোলিয়াকে দুদিন না খেতে দিয়ে উপোসী

রেখে তারপর তাকে পিটন দেওয়া হল। মারতে মারতে গজ গজ করতে লাগল, "তুই তো ব্যাটা জঙ্গলের রাজা হয়েছিস, তাই না? ব্যাটা লাল ঝাণ্ডা-ওয়ালা হয়েছ?" শেঠ মহারাজ কোমরের বেল্ট খুলে নিয়ে তাই দিয়ে নির্দয়ভাবে পিটতে লাগল লাড়্‌কিয়া নৌসিয়া মোরঘাকে। চণ্ডমূর্তিতে গর্জন করতে লাগল, "আজ আমি সাহেব! আমাকে আজ শেঠজী বলবি না! তোকে পেটানোর জন্য সরকার আমাকে আদেশ দিয়েছে"। সত্তর বছরের বৃদ্ধ চৈত্য হাণ্ডেয়াকে প্রহার দেওয়া হল—তার অপরাধ তার ছেলেদের লাল ঝাণ্ডার সভায় যেতে কেন নিষেধ করছে না।

দেবজী রূপজী পাঠেরার বিশ বছরের একটি মেয়ে ছিল, তার নাম লক্ষ্মী। তাকে বলা হল, "তোর বাবার কাছে যে বন্দুক আছে, সেটা বের করে নিয়ে আয়, আমাদের দিয়ে দে"। লক্ষ্মী বলল, "আমার বাবার কাছে বন্দুক আছে কি না, আমি আদৌ কিছু জানি না"। এই কথায় পুলিস তাকে বারবার গর্দান ধরে উপরে তুলে মাটিতে আছাড় মারতে লাগল। তাকে 'বে-ইজ্জত' করার হুমকিও দিল। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল সে, তখন ছাড়া পেল। আম্বলী গ্রামের ঠামী নামে একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে আসা হল। তার অপরাধ—সে তার বাবাকে গ্রেপ্তার এড়ানোর ব্যাপারে সাহায্য করত। পরণের শাড়ির একাংশ টেনে খুলে ফেলে তাকে বলাৎকারের ভয় দেখানো হল, শরীরের ভিতরে বন্দুকের সঙ্গীন ঢুকিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার হুংকারও বাদ গেল না।

১৫ই অক্টোবর থেকে ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত এইভাবে চলছিল জমিদার ও পুলিসের যৌথ উলংগ নৃত্য, হিংস্র নিষ্ঠুর অত্যাচারের অবাধ লীলা। পুলিসের খাতায় নাম উঠিয়ে দেবে জমিদাররা, তারপর চলবে ধরপাকড় ও চরম অত্যাচার—এই আতংকে বেশ কিছু ওয়ারলি জংগলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

জমিদাররা মশগুল হয়ে স্বপ্ন দেখেছিল যে, অমানুষিক দমন-পীড়নের যাঁতাকলে ওয়ারলিদের পিষে মারছি, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আতংকগ্রস্ত হয়ে নিশ্চয়ই তারা আত্মসমর্পণ করবে, ধর্মঘট তুলে নেবে! হয়তো ধরেও নিয়েছিল, "ব্যাটাদের এমন শিক্ষাই দেব যে দু-এক দিনের মধ্যেই কাজে ফিরে আসতে পথ পাবে না।"

কিন্তু শত-শতাব্দীর ঘুমঘোর থেকে জেগে ওঠা ওয়ারলিরা ভূস্বামী-প্রভুদের এমন সোনার স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। তাদের ঐক্য, তাদের স্থির সংকল্প ছিল অটুট, দুর্জয় তাদের মনোবল, দুর্বার সাহস। জঙ্গলের একটি ঘাসের পাতাও কাটা গেল না তাদের দিয়ে।

প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তারা পালিয়ে এসে বোম্বাইতে আমার সংগে দেখা করে তাদের দুঃখ যন্ত্রণা, অত্যাচার নিপীড়নের হৃদয়-বিদারক কাহিনী শুনিয়ে যেত। বোম্বাই-এর সংবাদপত্রগুলো ভূস্বামীদের এই নারকীয় অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়ে প্রচণ্ড সহায়তা করেছিল। বিশেষ করে "ফ্রি প্রেস জার্নাল" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী নটরাজন এবং 'সেন্টিনেল' পত্রিকার শ্রী হরনিমানের উজ্জ্বল ভূমিকা খুব সহায়ক হয়েছিল। এই সব প্রচারের ফলে ৯৩ ধারা বলে সরকারী প্রশাসনের উপর জনমতের প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল।

ঘাসের অভাবে বোম্বাই শহরে দারুণ সমস্যা সৃষ্টি হল। জমিদাররা ভাবনায় পড়ে গেল—এভাবে চলতে থাকলে যত দিন যাবে ঘাসের গুণগত মান নিম্নগামী হয়ে যাবে, বেশী দিন থাকলে ঘাস শুকনো হয়ে যাবে, তখন ভালো দাম মোটেই পাওয়া যাবে না। আর যদি নাই কাটা যায় তাহলে হাজার হাজার টাকার ক্ষয়-ক্ষতির বোঝা ঘাড়ে চাপবে। যতদিন না ওয়ারলিদের উপর থেকে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়—ততদিন পর্যন্ত একটি ঘাসের পাতাতেও হাত লাগাতে অস্বীকার করল ওয়ারলিরা। সম্পূর্ণভাবে মনোবল ভেঙে পড়ল ভূস্বামীদের, ওয়ারলিদের নতজানু করার স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পরিস্থিতি বাধ্য করল সরকারকে অবস্থা পুনর্বিবেচনা করার জন্য। আমাদের বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহৃত হল এবং বন্দী সহকর্মীরা মুক্ত হল।

বিজয়ীর বরমাল্যে ভূষিত হল আদিবাসীরা। আনন্দোচ্ছ্বাস কূল ছাপিয়ে উঠল। আরও ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকায় ভূস্বামীরাও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দিল কে কত বেশী মজুর লাগাতে পারে। কিসান সভার মজুরির দাবি ছিল আড়াই টাকা ও তিন টাকা। কিন্তু আরও বেশী সম্ভাব্য ক্ষতিকে যদি কমাতে হয় তাহলে দ্রুত গতিতে ঘাস কাটার ব্যাপারটা অবশ্যই নিশ্চিত করে ফেলতে হবে; তাই সেই সমস্ত ভূস্বামীরাই, যারা দেড় টাকা মজুরির এক পয়সাও বেশি দিতে রাজী হয়নি, তারাই এখন সাড়ে তিন টাকা ও চার টাকা, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে সাড়ে চার টাকা পর্যন্ত দিতে লাগল। স্বভাবতই, এখন এত বেশী মজুরি দিলে ঠিকমত পড়তা হবে কি হবে না—সে প্রশ্ন অবান্তর বলেই মনে করল। এইভাবে শেষপর্যন্ত নতজানু হয়ে হার মানল ভূস্বামীরাই, ওয়ারলিরা নয়।

বিজয়ের পথে আমরাও অংশগ্রহণ করেছিলাম; তাই আমরা, কর্মীরাও আদিবাসীদের আনন্দের আস্বাদে তৃপ্ত হলাম। পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কাহিনী

শুনতে শুনতে যে মনটা আমার পাথর হয়ে গিয়েছিল, সেই মনটাও ধীরে ধীরে আবার সজীব হয়ে উঠল। কমরেড পারুলেকরের চোখ দুটোতে আনন্দাশ্রু চক্‌চক্‌ করতে লাগল।

শ্রেণী সচেতন সংগঠন এবং জনগণের সুদৃঢ় ঐক্যই যে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, যে হাতিয়ার তাদের বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে আনে—এই অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্যে পুনর্বার সমৃদ্ধ হয়ে উঠল আদিবাসীরা। কিন্তু বিজয়ের আনন্দে উন্মত্ত হল না তারা। ভবিষ্যতের কর্মপন্থার পবিত্র অংগীকার গ্রহণ করল। কল্লোলিত বিজয় অর্জনের সমস্ত সম্মান, সমস্ত গৌরব একমাত্র লাল ঝাণ্ডার আদর্শে পরিচালিত আদিবাসীদেরই শিরোপা হওয়া উচিত।

নবম অধ্যায়

আর এক কদম এগিয়ে

আদিবাসী সেবা মণ্ডলের ১৯৪৫-৪৬ সালের রিপোর্টে জানা যায়—"আদিবাসীরা আর মোটেই জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার-নিপীড়নের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী নয়। তারা এখন উপলব্ধি করতে পেরেছে যে সংগঠনই হচ্ছে তাদের শক্তির মূল চাবিকাঠি"।

১৯৪৬ সালের ২১শে জানুয়ারি কিসান সভা উম্বরগাঁও ও দহানু তালুকের কৃষকদের এক বিশাল জনসভায় আহ্বান জানাল মহালক্ষ্মী গ্রামে। উদ্দেশ্য—আন্দোলনের ভবিষ্যত রণনীতি নির্ধারণ করা। লাল ঝাণ্ডার সভা কেমন হয়—সঠিকভাবে তাই পর্যবেক্ষণ করার অদম্য কৌতূহল নিয়ে জওহর এবং পালঘর তালুকের বেশ কিছু কৃষক মহালক্ষ্মীতে এসে উপস্থিত হল। সভায় যোগদানের জন্য কোন কোন আদিবাসী প্রায় ৫০ মাইল দূর থেকেও পায়ে হেঁটে এসেছিল। জমিদার-মহাজনদের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-বিজয়ী, উৎফুল্লচিত্ত প্রায় ১৫ হাজার আদিবাসী সেই জনসভায় উপস্থিত হয়েছিল। এই প্রথম বার আদিবাসীরা পার্টি-তহবিলে হাজার হাজার টাকা দান করল। সেই থেকে আদিবাসীরা উদার হস্তে প্রতি বছর কমিউনিস্ট পার্টির তহবিলে চাঁদা দিয়ে আসছে। জেলা থেকে আমরা বহিষ্কৃত হওয়ার পর কমরেড দেব পার্টি তহবিলের ৯০০ টাকা চাঁদা জনৈক আদিবাসীর কাছে রেখে এসেছিল। সেই আদিবাসীটি বোম্বাইতে পার্টি অফিসে এসে সযত্নে সেই টাকা আমার হাতে অর্পণ করে গিয়েছিল।

মহালক্ষ্মীর জনসভায় দুটি প্রধান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

জমিদারের দেওয়া জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের জমিদার-প্রাপ্য "খন্দ" বা খাজনার সমস্ত হিসাব ভূস্বামীরা বেশ নিপুণভাবেই রাখত। বছরে বছরে জমে গেছে অনেক খাজনা—এই অজুহাত তুলে প্রতি বছরই সব সময়েই তারা কিছু কিছু বকেয়া দেখিয়ে রাখত হিসাবের কারচুপি করে। সাজানো বকেয়ার অংশ এবং সেই সংগে বকেয়া সঞ্চিত থেকে যাওয়ার শাস্তিস্বরূপ আরও কিছু খাজনা প্রতিবারই এইভাবে কৃষকরা দিয়ে আসত। বকেয়া হিসাবের কারচুপির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, যত বেশী পরিমাণ সম্ভব উৎপন্ন ধান কৃষকের কাছ

থেকে কায়দা করে আদায় করে নেওয়া। কিন্তু কি পরিমাণ ধান তারা শোধ দিল তার রসিদ কোনদিনই তারা পেত না। সুতরাং পরের বারে আবার খাজনার হিসাবের সময় মিথ্যা বকেয়ার বোঝা গরিব কৃষকদের ঘাড়ে জমিদাররা খেয়াল-খুশী মতো চাপিয়ে দিত—বোঝার চাপে তারা যাতে একেবারে নুয়ে পড়ে। কৃষকরা কোনদিনই বুঝতে পারত না—উৎপন্ন ধানের প্রায় সবটুকু দিচ্ছে, পরিণামে তারা প্রায় অর্ধভুক্ত অবস্থায় কাটাচ্ছে, অথচ জমিদাররা কেমন করে এমন অত্যধিক বকেয়ার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। সন্দেহ জাগল তাদের মনের মধ্যে, জমিদাররা নিশ্চয়ই মিথ্যা ও সাজানো হিসাব রাখছে, কোথাও না কোথাও একটা গড়বড় আছে হিসাবের মধ্যে, তাদেরকে খোলাখুলিভাবে ঠকাচ্ছে। কিন্তু এর থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি করে, সেই পথের সন্ধান তারা খুঁজে পাচ্ছিল না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভূস্বামীরা খাজনা হিসাবে শুধু যে ধান চাইত তাই নয়, আদিবাসীদের জমিতে উৎপন্ন অন্যান্য ফসলেরও ভাগ চাইত ; যেমন নানা-জাতীয় ডাল ও সব্জি, নিজেদের পোষা মুরগীর ডিম, নিজেদের জমিতে লাগানো গাছের তেঁতুল, আম, করীন্দা ইত্যাদি। এসব দাবি পূরণ করতে যদি তারা অসমর্থ হত, তাহলে তার শাস্তিস্বরূপ আরও বেশী পরিমাণ খাজনা দিতে বাধ্য করা হত। এইভাবে ক্রমবর্ধমান বকেয়ার বোঝা তাদের ঘাড়ে চেপে বসত। মহালক্ষ্মীর জনসভায় এই ধরনের খাজনা প্রথার প্রসংগে প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, শক্তি-সামর্থ মতো খাজনা দেওয়ার পর বাকী-বকেয়া সমস্ত বাতিল করতে হবে। এই বার্তাকে স্লোগানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল—তা হচ্ছে—"পূর্ববর্তী তিন বছরের স্বীকৃত খাজনার উপর বর্ধিত অংশ দিচ্ছি না, দেব না। পুরানো বকেয়া দিচ্ছি না, দেব না"।

ঐ একই সমস্যাকে লক্ষ্য রেখেই দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হল। সিদ্ধান্ত হল যে খাজনা হিসাবে শুধু মাত্র ধানই দেওয়া হবে। অন্য কোন ফসল যেমন, শাক্-সব্জি, তেঁতুল, আম ইত্যাদি দাবি করা চলবে না।

এই প্রস্তাবগুলি কৃষকরা অক্ষরে অক্ষরে কার্যে রূপ দিল। সমস্ত মিথ্যা-সাজানো বকেয়ার ধূম্র জাল শূন্য আকাশের গর্ভে বাতাসে মিলিয়ে গেল। বছরের পর বছর ধরে তারা যে ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, জনসভায় এই ভাবে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং সেই সিদ্ধান্তের অনুমোদনের জন্য ব্যাপক সাধারণ কৃষকের কাছে প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়ে, সেই আকাঙ্ক্ষিত ফল তারা হাতে হাতেই পেয়ে গেল। আর যার মধ্যে বিন্দু মাত্র সত্য ও ন্যায়বিচারের স্পর্শও নেই সেই সমস্ত বকেয়া পদ্ধতিটাই যেহেতু অসাধুতার একচেটিয়া

কারবার, তাই ভূস্বামীরা নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার পিছনে নিজেদের নৈতিক সাহস ও মনোবল হারিয়ে ফেলল এবং বিনা প্রতিবাদে পিছু হঠতে বাধ্য হল।

নতুন প্রস্তাবগুলো যাতে যথাযথভাবে রূপায়িত হয়—সে বিষয়ে আদিবাসীরা সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখত। জমিদার বা তার কোন দালাল খাজনা হিসাবে ধান ছাড়া অন্য কোন উৎপন্ন ফসল নিয়ে যাচ্ছে—এমন দৃশ্য তাদের চোখে পড়লেই তারা তাকে বাধা দিত। ফসল নিয়ে যাওয়া বন্ধ করত। এমন কি, কোন জমিদার এবং তার সর্দার হয়তো লুকিয়ে-ছাপিয়ে এমন কোন ফসল নিয়ে পালানোর গোপন চেষ্টা পাচ্ছে, দেখতে পেলেই তাকে আটকাত, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নাজেহাল করত। তারপর সমস্ত জিনিস মালিককে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করত। কোন কোন অত্যুৎসাহী আদিবাসী এই সব দুষ্কৃতকারীদের লাল ঝান্ডার কাছে সাষ্টাঙ্গ দন্ডবত করিয়ে, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে তবে ছাড়ত। আদিবাসীরা এত সহজে, এমন দ্রুততার সংগে জয়লাভ করতে পেরেছিল, তার কারণ—আইনত জমিদারদের দাঁড়ানোর মতো পায়ের তলায় কোন মাটি ছিল না। অপরপক্ষে আস্থায়, বিশ্বাসে ও উৎসাহে আদিবাসীরা ছিল একেবারে ভরপুর।

মহালক্ষ্মীর জনসভায় জওহর ও পালঘর তালুক থেকে যে সমস্ত কৃষকরা এসেছিল, তারাও আদিবাসীদের ঐক্যবন্ধ সংগঠনে সামিল হলো। উম্বরগাঁও ও দহানু তালুকের কৃষকরা যে সমস্ত দাবি লড়াই করে আদায় করতে পেরেছিল, তারাও সমস্তই নিজেদের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত করে নিল। তারাও ভেটিয়া ও দাস-প্রথার বিলোপ ঘটাল, খাজনার সমস্ত বকেয়া বাতিল করে দিল এবং শুধু ধানের মাধ্যমেই খাজনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। পালঘর তালুকের এই সমস্ত কৃষকদের অনুরোধেই আমি ১৯৪৬ সালের মে মাসে, সর্বপ্রথম সেখানে জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলাম।

আদিবাসীরা নিজেরাই তাদের আন্দোলনের ক্ষেত্রের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল। উম্বরগাঁও থেকে দহানু, তারপর দহানু থেকে পালঘর এবং জওহর। আমরা শুধু আমাদের সমর্থন দ্বারা সেই আন্দোলনকে পুষ্ট করেছিলাম। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাসগুলো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কিসান সভা ও পার্টি সংগঠন গড়ার কাজে লাগিয়েছিলাম। এই কাজে কমরেড পারুলেকর তার অমূল্য নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আদিবাসীদের জন্য তিনি পার্টি-শিক্ষা-ক্লাস নিতেন। সহজ সরল ভাষায় শিক্ষা-ক্লাসে পাঠ পরিচালনা করা হত। সব সময় তিনি কিন্তু তাঁর বলার আগে আমাকেই বলার জন্য জেদ করতেন। যেহেতু আমি সর্বদাই ওয়ার্লিদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতাম, সেজন্য তাদের সমস্যাবলী সম্পর্কে খুব নিকটতর পরিচিতি

ছিল আমার। সমস্যাকে কেন্দ্র করে আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার পাঠ দানের পর কমরেড পারুলেকর বিষয়টির উপর শক্তহাতে হাল ধরতেন। একদিকে আমরা কৃষকদের রাজনীতিগতভাবে শিক্ষিত-করণের কাজে ব্যস্ত থাকতাম, তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনার উন্মেষ ঘটানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতাম, অপরদিকে প্রতিদিন যে আইনগত, অর্থনীতিগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলি আদিবাসীদের মহামারীর মতো বিপর্যস্ত করে রেখেছিল, সেইগুলি সমাধানে সাহায্য করার জন্য কিসান সভার মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যেতাম। সে সময় আমাদের কার্যালয়গুলো সব সময় অসংখ্য মানুষের আনাগোনায় মৌমাছির চাকের মতো নানান কাজে গমগম করত—বহু দূরের গ্রাম গ্রামান্তর থেকে প্রতিদিন দলে দলে আদিবাসীরা আসত। আমাদের কাছে নিয়ে আসত নানা অভিযোগ, প্রতিবাদের কথা। আইন-আদালতে কাজকর্ম সাঙ্গ করে রাত্রিটা অফিসে কাটিয়ে পরদিন সকালে খুশী মনে, আত্মসম্মান-বোধে গর্বিত হয়ে বাড়ি ফিরে যেত।

দশহরা দেওয়ালীর পর ঘাস কাটাই ও ধান কাটাই-এর কাজ যেমন পুরো-দমে শুরু হয়ে যায়। প্রায় সেই সময়ই জঙ্গলে গাছ কাটাই-এর কাজও আরম্ভ হয় বেশ বিরাট আকারে। বেশীর ভাগ কৃষককেই বেগার প্রথায় কাজ করতে হত। মজুরদের মজুরি দেওয়া হত চার থেকে আট আনা করে, কখনো বা ঠিক এক আনা বা দু আনা মাত্র। কিসান সভা গাছ কাটাই-এর কাজে যুক্তি-সংগতভাবে মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিল। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে—১৯৪৫ সালে ঘাস কাটাই-এর জন্য যে মজুরি দেওয়া হয়েছিল, ১৯৪৬ সালেও সেই একই পরিমাণ মজুরি দিতে হবে। এর আগেই তো এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে পড়তা হচ্ছে কি হচ্ছে না—এটা আসল কথা নয়, জমিদাররা উক্ত হারে মজুরি দিতে পারে, এমন কি বেশীও দেওয়ার সাধ্য আছে তাদের। কারণ আগের বছরই দেখা গেছে যথাসময়ে কাজ শেষ করার জন্য যে মজুরি চাওয়া হয়েছিল, তার থেকেও বেশী মজুরি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে ঘাস কাটাই-এর কাজে বেশী বেশী মজুরকে প্রলুব্ধ করার জন্য তাদের কী প্রচণ্ড উদ্বেগ।

১৯৪৬ সালে কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও অনেক পরিবর্তন হল। "গভর্নর শাসনের" ৯৩ ধারা মতে গঠিত সরকার নাকচ হয়ে গেল। বোম্বাই রাজ্যে কংগ্রেস পার্টি তাদের মন্ত্রিসভা গঠন করল। আদিবাসী সেবা মণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বি.জি.খের হলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রীমোরারজী দেশাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। থানা জেলার কালেকটর শ্রী বেদেকরকে বদলি করা হল। তার জায়গায় এলেন ঐতিহাসিক বারদোলি সত্যাগ্রহ আন্দোলন-দমনের নায়ক

শ্রীআলমোলা। কংগ্রেস পার্টি ক্ষমতায় আসার সংগে সংগেই সাম্রাজ্যবাদের এই দালালটি হঠাৎ রং বদলে ফেলে কংগ্রেস সরকারের সমর্থক হয়ে উঠলেন।

আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলো ছোট ছোট পাহাড়ে ভরা, গভীর জংগলাকীর্ণ। সব থেকে ভালো জাতের সেগুণ গাছ এবং অন্যান্য উচ্চ মানের বড় বড় গাছ এই সব জংগলে প্রচুর দেখা যায়। জংগলগুলো কতগুলি 'সেকশন' বা 'ভাগে' ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলিকে বলে 'কুপ' (coupe)। জংগল-ঠিকাদাররা এই সব কুপগুলি নিলামে কেনে তারপর হাজার হাজার মজুর লাগায় কাজের জন্য। এই সব মজুররা গাছ কেটে সেগুলোর ডালপালা ছেঁটে পরিষ্কার করে তারপর গুণগত মান অনুযায়ী আলাদা আলাদা বাছাই করে গরুর গাড়ি বা ট্রাকে বোঝাই করে দেয়। জংগল কাটার পর জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সরকারের হাতে জংগল ফিরিয়ে দেয়। গাছ ফেলার জন্য তারা প্রথমে গাছের বেশ উঁচু জায়গায় সুবিধামত দড়ি বেধে দেয়, তারপর কাণ্ডের চারদিকে ঘুরে ঘুরে কুড়ুল দিয়ে চোটের পর চোট মারে। কাণ্ডটা যখন প্রায় কাটা হয়ে আসে, তখন সুবিধানুযায়ী গাছটাকে যেদিকে ফেলতে চায় সেদিকে দড়ি ধরে টানতে থাকে। কোন কোন মজুর পিস রেট বা ঠিকায় কাজ করে অর্থাৎ বিভিন্ন বেড়ের যেমন যেমন গাছ কাটে, সেই মতো গাছের সংখ্যানুযায়ী মজুরি পায়। এইভাবে ঠিকায় কাজ করলে মজুরি খুব কম কম পাওয়া যায়, আশা মতো পাওয়া যায় না, কারণ ঠিকাদাররা মজুরি হিসাব করার সময় গাছের মধ্যে ছোট বড়, মোটা সরু প্রভৃতি বাদ-বিচার করে না। কোন কোন মজুর দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে গাছ-কাটার কাজ করে।

১৯৪৬ সালে গাছের গুঁড়ি ও জ্বালানি কাঠের ব্যবসা—দুটোই বেশ তেজী ছিল। কাঠ ব্যবসার ঠিকাদাররা ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকার মুনাফা লুটত, অথচ মজুররা—যারা নাকি সবচেয়ে কঠিন কাজটুকু করে, তারা পেত দৈনিক প্রায় চার আনার মতো—তা সে যে হিসাবেই করুক না কেন—সে পিস্-রেট অর্থাৎ ঠিকায় হোক বা দৈনিক মজুরিতেই হোক। এই প্রসংগে বলতে গিয়ে শ্রী সীমিংটন তার রিপোর্টে বলেছেন, "দৈনিক মজুরির হার গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র চার আনায়। এমন কি ছয় থেকে আট জন মজুর যদি যুক্ত ভাবেও ঠিকায় কাজ করে, তবুও কাজ শেষে যেটা পায় তা মাথা পিছু ভাগ করলে তিন আনা করে পড়ে, কখনো বা তার থেকেও কম।" (অনুচ্ছেদ ৭৬)

জংগল কাটাই এর কাজ শুরু হওয়ার পর, ঠিকাদাররা আশেপাশেই সাময়িকভাবে থাকার জন্য 'ক্যাম্প' বা মণ্ডপ তৈরি করিয়ে নিত। সেখানে জংগল ঠিকাদাররা বা তাদের সর্দাররা থেকে সমস্ত কাজ দেখাশুনা করত।

তখনকার দিনগুলিতে ঐ সব ক্যাম্পগুলিই ছিল দমন-পীড়নের যন্ত্রজাল পরিচালনার কেন্দ্রস্থল। সর্দাররা মজুরদের প্রাপ্য সেই নামমাত্র মজুরি থেকেও ঠকিয়ে কিছু কাটছাট করে নিজেদের পকেট ভরাত। ঐ সর্দারদের অনুকম্পার ঠ্যালায় পিপাসা লাগলে এক ফোঁটা জল খাওয়ার বা ধূমপানের অবকাশও মিলত না তাদের। কাজের শর্তাবলী, কাজ করার পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে সর্দারদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের মধ্যে একটা প্রচন্ড অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল বহুদিন ধরে।

জঙ্গল কাটাই-এর জন্য কিসান সভা দৈনিক ১ টাকা ৪ আনা মজুরি দাবি করল। যে বিশাল পরিমাণ মুনাফার ফয়দা কাঠ ব্যবসায়ীরা ওঠায়, আর তার পিছনে মজুরদের যে কঠিন পরিশ্রমের পটভূমিকা থাকে, সে সব কথা বিবেচনায় রাখলে মজুরির ঐ দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য ও যথোপযুক্ত ছিল।

আর ঘাস কাটাই-এর জন্য আগের বছরের রেট অনুযায়ী একই রেটে মজুরি দাবি করা হল, অর্থাৎ জঙ্গলখণ্ডে ২ টাকা ৮ আনা এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে ৩ টাকা। ১৯৪৫ সালে যে রেট মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, ১৯৪৬ সালেও যে সেই রেট বিনা কৈফিয়তে তারা মেনে নেবে এ ব্যাপারে আমরা স্থির নিশ্চয় ছিলাম।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে জেলা কালেকটর শ্রী আলমোলা ঘাস মালিকদের প্রতিনিধি এবং কিসান সভার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা আলোচনা বৈঠকের আহ্বান জানালেন। উদ্দেশ্য ঘাস কাটার মজুরি নির্ধারণ করা। কমরেড পারুলেকর ও আমি বৈঠকে যোগদানের জন্য হাজির হলাম। গিয়ে শুনলাম বৈঠক স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে—এই-ভাবে আলাপ-আলোচনা চালাবার পুরো পরিকল্পনাই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সরকারী নীতিই এ বিষয়ে অনুসরণ করা হয়েছে—সে নীতি হচ্ছে কিসান সভার ও তাদের দাবিকে স্বীকৃতি না দেওয়া।

কিসান সভা জঙ্গল কাজের জন্য ১ টাকা ৪ আনা দৈনিক মজুরি দাবি করেছিল। পরিশ্রমের পরিমাণ, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য, ঐ ধরনের কাজের জন্য অন্যত্র যে পরিমাণ মজুরি দেওয়া হয়—এই সমস্ত বিষয়গুলি বিচার বিবেচনা করার পর, ১ টাকা ৪ আনার দাবি যেন ন্যায্য দাবির থেকেও কম বলে মনে হয়। এমন কি যেসব পরিবারের জীবন-যাত্রার মান সব থেকে এতো নীচু যে কল্পনাই করা যায় না, সেই রকম একটি পরিবারও ঐ মজুরি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে বলে আশা করা যায় না। তবুও কোটি কোটি টাকার মুনাফা শিকারী ঠিকাদারের দল এই সামান্য মজুরিটুকু দিতে চায় না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গাছ কাটার জন্য দৈনিক ১ টাকা মজুরি ঘোষণা করলেন। এতে

করে পরোক্ষভাবে ঠিকাদাররা যে ১ টাকা ৪ আনা দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদেরকেই সমর্থন করা হল। ১৯৪৫ সালের থেকেও ১৯৪৬ সালে ঘাসের বাজার বেশী তেজী ছিল। ১৯৪৫ সালে কিসানসভা যা দাবি করেছিল, তার থেকেও উচ্চ হারে মজুরি দিয়েছে ঘাস মালিকরা। প্রয়াত শ্রী ওয়ানখ্রেকার তাঁর বক্তব্যে স্বীকার করেছিলেন যে, কিসানসভার দাবি খুবই যুক্তিসঙ্গত এত সব সত্বেও শ্রী আলমোলা ঘাস-কাটাই-এর জন্য প্রতি ৫০০ পাউণ্ড ঘাসে ১ টাকা ৮ আনা ও ২ টাকা মজুরি সরকারী রেট হিসাবে ঘোষণা করে দিলেন। একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিসান-সভার প্রভাবকে খর্ব করা। যারা এর থেকেও বেশী দিতে রাজী ছিল, তারাও ঘোষণার সুযোগে পিছু হটল। আদিবাসীরা এই কমিয়ে দেওয়া রেটে ঘাস কাটতে অস্বীকার করল। সুতরাং এই ব্যাপারটা আবার বাদানুবাদের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। কিসানসভা তৎক্ষণাৎ গাছ-কাটাই ও ঘাস-কাটাই উভয় ক্ষেত্রেই মজুরির দাবি মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট করার আহ্বান জানাল।

আদিবাসীদের সংহতি এমনই উচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল যে, তাদের সংগঠনের মধ্যে একটিও দুর্বল যোগসূত্র ছিল না। ফলে ধর্মঘটের আহ্বান জানানোর ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই মাইলের পর মাইল ব্যাপী জঙ্গল নিস্তব্ধ হয়ে গেল, জঙ্গলের সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আদিবাসীদের সাংগঠনিক তৎপরতা ও উচ্চমানের কর্মদক্ষতা দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। প্রায় অস্বাভাবিক বলেই মনে হল ব্যাপারটা। আঙুলের একটা মৃদু টানে মূল সুইচটা বন্ধ করে দেওয়ার সংগে সংগেই গোটা এলাকার সমস্ত আলোগুলো যেমন নিভে যায়, ঠিক তেমনিই দহানুতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সংগে সংগে হাজার যোজনব্যাপী জঙ্গল-এলাকার সমস্ত কাজ স্তব্ধ হয়ে গেল।

আদিবাসীদের খবর পাঠানোর পদ্ধতিটা বেশ চমকপ্রদ। একটা লাঠির মাথায় কয়েকটা তালপাতা বেঁধে দিল। তার সংগে আটকে দিল ধর্মঘটের খবর সম্বলিত ছোট্ট একটা চিঠি। রিলে পদ্ধতিতে লাঠিটা এক গ্রাম থেকে পর পর অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কোন গ্রামে লাঠিটা এসে পেঁছানোর সংগে সংগেই আশপাশের জঙ্গলগুলিতে কাটাই-এর কাজ দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে। আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ও নিষ্ঠার জন্যই এত অল্প সময়ের মধ্যে ধর্মঘট একেবারে সর্বাংশে সাফল্য লাভ করল। শুধু যে ঘাস কাটাই বন্ধ করে দিল তাই নয়, এমন কি অন্যান্য পণ্যদ্রব্য পরিবহনের জন্য গরুর গাড়ি চালানোও বন্ধ করে দিল। হরতাল সফল হতে দেখে তার মোকাবিলার জন্য সরকারী প্রশাসন যন্ত্রও নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল। জেলা কালেকটরের দপ্তর থেকে তালুক অফিসারদের কাছে সরকার ঘোষিত রেট অনুযায়ী কাজ

করানোর জন্য মানুষকে প্রলুব্ধ করে কাজ করতে রাজী করানোর উদ্দেশ্যে প্রচার-সভা অনুষ্ঠান করার নির্দেশ চলে গেল। ১৯৪৬ সালের ২২শে অক্টোবর মামলাতদার (ম্যাজিস্ট্রেট) একটা সভা আহ্বান করলেন। কেউই এল না। এই ধরনের সমস্ত সভা 'বয়কট' করা হল। অবশেষে সরকারী অফিসাররা হতাশ হয়ে পড়লেন, পরম বৈরাগ্যে সভা করার পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন। কোন সভা আর হল না।

গরুর গাড়ি না চালানোর সিদ্ধান্ত এটা কিন্তু আদিবাসীদের প্রতিবাদ ঘোষণার একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা। ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, জমির মালিক সকলেই তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে গাড়ি চালু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করল। যুক্তি দেখাল—কিসান সভা তো গাড়ি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়নি। রেশন দোকান থেকে রেশন নেওয়ার সময় পারমিট না থাকলে যেমন রেশন পাওয়া যায় না, সেই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই আদিবাসীরাও তাদের তেমনি হাঁকিয়ে দিয়ে বলল—আগে কিসান সভার অফিস থেকে ন্যায্য-হারে গরুর গাড়ি ভাড়া করার অনুমোদন-পত্র নিয়ে আসতে হবে, তারপর গাড়ি ভাড়া দেওয়ার কথা ভেবে চিন্তে দেখা যাবে ও গাড়ির চাকা ঘুরবে।

এই সময়ে আমি একবার কোন কাজে দহানুতে আমাদের পাতিলের বাড়ির অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি কমরেড কামা রনদিভে মেঝের উপর হাঁটু মুড়ে আড়াআড়ি করে বসে আছে, সামনে একটা টিনের তোরংগ, খুব ব্যস্ত-ভাবে এলোমেলো করে কি যেন লিখছে। লিখে কাগজের টুকরোগুলো ভূস্বামীদের হাতে দিচ্ছে—তারা সেখানে ভালোছেলের মতো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। বুঝতে পারলাম না কিসের জন্য তারা এমন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। তারা চলে যাওয়ার পর কমরেড কামা সব ব্যাখ্যা করে বোঝাল। কিসান-সভা কর্তৃক নির্দিষ্ট রেটে যে সমস্ত ঘাস-জমির মালিকরা মজুরি দিতে রাজী, তাদেরও ঘাস কেটে দিতে আদিবাসীরা অস্বীকার করেছে—যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা লাল-ঝাণ্ডার দপ্তর থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে গিয়ে তাদের দেখাতে পারে। আদিবাসীদের গরুর গাড়ি ভাড়া করতে গেলেও অনুরূপ অনুমতিপত্র দরকার। এইভাবে ভূস্বামীরা অনুমতিপত্র সংগ্রহের জন্য আমাদের অফিসে হামেশাই আসতে বাধ্য হচ্ছে। যে সব ভূস্বামী আর অহেতুক বেশী ক্ষতি স্বীকার করতে চায় না বা যার ক্ষতি হজম করার আর সাধ্য নাই, তারাই বাধ্য হয়ে কিসানসভার দাবি অনুযায়ী মজুরি দিতে রাজী হয়ে যাচ্ছে। রাজী হলে পর মজুর নিয়োগ করার অনুমোদন পাচ্ছে। এর সংগে একটা ঘোষণাপত্রও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে যে এইসব ভূস্বামীদের আদিবাসীরা ঘাস কেটে দিতে পারে।

ধর্মঘট বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই এগিয়ে চলেছিল। জমিদার মহাজনরা আগের বছরের মতো সেই পুরানো ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু করতে লাগল। কৃষকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা জুড়ে দিতে লাগল।

আবার একবার একটা মিথ্যা গুজব চারদিকে ছড়িয়ে দিল যে, আদিবাসীরা ১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর দিনটিকে কৃষক আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে "শহীদ-স্মৃতি-দিবস" রূপে পালন করার পরিকল্পনা করছে। সেই উপলক্ষ্যে তালওয়াদায় একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট ও জেলা কালেক্টর দেড়শ সশস্ত্র নগর-রক্ষক বাহিনী সংগে নিয়ে অকুস্থলে গিয়ে হাজির। উদ্দেশ্য ভূস্বামীদের মদত দেওয়া। কিন্তু বেশ করুণভাবেই পরিকল্পনা গেল ভেস্তে। কারণ আদিবাসীরা এবার আর তাদের ধোঁকাবাজী ফাঁদে পা দিল না, একটি জনপ্রাণীও তালওয়াদায় গেল না।

সরকার এবং ভূস্বামীবর্গ ১৪৪ ধারা জারী করার জন্য সুযোগ-সন্ধানের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। ১৪৪ ধারার ছত্রছায়াতলে স্বেচ্ছামতো স্বৈরাচারী হওয়া যেতে পারে। বাড়িতে সিঁধ লাগানো ও চুরির মিথ্যা অভিযোগে রায়তলী গ্রামের ৫৫ জন আদিবাসীকে গেপ্তার করে এনে পুলিসের হেফাজতে রাখা হয়। হাজার হাজার আদিবাসী তাদের নিরপরাধ কৃষক ভাইদের এমন অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারের জন্য দারুণ উত্তেজিত হয়ে দহানুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। উদ্দেশ্য—জেল পর্যন্ত অভিযান করে গিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে আনা। কমরেড কামা রণদিভে এই ঘটনা শুনেই, যাতে কোন রকম অঘটন না ঘটে—তাই তাদের নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে মাঝপথে তাদের সংগে দেখা করল, আবার বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদন করল। আবেদনে সাড়া দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তারা ফিরে গেল। কিন্তু কেন? তার একমাত্র কারণ লাল ঝাণ্ডা ও তার নির্দেশের উপর ছিল তাদের প্রশ্নাতীত আস্থা ও বিশ্বাস। এমনতর নানান কৌশল প্রয়োগ করেও যখন আদিবাসীদের ফাঁদে ফেলা গেল না, তখন তারা তাদের উপর দৈহিকভাবে আক্রমণ করার পথ নিল। বনগাঁও গ্রামের কাছে এক আদিবাসীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করল যে চার দিন পরে হাসপাতালে সে মারা গেল। কিন্তু তবুও জমিদারদের পাতা ফাঁদে আদিবাসীরা নিজেদের জড়িয়ে ফেলল না। শান্ত সংযতভাবে নির্ধারিত কার্যক্রম অনুসরণ করে আন্দোলন চালিয়ে গেল।

দিন এগিয়ে যায়। ধর্মঘটও এগিয়ে চলে। ঘাস আর কাটা হয় না। আন্দোলনের ধারা-প্রকৃতি লক্ষ্য করে কয়েকজন খাস জমির মালিক আমাদের দাবি মতো মজুরি দিতে ব্যক্তিগতভাবে চুক্তির মধ্যে এল, এবং আদিবাসীদের

বিরুদ্ধে যে সব মামলা রুজু করেছিল, তা তুলে নিল। কিন্তু এতেও আদিবাসীরা সন্তুষ্ট হতে পারল না। তারা আরও দাবি করল যে, মিথ্যা মামলা দায়ের করার জন্য প্রথমেই তাদের ক্ষতিপূরণমূলক জরিমানা দিতে হবে। জরিমানার পরিমাণ গ্রামবাসীরাই ঠিক করবে এবং গ্রামকেই দিতে হবে। এহেন শর্তেও কোন কোন জমিদার রাজী হয়ে গেল। নিশ্চয়ই তারা খতিয়ে দেখেছিলেন যে, ঘাসগুলোকে ফেলে রেখে হাজার হাজার টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার থেকে, ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিয়ে ঘাস কাটিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, তাতে অধিকতর অর্থনৈতিক সাশ্রয় হবে। ধীরে ধীরে অন্যান্য সব ঘাসের মালিকরাও একই পথ অনুসরণ করে কিসান সভার দাবি মোতাবেক ঘাস কাটার মজুরি দিতে রাজি হয়ে গেল। কালেক্টর যে সরকারী মজুরি-রেট ঘোষণা করেছিলেন কেউই তা মানল না। মাত্র কয়েকজন কোটিপতি, যেমন শ্রীযুগলকিশোর ও আরও কয়েকজন মালিক, যতই ক্ষয়ক্ষতি হোক না কেন, নিজেদের জিদ কিন্তু বজায় রাখল। তাদের মনোবাসনা ছিল—জোর করে তারা কাজ করিয়ে ছাড়বে, আর এই বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা সরকারের পরোক্ষ সমর্থন পাবে। এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হোক না কেন সবকিছু তারা স্বীকার করে নেবে তবু কোন মতেই তারা কিসান-সভার দাবি মেনে নেবে না। অত্যাচারের নানা অপকৌশল তারা প্রয়োগ করল, কিন্তু প্রতি বারই তারা ব্যর্থতার সম্মুখীন হলো। ঘাস আর কাটা হল না।

আদিবাসীদের মধ্যে একটা প্রথা প্রচলিত ছিল। বংশপরম্পরাগতভাবে এই প্রথা সকলেই মানত। কোন লোক কোন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর, গ্রাম্য-প্রধানদের বিচারে যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে যেকোন ধরনের জরিমানা গ্রামকে দিতে হত। এই প্রথা অনুসারেই আদিবাসীরা অপরাধী জমিদারদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের প্রশ্ন তুলেছিল। কয়েকজন মালিক তা মেনেও নিয়েছিল। এ ধরনের লেনদেন, আদিবাসীদের কাছে তেমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রথা-প্রকরণ সম্বন্ধে সরকারের বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকার জন্য সরকার এই বলে এতে হৈ চৈ করল যে, কমিউনিস্টরা পাল্টা সরকার স্থাপনের চেষ্টা করছে। এই ধরনের অভিযোগ আমাদের বিরুদ্ধে কেন, কিভাবে তা আনা হল, আমরা তো কিছুই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে "জরিমানা উপাখ্যান" জানা গেল। সরকারী চিৎকারের কারণটা জানতে পেরে, এমনতর অভিযোগের বহর দেখে, হাসব না কাঁদব কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না।

জঙ্গল-কাটাই-মজুরদের ধর্মঘট খুব শান্তিপূর্ণভাবেই এগিয়ে চলছিল। জঙ্গল-ব্যবসাতে বণিক সম্প্রদায় প্রায় আড়াই কোটি টাকা লগ্নী করেছিল। ধর্মঘট যে প্রত্যাহৃত হবে—এমন কোন চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। এদিকে হাজার হাজার টাকা ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, এই চিন্তায় বণিকরা বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করল। অবস্থাটা আপস-মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা চালানোর পক্ষে অনুকূল বিবেচনা করে, দহানুর ওয়েল অফিসার এবং প্র্যান্ট বা প্রাদেশিক (Prant) অফিসার মিঃ এ, এইচ খান সংগে সংগেই একটা আলোচনা বৈঠকের উদ্যোগ নিলেন। একপক্ষে টিম্বার মার্চেন্ট্‌স্ এ্যাসোসিয়েসনের চেয়ারম্যান শ্রীবাবুভাই পোন্ডা ও তার সমধর্মীরা এবং অপরপক্ষে কমরেড পারুলেকর ও আমি। ঠিকায় বা দৈনিক মজুরি—যে হিসাবেই হোক না কেন সমস্ত মজুর দিনে যেন ১ টাকা ২৫ পয়সা পায়—সে কথা মনে রেখেই আমরা একটা পরিকল্পনা দিলাম। কাজ-চলাকালীন কোন কর্মী আহত হলে বা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তাকেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিসহ অন্যান্য কিছু দাবিও করা হল। দাবি প্রসংগে একটা ফয়সালায় আসা হল। দাবিগুলোকে নথিভুক্ত করে একটা চুক্তিপত্র রচিত হল। প্রাদেশিক অধিকারীর ঘরে তার সামনেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলাম কিসান সভার পক্ষে কমরেড পারুলেকর ও আমরা এবং অপরপক্ষে স্বাক্ষর দিলেন দহানুর সুপরিচিত বণিক ও টিম্বার মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েসনের চেয়ারম্যান শ্রীবি পোন্ডা ও অন্যান্য বণিকদের প্রতিনিধি হিসেবে তার একজন সহকর্মী। নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসাবে পোন্ডা হাই স্কুলের অধ্যক্ষ প্রয়াত ভি. বি. কর্ণিকও সই করেছিলেন। প্রাদেশিক অধিকারীর হস্তক্ষেপে ও তার মধ্যস্থতায় সমগ্র সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় আসা সম্ভব হল—তাতে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ রক্ষিত হল। টিম্বার মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সভায় এই চুক্তির সপক্ষে সমর্থন ঘোষণা করা হল। জঙ্গল ও গ্রাম—বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে চুক্তির সর্তাবলী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার জন্য আমিও যাত্রা করলাম। ধর্মঘট তুলে নেওয়ার প্রশ্ন আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছিলাম।

কিন্তু কারুর পক্ষেই সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না যে স্বয়ং প্রাদেশিক অধিকারীর উপস্থিতিতে উভয়পক্ষসম্মত চুক্তিপত্রকে কংগ্রেস সরকার এমন অনাড়ম্বর উদাসীনতায় সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবে।

কংগ্রেসী শাসকবর্গের মনের মধ্যে অন্যরকম নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল। প্রাদেশিক অধিকারীর মধ্যস্থতায় জঙ্গল-ঠিকাদার ও কিসানসভার স্বীকৃত চুক্তিপত্র মন্ত্রীমন্ডলী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে উপেক্ষা করে ১৯৪৬ সালের ১৪ই

নভেম্বর তারিখে সমগ্র থানা জেলায় সংকটকালীন জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা করল। এ ধরনের কার্যকলাপের পিছনে স্পষ্টতঃই একটিমাত্র উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠল—কিসানসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব একেবারে নিঃশেষে মুছে দেওয়া। প্রায় দু'শ আদিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হল, অন্যান্য অনেককে নজরবন্দী করা হল এবং কিসান সভার সমস্ত কর্মী ও সংগঠক সমেত আমাদেরকেও বহিষ্কৃত করা হল।

আমি ওদিকে কৃষকদের কাছে সমঝোতার শর্তাবলী ব্যখ্যা করতে করতে সভার পর সভা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। জংগল এলাকায় কোন সংবাদপত্র পৌঁছাত না। জঙ্গলখণ্ডে সভা-সমিতির কাজ শেষ করে, খাত্তালওয়াড়ে ফিরে আসার আগে পর্যন্ত ঘটনাস্রোত যে ভিন্নমুখী হয়েছে, সরকার যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দিয়েছে—সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানতেই পারিনি। ফিরে এসে অত্যাচারের নগ্ন উদ্দাম নৃত্য-লীলা দেখে মনে হল, কেউ যেন একেবারে আমার পায়ের তলা থেকেই মাটি সরিয়ে নিয়েছে। কমরেড পারুলেকর ও আমি ফিরে এলাম কল্যাণে। ১৯৪৬ সালের ২১শে নভেম্বর থানা জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ আমাদের ধরিয়ে দেওয়া হল। জেলা ছেড়ে চলে এলাম।

কোন রকম অত্যাচার-নিপীড়নের পরোয়া না করে আদিবাসীরা দাঁতে দাঁত দিয়ে ধর্মঘট অব্যাহত রাখল। সরকার পক্ষ চরম পদক্ষেপ হিসেবে এলাকায় সৈন্য-বাহিনী নামিয়ে দিল। আদিবাসীরাও অতুলনীয় সাহসিকতার সংগে পরিস্থিতির মোকাবিলা করল এবং অবশেষে সে সংগ্রামে জয়লাভ করল। কিন্তু এই বিজয় অর্জনের জন্য আদিবাসীদের বিরাট রক্তমূল্য দিতে হল।

১৯৪৬ সালের ২১শে নভেম্বর থেকে ১৯৫৩ সালের ১৪ই জানুয়ারি পর্যন্ত, কমরেড পারুলেকর বা আমি কেউই প্রকাশ্যে থানা জেলায় ঢুকতে পারিনি। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ছিলাম বহিষ্কৃত, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত গোপন অবস্থায় এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত ছিলাম নজরবন্দী। থানা জেলায় ফিরতে পারলাম সবে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। আমাদের সম্ভাষণ জানাতে মহালক্ষ্মীতে সমবেত হল হাজার হাজার ওয়ারলি। তাদের ভালবাসা, আনুগত্য, উৎসাহ-উদ্দীপনার স্বতস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ দেখে আমরা গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়লাম। তাদের এমন ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবছিলাম—সত্যিই আমরা এসবের উপযুক্ত কিনা, এসব আমাদের প্রাপ্য কিনা। ভাবছিলাম—এই সব কঠোর সংগ্রামী মেহনতী মানুষগুলোর জন্য আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই উন্নততর জীবনের স্বপ্নকে সফল করে তুলতে পারবো

কিনা। খুব বেশী অভিভূত হয়ে পড়লে, একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া—এটাই ছিল কমরেড পারুলেকরের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। সেদিনও তিনি ঐরকম নীরবতার সমুদ্রে ডুব দিলেন, বেশ কিছুক্ষণ নিথর-নিশ্চল হয়ে বসে থাকার পর তিনি মুখ খুললেন—"এই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে তুমি, আমি শুধু অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তিসত্তাবিশেষ মাত্র। আর এরা—কেমন সমর্পিত প্রাণ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালবাসায় ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর! এদের নিজেদের শক্তিবলেই এরা গোলামীর শৃংখল ছিন্ন করতে পেরেছে। আমরা তো ছিলাম শুধুমাত্র অনুঘটকের ভূমিকায়, নিছক নিমিত্ত মাত্র।

দশম অধ্যায়

দমন-চক্রের শাসন—আদিবাসীদের প্রতিরোধ

থানা জেলায় আদিবাসী আন্দোলনের কুড়ি বছরের ইতিহাসে আদিবাসীদের তিনটি পৃথক পর্যায়ে সরকারী দমন চক্রের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রতিটি অভিযানই উত্তরোত্তর তীব্রতার আধিক্যে, পূর্বেরটি অপেক্ষা আরও বেশী বেশী নিষ্ঠুরতার নজির স্থাপন করেছিল। প্রথম সরকারী হামলা চলে ১৯৪৫ সালে, দ্বিতীয়টি ঘটে ১৯৪৬-৪৭ সালে, আর তৃতীয়টি সংঘটিত হয় সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের সময় ১৯৫৬ সালে। অভিযানগুলির মোকাবিলা করতে গিয়ে তাদের যে বর্বর অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল তা শুনলে যে কোন মানুষের হৃদয় ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে।

১৯৪৬-৪৭ সালের অভিযানটি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। সে উদ্দেশ্য হলো সেই এলাকায় কমিউনিস্টদের প্রভাব ভেঙে তছনছ করে দেওয়া। সরকারের আতংক জেগেছিল যদি একের পর এক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সাহায্য ও সমর্থনে আদিবাসীরা জয়লাভ করে, তাহলে তাদের প্রতি আদিবাসীদের আস্থার বুনিয়াদকে বিধ্বংস করে ফেলা কঠিনতর হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের প্রভাব থেকে আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করে আনা যাবে না। এই কারণেই চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও, সরকার সেই চুক্তি অগ্রাহ্য করে বিনা প্ররোচনায় হামলা চালানোই সঠিক পন্থা বলে ধরে নিল। সাংবাদিকদের সংগে মোরারজী দেশাই-এর এক সাক্ষাৎকারের সময় সরকারী এই নীতি বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠল। ২২।১।৪৭ তারিখের "ফ্রি প্রেস জার্নাল"-এর একটি সংখ্যায় উক্ত সাক্ষাৎকারের বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশ থেকে জানা যায়:

> "প্রাদেশিক অধিকারীর হস্তক্ষেপে টিম্বার মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ও কিসান সভার মধ্যে যে একটা সমঝোতায় আসা সম্ভব হতে পারে তা তার জানা ছিল না। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক—আলোচনায় তিনিও জড়িয়ে পড়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ছুটিতে আছেন এবং তাঁকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। প্রাদেশিক অধিকারী তার নিজস্ব উদ্যোগে যে সব কাজ করবেন—তার প্রত্যেকটিই যে সরকারের পক্ষে

বাধ্যতামূলক হবে এমন কোন কথা নেই।"

প্রাদেশিক অধিকারীর নিজের উদ্যোগে যে চুক্তি হয়েছে তাকেই স্বীকৃতি জানাতে সরকার পক্ষ রাজী নয়—এই আবিষ্কার আমাদের কাছে একটা তাজ্জব ও অনবদ্য ব্যাপার বলে মনে হল। এটা আমাদের চোখ খুলে দিল। ব্যাপারটা সত্যিই শিক্ষাপ্রদ।

একবার যখন সরকারপক্ষ মনস্থির করল যে আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করতেই হবে তখন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনমতো তারা নিজস্ব পন্থায় এগুতে লাগল। কোন বাধাই মানতে রাজী নয়। অফিসার মিঃ খান সমঝোতায় আসার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তারই পুরস্কার হিসাবে তাকে একটি সুন্দর উপঢৌকন দেওয়া হল। অর্থাৎ তাঁকে ছুটি নিতে বাধ্য করা হল এবং তারপর তাঁকে বদলির আদেশ দেওয়া হল।

ওদিকে, টিম্বার মার্চেন্ট এসোসিয়েশনও যখনই বুঝতে পারল যে তারা সরকারের কাছ থেকে মদত পাবে এবং সরকারপক্ষ নিজেরাই অস্ত্র শানাচ্ছে, আন্দোলনকে একেবারে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ চালানোর একটা সর্বাত্মক পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে, তখন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা মোরারজী দেশাই-এর থেকেও আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। তাদের চেয়ারম্যান একটি প্রকাশ্য বিবৃতি পর্যন্ত দিয়ে বললেন যে, কিসান সভার প্রতিনিধিদের সংগে তাদের কোন সমঝোতা কখনোই হয়নি। তাদের এই অসম্বন্ধ প্রলাপ এমনই অবিশ্বাস্য ও হাস্যাস্পদ ব্যাপার যে, যে কোন লোকই "ফ্রি প্রেস জার্নাল"-এর ২২।১।৪৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ বিষয়ে তাদের মন্তব্যের সংগে একমত হতে পারবেন। জার্নালের টিপ্পনী হল:

"টিম্বার মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মীমাংসা বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যাঁরা ছিলেন 'ওয়ারলি-সরকার-কমিউনিস্ট'-সমঝোতা-বৈঠকের তৃতীয় পক্ষ সেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে টিম্বার মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতিই এখন দেখা করতে পর্যন্ত রাজী হল না, বেমালুম সব উড়িয়ে দিল। শুধু তাই নয়, দৈনিক এক টাকা মজুরি দিতে তো তারা নিজেরাই রাজী ছিল, কিন্তু তারাই চুক্তির সবচেয়ে মুখ্য যে শর্ত অর্থাৎ দৈনিক মজুরি এক টাকা চার আনা, তা স্বীকার করে নেওয়ার পরও, এখন তা মানতে মোটেই রাজী নয়। এই পরিস্থিতিতে এইটুকুই মাত্র বলতে বাকী থেকে গেল যে—"ওসব মনগড়া ব্যাপার। শ্রী গোন্ডা কখনই এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ছিলেন না, বা কোন স্পেশাল অফিসার সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না, অথবা কোন ওয়ারলি বা কমিউনিস্ট নেতা কেউই যোগ দেয়নি—সব একেবারে

কল্পনার মায়াজাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ছাড়া কীই বা মন্তব্য আর করা যেতে পারে।"

১৯৪৬ সালের ১৯শে নভেম্বর থেকে ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে কমরেড পারুলেকর মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে বেশ কয়েকবার তাঁর বক্তব্য রাখলেন ও স্মারকলিপি দিলেন। ১৭ই নভেম্বর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হল। ১০ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত পরিস্থিতির কোন রকম পরিবর্তন হল না এবং কিছুই ঘটল না। অথচ বোঝা গেল না তবুও কেন সরকার আদিবাসীদের ওপর এমন স্বৈরতান্ত্রিক দমন-চক্র চাপিয়ে দিল। আমরা ধারণা করলাম যে, সরকার হয়তো ঘটনাবলী সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না জানার জন্য একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন ভুল পদক্ষেপ নিচ্ছে, তাই আমরা বিরাজমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সরকারের কাছে উপস্থিত করলাম। কিন্তু দেখা গেল ভুল ধারণা তাদের নয়, বরং আমাদেরই। সরকার সম্বন্ধে আমাদের মোহ ও আমাদের পার্টির তৎকালীন নীতির জনাই আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।

অত্যাচারের খড়্গ কৃপাণ হাতে তুলে নিল সরকার

সরকারের কাছে দেওয়া কমরেড পারুলেকরের আবেদনপত্রে কিছুই কাজ হল না। আদিবাসীদের সংগঠনকে ভেঙে ফেলার জন্য ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যকে ধ্বংস করার জন্য সরকার বেশ আটঘাট বেঁধেই পরিকল্পনা মাফিক এগুতে লাগল। ২০।১।৪৭ তারিখে শ্রীমোরারজী দেশাই সাংবাদিক বৈঠকে যা বলেছিলেন, তার থেকে এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল। "টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার ২১।১।৪৭ তারিখের সংখ্যায় এই সাংবাদিক বৈঠকের বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল:

> "কমিউনিস্টদের সংগে আলোচনা-বৈঠকে যে সমঝোতা হয়েছিল, তার প্রতি আমার কোন আস্থা বা আগ্রহ নেই। কমিউনিস্টদের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর সহায়ক হবে এমন কোন কিছুই বরদাস্ত করা হবে না।"
>
> "ন্যাশনাল হেরাল্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি আরও পরিষ্কার:
>
> "শ্রীমোরারজী দেশাই বেশ স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে, যদি কোন সমঝোতার দ্বারা ওয়ারলিদের উপর কমিউনিস্টদের কর্তৃত্ব পূর্ণভাবে বজায় থাকার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সরকার তা স্বীকার করতে রাজী নয়।"

কমিউনিস্টদের প্রভাব খর্ব করার পবিত্র শপথনিষ্ঠ অভিপ্রায় নিয়ে, তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সীমাজ্ঞান হারিয়ে সরকারপক্ষ যা কিছু

প্রয়োজন তাই করতে মোটেই পিছপাও হননি। এমনকি তারা আদিবাসীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার জন্য সৈন্যবাহিনীর সাহায্য পর্যন্ত নিতে কোন রকম কুণ্ঠা বোধ করল না।

আমাদের বহিষ্কারের সংবাদ ও আদিবাসী নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের সংবাদ সমগ্র জঙ্গলখণ্ডে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। আদিবাসীরা স্বতস্ফূর্তভাবে কাজ বন্ধ করে দিল। ঘাস কাটাই-এর লোকেরা তাদের কাস্তে নামিয়ে রাখল। গাছ কাটাই-এর মজুররা কাঁধে কুড়াল তুলে নিয়ে জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে এল। গরুর-গাড়ির চালকরা, যারা কাঠ ও ঘাস বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারাও গাড়ি যেখানে ছিল সেখানেই ফেলে রেখে বাড়ি ফিরে গেল। তাদেরকে এই আহ্বান জানানোর জন্য তেমন কোন নেতা বা উল্লেখযোগ্য কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও জঙ্গলের সমস্ত কাজ-কর্ম যেন চোখের নিমেষ ফেলতে না ফেলতেই মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল।

সরকার-পক্ষ ও ভূস্বামীরা এই ধারণার বশবর্তী হয়েছিল যে, একবার যদি নেতাদের আদিবাসীদের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায় বা তাদের দৃষ্টির বাইরে আটকে ফেলা যায়, তাহলে ঐ পিছিয়ে-পড়া, অনুন্নত আদিবাসীগুলোকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধার লোভ দেখিয়ে কাবু করা যাবে, তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। এ ব্যাপারে সরকার পক্ষ নিশ্চিত-ভাবে ধরেই নিয়েছিল যে, সংগঠন ও তাদের একতার উপর আঘাতগুলোকে আদিবাসীরা মুখ বুজে সহ্য করে নেবে। কিন্তু ঘটনা-ক্রম তা সম্পূর্ণ-ভুল বলে প্রমাণ করে দিল। সরকার ও জমিদার—উভয় পক্ষের কাছেই আদিবাসীদের প্রতিক্রিয়া ও কার্যকলাপ বিস্ময়কর রূপে দেখা দিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে নিঃশেষে মুছে দেওয়ার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। তারা এটা উপলব্ধি করতেই পারেনি যে, ১৯৪৫ সালের আন্দোলনের আগুনে পোড় খেয়ে এক নতুন আদিবাসী-প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটেছে। গভীর হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল সরকার ও ভূস্বামীবর্গ।

আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে, সমঝোতার জন্য কিসান-সভা যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছিল, সরকার পক্ষ একবার তা প্রত্যাখ্যান করে দেওয়ার পর, তাদের কাছে তখন আর দুটি মাত্র বিকল্প পথ খোলা রইল। এক—সঠিক ও নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে মীমাংসা সূত্রকে স্বীকৃতি জানানো, দুই—দমন চক্রকে আরও তীব্রতর করে আদিবাসীদের নতি স্বীকার করতে বাধ্য করা। সরকার ও জমিদার পক্ষ দ্বিতীয় বিকল্পটিই বেছে নিয়েছিল।

ধর্মঘট ভাঙার পরিকল্পনায় জঙ্গল ঠিকাদারদের কিছু কিছু দালাল, স্বভাবভীরু আদিবাসীদের ভয় দেখিয়ে ও জোর জবরদস্তি করে কাজে আনার

চেষ্টা শুরু করল। বলপ্রয়োগের কাছে নতি-স্বীকার করতে তারা হয়ত বাধ্য হত, কিন্তু তার আগে তারা অন্যান্য আদিবাসী ভাইদের কাছে সব কিছু ঘটনা বলত। তারা বলত "আমাদের ভয় দেখাচ্ছে, ধমকাচ্ছে, বলছে একেবারে ময়দা-দলার মতো দলা পাকিয়ে দেবে। আমরা কী করতে পারি? তোমরা আমাদের মদত দাও।" ঠিক তার পরের দিনই, শত শত আদিবাসী লাল ঝাণ্ডার স্লোগান দিতে দিতে জঙ্গলের মধ্যে অভিযান করত। সেখানে যেসব কাটাই-ওয়ালারা বাধ্য হয়ে তখন কাজ করছিল, তারাও এমনই একটা সুযোগের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। স্লোগান শুনতে পেয়েই, তারাও কাটাই-এর সাজ সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে মিছিলের সংগে সামিল হয়ে যেত। দু চারটে বিক্ষিপ্ত ব্যতিক্রম ছাড়া জঙ্গলে কাটাই-এর কাজ প্রায় বন্ধই ছিল। কাজ যাতে আবার জোর করে শুরু করা যায়, তার জন্য নিত্য নতুন অপকৌশল উদ্ভাবনে জঙ্গল ঠিকাদাররা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিযোগের ভিত্তিতে তারা আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মামলা জুড়ে দিল। প্রায় চার শ' আদিবাসীকে এভাবে অযথা হয়রান করানো হয়েছিল। অনেককেই থানার লক আপে আটকে রাখা হল। এভাবে আটকে রাখার মতলব হচ্ছে,—যতদিন সম্ভব তাদের বিচ্ছিন্ন করে আটকে রেখে একটা উত্তম শিক্ষা দেওয়া। আন্দোলনকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে জেলাধিকারী শ্রীআলমোলা নিজস্ব বিশেষ স্বৈচ্ছিক অধিকার (discretionary powers) প্রয়োগ করে, ন্যায় বিচারের পক্ষে নানারকম ভাবে হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য সাধনের পরিকল্পনা মাথায় রেখে তিনি শাসন-বিভাগের একান্ত বশংবদ ক্রিমিনাল ফৌজদারী আদালতের কাছে তিন রকম নীতি-নির্ধারক নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন :—

(১) আদিবাসীদের বিরুদ্ধে আনীত 'অপরাধ-ষড়যন্ত্র-হিংসাত্মক' ফৌজদারী মামলাগুলোর প্রতিদিনই শুনানী চলবে। এ ধরনের নির্দেশের মর্মার্থ হচ্ছে—আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনগত সাহায্যের সুযোগ বা সময় যাতে আদিবাসীরা না পায়। তার ফলে একতরফা শুনানীর সুযোগে, বিচারের ফয়সালা করে যত বেশি বেশি সংখ্যায় সম্ভব হয় ততজন আদিবাসীকে নিশ্চিতভাবে জেলে ভরতে পারা যাবে। এ যেন নিম্ন আদালতকে এক ধরনের "সবুজ সংকেত" দিয়ে দেওয়া—মামলার গুণাগুণ বিচার না করেই, অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলের ঘানি টানানোর মতো ব্যবস্থা করার অবাধ অধিকার দিয়ে দেওয়া।

(২) আদিবাসীদের কাছ থেকে আদালত এমন মোটা অংকের জামিন চাইবে যা তাদের আয়ত্তের বাইরে। এর উদ্দেশ্য : আনুষ্ঠানিকভাবে

অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত যাতে তাদের জেলের মধ্যে পচিয়ে মারা যায়।

(৩) সর্বশেষ, তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে—"কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত কার্যকলাপে, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবো না বা কোন মিটিং-মিছিলে যাবো না,—এই মর্মে মুচলেকা না দেওয়া পর্যন্ত, কোন আদিবাসীকে জামিনেও ছাড়া হবে না। এর থেকে এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এর একমাত্র উদ্দেশ্য আদিবাসীদের মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি করা, যাতে তারা কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম থেকে তাদের আনুগত্য বা সমর্থন তুলে নেয়।

তাদের বিরুদ্ধে এত বেশী বেশী মামলা আসতে লাগল যে, একমাত্র আদিবাসীদের মামলার ফয়সালার জনাই একটি বিশেষ আদালত স্থাপন করে একজন বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা বেশ জরুরী হয়ে পড়ল। "লাল-ঝাণ্ডা-আন্দোলন" সম্পর্কিত মামলাগুলোর নিষ্পত্তির জনাই এই আদালত গঠিত হয়েছিল বলে জনসাধারণের মধ্যে তার নামকরণ পর্যন্ত হয়ে গেল "লাল-ঝাণ্ডার আদালত"।

সরকার, জমিদার ও মহাজনদের মিলিত আক্রমণ

এই সব উন্মত্ত কার্যকলাপ যখন চলছিল, তখন আমরা বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট বিশিষ্ট আইনবিদ—শ্রীটি গাদিওয়ালা, শ্রীনিমচওয়াল', শ্রীশাহ, থানা জেলার শ্রীপ্রভাকর হেগড়ে এবং সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রীরজনী প্যাটেল ও শ্রীমতী সুশীলা প্যাটেল প্রমুখদের কাছ থেকে অকৃপণ সহযোগিতা ও অমূল্য আইনগত পরামর্শ লাভ করেছিলাম। ১৯৪৬-৪৭ সালে দহানুতে ওয়ারলিদের পক্ষে মামলা দেখাশুনা করার জন্য শ্রীনীমচওয়ালাকে তো সেখানেই থাকতে হত। তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। একজন বিশেষ লালঝাণ্ডার উকিল দহানুতে একেবারে অকুস্থলে তাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য সর্বদা হাজির থাকছেন—এই ঘটনাতে আদিবাসীদের মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল। কিন্তু জেলা সমাহর্তা তাঁর বিশেষ পদাধিকার বলে তাদের এই সামান্যতম আইনগত পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আইনী কাজকর্মে শ্রীগাদিওয়ালা নিয়মিত দহানুতে যাতায়াত করতেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল যে তিনি বিভিন্ন সভাসমিতিতে ভাষণ দিচ্ছেন এবং এই মিথ্যা অভিযোগের উপর ভিত্তি করেই তাকে জেলা থেকে বহিষ্কার করা হল। সেই রাত্রিতেই জমিদার মহাজনদের নিয়োগ করা গুণ্ডাদের চোরা-গোপ্তা আক্রমণের শিকার হলেন তিনি। দহানু স্টেশনে বোম্বাইগামী রাত্রির গাড়ি ধরার জন্য টাঙ্গা

থেকে নামবার সংগে সংগেই গুণ্ডাগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর। মাথা আর পায়ের উপর লাঠির পর লাঠির আঘাত এসে পড়ল। বরাত ভাল, মাথায় ছিল একটা টুপি। তাতে মাথাটা বাঁচল বটে, কিন্তু টুপিটার যা অবস্থা হল শেষকালে তাকে টুপি বলে চেনাই মুশকিল।

শ্রীআলমোলা পরিস্কার ধরেই নিয়েছিলেন যে, তিনিই হলেন থানা জেলার অবিসংবাদী দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং তিনি যা করবেন তা সবই আইনের আওতার বাইরে আর তার কৃতকর্মের জন্য কোন দণ্ডই তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

পুলিস-হাজতে বন্দী ওয়ারলিদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য কাগজ-পত্র তৈরি করার ব্যাপারে শ্রীনীমুচওয়ালাকে প্রায়ই তাদের সংগে দেখা করতে হত। কিন্তু ক্ষুদে পুলিস কর্মচারীদের অত্যুৎসাহের ঠ্যালায় তাঁর সে প্রচেষ্টা বাধা পেতে লাগল। এতেও সন্তুষ্ট না থাকতে পেরে শ্রীআলমোলা ১১।১২।৪৬ তারিখে শ্রীনীমুচওয়ালাকেও বহিস্কার করে দিলেন।

শ্রীগাদিওয়ালা ও শ্রীনীমুচওয়ালার বিরুদ্ধে ঐ ধরনের আদেশ তাঁদের পেশাগত বৃত্তির স্বাধীনতায় সরাসরিভাবে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। সম্পূর্ণ বে-আইনী ব্যাপার এটা। তাঁরা দুজনেই স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এর কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন। তারা বোম্বাই বার এসোসিয়সনের কাছেও তাদের বক্তব্য পাঠালেন বিষয়টা তাদের গোচরীভূত করার জন্য। সংবাদ পত্রেও হৈচৈ পড়ে গেল এমন ঘটনায়। অবশেষে এই দুইজন আইনবিদের উপর থেকে বহিস্কারের আদেশ রদ করে দিতে বাধ্য হলেন শ্রীআলমোড়া। শ্রীনীমুচওয়ালা আবার দহানুতে ফিরে গেলেন এবং আদিবাসীদের বিচারের ক্ষেত্রে তাদের সমর্থনে তাঁর অমূল্য পরামর্শ ও সহযোগিতা করার জন্য দিন রাত ধরে কাজ করতে লাগলেন।

দহানু-স্টেশনের কাছাকাছি বাঁকী গ্রামের মুসলপাড়ায় ঘটল এক ভয়াবহ নারকীয় ঘটনা। সরকার ও জমিদারের যৌথ উদ্যোগে সেই আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। কয়েকজন ইরানী জমিদার মুসলপাড়ায় গিয়ে পদধূলি দিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ওয়ারলিদের ভয় দেখিয়ে ও ধমক দিয়ে কাজে আসার জন্য বাধ্য করা। ফলে ছোটখাটো একটা বাক্‌বিতণ্ডা হল। তখনকার মতো তারা বিদায় হল। কিন্তু বিকেল ৩ টেয় আবার এক ডজন পুলিস ও ৫০ জন গুণ্ডার এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সেখানে হাজির হলো। পুরুষরা তখন কেউ বাড়ি ছিল না। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে গোটা পাড়াকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে বাসন-পত্র ছুড়ে ফেলে দিল। মাটির থালা গেলাস ভাঙ্গল, এ্যালুমিনিয়মের ঘটি-বাটি ভেঙে খানখান করল, ধান-গম পিষাই করার চাকিগুলো টুকরো টুকরো করে গুড়িয়ে দিল,

কুড়ুল আর রাইফেলের কুঁদো দিয়ে চালগুলোকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে কেউ কেউ ঘরের মধ্যে সঞ্চয় করে রেখেছিল, তাও ঢেলে ফেলে দেওয়া হল। কারুর ঘরের সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ ধানও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দেওয়া হল। গরুর গাড়িগুলো অকেজো করে দেওয়া হল, চাকাগুলো টুকরো টুকরো করা হল। যে কজন বৃদ্ধ শিশু বাড়িতে ছিল তাদের প্রচণ্ড মারধোর করা হল, তাদের পরিধেয় ছিন্ন-বস্ত্র আরও ছিঁড়ে-কুড়ে দিল। আর সর্বশেষ, অত্যাচারের চরম পরাকাষ্ঠা হলো যাওয়ার সময় সংগে করে নিয়ে গেল ছাগল, মুরগী, ডিম, আর কারুর হাঁড়ির ভিতর বা চালের বাতায় ঝোলানো বাঁশের চোঙায় সঞ্চিত সামান্যতম পয়সা কড়িও খুঁজে পেতে নিয়ে যেতে ভুল করল না। তারপর থেকেই সরকারী কর্মচারী ও জমিদারদের দালালগুলো প্রতিদিন গ্রামের মধ্যে গিয়ে ধমক দিয়ে আসত, "লাল ঝাণ্ডা ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ধর্মঘট না তুলে নিলে কী ভয়াবহ পরিণাম ঘটে, কী চরম মূল্য দিতে হয়— তা ভালো করে স্মরণে রাখিস সব। সবাইকে কেটে কুচি কুচি করার জন্য মিলিটারি পর্যন্ত ডাকা হবে-এবার"।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই আদিবাসীরা বোম্বাইতে এসে আমার সংগে দেখা করল। বিরাজমান পরিস্থিতির সবিস্তার বিবরণ তারা রাখল আমার কাছে। নিজে আমি তাদের নিয়ে গেলাম বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের দপ্তরে— উদ্দেশ্য, যাতে প্রত্যক্ষ বিবরণ শুনে অত্যাচারের ঘটনাবলী সর্ব সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ পায় এবং দমন পীড়নের ক্ষেত্রে একটা যবনিকা পড়ে। সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদের কাছে আদিবাসীরা তাদের নিজেদের ভাষায় সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করল। সংবাদপত্র দারুণ হৈচৈ ফেলে দিল, সরকার-পক্ষ বাধ্য হল কিছু একটা কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, তা সেই ব্যবস্থাটা কি? না, যে সব আদিবাসীদের ঘর বাড়ি ভেঙে দেওয়া গেছে [illegible] প্রত্যেককে পাঁচ-টাকা করে উদার হস্তে ক্ষতিপূরণ দান। শুধুমাত্র সবজান্তাই বলতে পারে— এ ধরনের দান-খয়রাতের মাধ্যমে সত্যিকার কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছিল— ওয়ারলিদের সন্তুষ্ট করা, না তাদের দৌলতে একটু মজা করে নেওয়া। তা উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, সরকার পক্ষকে মনে হল এ হেন বদান্যতায় তারা আত্মপ্রসাদে বেশ ভরপুর।

জমিদার-মহাজনচক্র দৃঢ়নিশ্চিত ছিল যে, সরকারের সহযোগিতায় তারা নির্বিঘ্নে অত্যাচারের রথ চালিয়ে আদিবাসীদের নতজানু করতে বাধ্য করবে। কিন্তু আদিবাসীরা দৃঢ় পণ নিয়ে এগিয়ে চলল। জেল হাজতের ভয় তখন তাদের কেটে গেছে। শতাব্দী ধরে নম্র আত্মসমর্পণের পর তখন তারা

লড়াই-এর সুযোগ খুঁজে পেয়েছিল। এক ধরনের তীব্র আনন্দের অনুভূতিতে তারা এটাকে একটা "যুদ্ধ আহ্বান" বলেই ধরে নিল।

মুসলপাড়ার অত্যাচারের বদলা নিল তারা। দহানু স্টেশনের দুদিকেই ছিল ইরানী জমিদারদের বড় বড় ফলের বাগান। আদিবাসীদের ঘামঝরা মেহনতেই ফলে ফুলে ভরে উঠেছিল বাগিচাগুলো। সমস্ত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধেই সাধারণভাবে অপমানের একটা চাপা আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিল তাদের মধ্যে। ঐ ইরাণী জমিদাররা হয় বাগিচায় বা অন্যত্র আদিবাসীদের ২৪ ঘন্টা ধরে বেগার খাটিয়ে নিত। তাই সম্পর্কটা ছিল বেশ তিক্ত। মুসলপাড়ার ঘটনায় যেন ভস্মে ঘি পড়ল। প্রতিশোধের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। শত শত আদিবাসী বাগিচার দিকে অভিযান করে সব ভছনচু করে দিল, প্রতিটি গাছ একেবারে নির্মূল করে ছাড়ল।

আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের বোঝা

১৯৪৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ধারা বলে হিংসা কলহবৃদ্ধিকারক ভাষণদানের অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল। ইতঃপূর্বেই আমাকে থানা জেলা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। কিন্তু এই মামলার শুনানীর সময় আদালতে হাজির থাকার জন্য আমাকে আদালত থেকে শমন জারি করা হয়েছিল, তাই থানায় আমাকে যেতেই হত। শুনানী শেষ হয়ে যাওয়ার পর, আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময়, বহিষ্কারের আদেশ অমান্য করার অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করল। শমনের বলে থানায় যেতে আমাকে বাধ্য করা আর তারপর বহিষ্কার আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে আবার আমাকে গ্রেপ্তার করা—ব্যাপারটা যেমন অবৈধ তেমনি হাস্যকর। স্পষ্টতঃই আমার শত্রুপক্ষ মনস্থির করে ফেলেছিল যে, 'যেন তেন প্রকারেণ' আমাকে গ্রেপ্তার করতেই হবে। খুব সৌভাগ্যের বিষয় থানা জেলার সেই পূতিগন্ধময় লক্‌-আপে আমাকে মাত্র দু তিন ঘণ্টা কাটাতে হয়েছিল। ব্যারিস্টার রজনী প্যাটেল তৎক্ষণাৎ আমার মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন।

"আমার ভাষণ হিংসা ছড়াচ্ছে, ক্রোধের আগুন ছড়াচ্ছে"— এই অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে মাসের পর মাস ধরে আমার বিরোধীরা প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। জমিদার, মহাজন ও আদিবাসী সেবামণ্ডলের কর্মীরা এই মর্মে নানারকম দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য ছড়িয়ে যাচ্ছিল। যদিও অভিযোগটা ছিল হিংসাত্মক ভাষণ দান, কিন্তু কোনো মতেই আমাকে আইনের প্যাঁচে জড়ানো যাচ্ছিল না। কারণটা অতি সাধারণ, অভিযোগ একেবারে নির্জলা মিথ্যা। কারণ সরকারী স্টেনোগ্রাফার ও পুলিস বিভাগের লোকেরা আমার প্রতিটি

সভাতেই উপস্থিত থাকত। যদি সত্যিই আমার ভাষণের মধ্যে হিংসাত্মক কাজকর্মে প্ররোচনা সৃষ্টিকারী কোনরকম বক্তব্য থাকত, যা অবশ্য তারা বানাতে চাইছিল, তাহলে কি সেই মুহূর্তেই আমাকে গ্রেপ্তার করতে তাদের একটুও তর সইত? এমন কি কংগ্রেস দলের অনেক দায়িত্বসম্পন্ন নেতারাও আমার বিরুদ্ধে এমনতর ভিত্তিহীন অভিযোগের বন্যা ছুটিয়ে দিয়েছিল। আদিবাসী সেবামণ্ডলের জনৈক কর্মাধ্যক্ষ, প্রয়াত এস. আর. ভিসে ২৫।১২।৪৬ তারিখের মারাঠী সংবাদপত্রে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার বয়ান হচ্ছে:

> "রানী গোদুতাই পারুলেকর দহানু তহশীল এলাকার এক জঙ্গলে অক্টোবর মাসের এক সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে তিনি আদিবাসীদের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার ব্যবস্থাপনাটা হচ্ছে, 'মহাজনরা খুব উদ্ধত হয়ে উঠেছে। আমরা একটা বিরাট গর্ত খুঁড়ব, তার মধ্যে এই সব মহাজনগুলোকে কবর দেবো। তারপর সেই কবরের উপর একটা গাছ লাগাব, সেই গাছের ডালে আমাদের লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেব।"

কিন্তু সত্যিই যদি আমি ঐ ধরনের ভাষণ রাখতাম, তাহলে সরকার পক্ষ—যারা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য শুধু সুযোগের অপেক্ষায় সভার চারদিকে ঘুরঘুর করত, তারা কি এক মুহূর্তও আর আমাকে স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ দিত? প্রয়াত ভিসে মহোদয় যদি সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য সামান্যতমও চেষ্টা করতেন, তাহলে হয়তো নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ভুলটা ধরতে পারতেন। কিন্তু তিনি এমনই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখার জন্য বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করলেন না বা হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন। ঘটনাটা ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। শক্তিশালী মহাজনদের বিরুদ্ধে বক্তব্য আমি রাখতাম। বিশেষ এক সময়ে কংগ্রেস কর্মীরা মহাজনী শাসন শোষণ ধ্বংস করার জন্য একটা গান প্রায়ই গাইত। তখনকার দিনে সে গান খুবই জনপ্রিয় ছিল। গানের কথাগুলো হচ্ছে—"সাহুকারশাহী আতা তেবায়চি নাহি, ভেছায়চি আহে হো (Sawkarshahi ata tevaychi nahi, thechaychi ahe ho)" আক্ষরিক অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় তা হলো "সাহুকারি পদ্ধতি আর আমরা সইবো না, পায়ের তলায় আমরা তা পিষে মারব"। ঠিক অনুরূপভাবেই আমিও বলতাম "গর্ত খোঁড়ার কাজ লাল ঝাণ্ডা শুরু করেছে। কিন্তু গর্তটাকে আমাদের এমন বড় করে বানাতে হবে যার মধ্যে ঐ জমিদারতন্ত্রকে কবরস্থ করা যায়"। এ ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে আমার শ্রোতৃমণ্ডলীকে হিংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করার মতো তেমন কিছুই ছিল না। এই ভাষণকে আইনানুগ নয় এমন কথা বলা যায় না। এমন কি

আমার নিকটতম শত্রুদের কাছেও ব্যাপারটা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠত যদি তাদের মানসিক চিন্তাভাবনাগুলো যথেষ্ট শান্ত-সমাহিতভাবে এগুতো ও তলিয়ে বিচার করতে পারত।

আমার বিরুদ্ধে বেশি দিন ধরে মামলা চালানো গেল না। আমার ভাষণকে প্ররোচনামূলক বা হিংসাত্মক প্রকৃতির বলে প্রমাণ করার জন্য যে সমস্ত সাক্ষী-সাবুদ হাজির করানো হল, তারা কিন্তু আদালতে গিয়ে বাস্তব কথা বলল যে আমি আদিবাসীদের বলেছি, "শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস কর, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন পরিচালনা কর, কিন্তু নিজেদের সংহতি যেন কোনক্রমে বিনষ্ট না হয়"। তার মধ্যে একজন সাক্ষী তো বলেই ফেলল, "দিদি তো আমাদের শান্তভাবেই থাকতে বলেছে"। সরকার পক্ষের ক্রুদ্ধ উকিল সাহেব চিৎকার করে দাবি করল, "শান্তি বজায় রাখার কথা বলতে গিয়ে ঠিক ঠিক কি কথা বলেছে দিদি তাই বল"। উত্তরে সে বলল, দিদি বলেছিল "গণ্ডগোল করবে না, শান্তিভঙ্গ করবে না ইত্যাদি ইত্যাদি"। সমস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ নেওয়া যখন শেষ হল, তখন এমন এক টুকরো প্রমাণও পাওয়া গেল না যার উপর ভিত্তি করে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কাজেই বিরোধীপক্ষের বাড়া ভাতে ছাই পড়ল। মামলা তুলে নিতে বাধ্য হল।

শ্রী গদিওয়ালা ও শ্রী নীমুচওয়ালাকে বহিষ্কৃত করে তাদের আইনগত পরামর্শ থেকে ওয়ারলিদের বঞ্চিত করা—এটাই ছিল আমাদের প্রতিপক্ষের একমাত্র পরিকল্পনা। আর তার সংগে সংযুক্ত হয়েছিল মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আমাকে গ্রেপ্তার করে তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত। তাদেরকে ভয় দেখানো হতো—"এই তো, দিদিও যে জেলে গেল, কে দেখবে এখন"? এই ধারণা প্রতিপক্ষের মনে দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে, একবার যদি আদিবাসীদের যেকোন রকম আইনগত বা নৈতিক সমর্থন বা সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করা যায় তাহলেই কেল্লা ফতে। তক্ষুণি বাছাধনেরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। কিন্তু ঘটনা যা ঘটল, তা সম্পূর্ণ বিপরীত। আদিবাসীদের ধারাবন্ধ প্রতিরোধের ধাক্কায় পাগল হয়ে গেল তারা। ক্রোধে ফেটে পড়ল। সরকারের সহযোগিতায় উম্মাদের মতো একেবারে অত্যাচারের বিভীষিকা সৃষ্টি করতে লাগল।

মাত্র দু'টি বিকল্প পথ আদিবাসীদের কাছে খোলা ছিল—হয় আত্মসমর্পণ, না হয় মেরুদণ্ড সোজা রেখে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় পন্থাটিই তারা বেছে নিল। দুই শিবির—একদিকে সরকার, জমিদার, মহাজন ও তাদের পোষা গুণ্ডা; আর একদিকে দৃঢ় সংঘবদ্ধ হাজার হাজার আদিবাসী প্রতিস্পর্ধীর মতো মুখোমুখি লড়াই-এর ময়দানে সৈন্য সমাবেশ করল।

অত্যাচারের বিভীষিকার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, কিসান-সভার সমস্ত নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের থানা জেলা থেকে বহিষ্কার করা হল এবং শত শত আদিবাসী নেতাকে জেলে ভরা হল। লড়াইয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে, শান্তি রক্ষায় সহায়ক হিসাবে এক শ' পুলিস আনা হল। কয়েকদিনের মধ্যে সংখ্যা স্ফীত হয়ে পাঁচ শ'তে পেঁছাল এবং সবশেষে আইন-শৃংখলা বলবৎ রাখার জন্য এক হাজারের এক বিশাল পুলিসবাহিনী সেখানে হাজির হল। এক শ' উনচল্লিশটি গ্রামে জাল বিস্তার করা হল। প্রতিটি গ্রামেই একটি করে 'চেক্ পোস্ট' খোলা হল। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তারা টহল দিতে লাগল। যে কোন লোককে যে কোন সময় ধমক দিতে লাগল। প্রচার কার্যের জন্য অতিরিক্ত গাড়ি ও 'ওয়ারলেস ভ্যান' দেওয়া হল তাদের। আর তার সংগে কমিউনিস্ট প্রচারকে বিকল করে দিয়ে সরকারী প্রচারকে জোরদার করার জন্য সমান পাল্লা দিয়ে পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট 'প্রচার গাড়ি'র বিশেষ ব্যবস্থাও করল।

পুলিস অফিসার ও পুলিসবাহিনী গিয়ে উঠত জমিদারবাবুর বাংলোতে, সেখানে তাদের আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা হত বেশ রাজকীয়ভাবে। তাদেরকে পথঘাট, অলিগলি চিনিয়ে দেওয়ার জন্য ও নানাবিধ সংবাদ সরবরাহের জন্য জমিদাররা কয়েকজন ভাড়াটে গুণ্ডা রাখত। এইসব গুণ্ডাদের কাজ হতো আদিবাসীদের নাম গোত্র সংগ্রহ করে পুলিসকে জানানো, অবাঞ্ছিত আদিবাসীদের গ্রেপ্তার করানো, পুলিস যাদের খুঁজছে তাদের চিনিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এইভাবে সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি-পর্বের পর শুরু হল অত্যাচারের উলঙ্গ নৃত্য।

কোশবাড়ে (Kosbad) গিয়ে কয়েকজন মাড়োয়ারী জমিদার এবং পুলিস আদিবাসী মেয়েদের মারধোর শুরু করে দিল। তাদের অপরাধ হলো তাদের স্বামীরা কেন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেছে। হুংকার দিতে লাগল, "এক্ষুণি তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আয়, তা না হ'লে তোদের ইজ্জৎ ধুলোয় লুটিয়ে দেবো।

খোলওয়াড গ্রামে দশরথ শেঠের গোলাবাড়ির উঠানে কয়েকজন আদিবাসীকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করা হল। নৌসিয়া নামে একটি আদিবাসীকে একজন পুলিস মাঠের উপর ফেলে দিয়ে তাকে উত্তম-মধ্যম দিল, আরেকজন তার চুল ধরে টানতে লাগল। তৃতীয়জন তার পাঁজরার উপর মারতে লাগল —আর সর্বোপরি দারোগা সাহেব তার কানের উপর ঘুসির পর ঘুসি মেরে চলল; কাউকে বা পায়ে বেঁধে ঝুলিয়ে মারধোর করা হল। কাউকে গরাদে পুরে দুদিন ধরে না খাইয়ে ফেলে রাখা হল। আবার কারুর বা পিঠের

উপর চালানো হল চাবুকের পর চাবুক যতক্ষণ না রক্ত ঝরে পড়ে। এ ধরনের নিপীড়নের অন্যতম কারণ হচ্ছে কেন তারা পার্টি সংগঠনের মধ্যে জড়িত ব্যক্তিদের নাম বলবে না। প্রচণ্ড দমন-পীড়ন সত্ত্বেও কিন্তু ওয়ারলিরা একটা নামও ফাঁস করে দিল না। তারা নীরবে মুখ বুজে সব সহ্য করল।

বিরোধ মীমাংসার সূত্রে আদিবাসীদের বেঁধে ফেলার জন্য প্রয়াস চালাতে স্পেশাল অফিসার শ্রীসাভে হাজির হলেন নিকানা, বাঁধনা প্রভৃতি গ্রামে। তাঁর আহূত সভায় কেউই এল না। ক্ষেপে গেলেন ভদ্রলোক। যা তা বলে ভয় দেখাতে লাগলেন তিনি। শোনা যায় তিনি নাকি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিন জনের বেশী ওয়ারলিকে একত্র দেখলেই গুলি করে মারা হবে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ওয়ারলিদের জীবনকে তিনি রাস্তার কুকুর-বিড়ালের জীবনের দাম থেকে বেশী দামী ব'লে মনে করতেন না। ওয়ারলিরা সংগে সংগে এসে এ খবর আমাকে দিয়ে গেল। পরে আরও শুনেছিলাম কালেক্টর নিজেই কশা গ্রামে এসে একটা সভা ডেকেছিলেন। কিন্তু গ্রামের কেউই সেই সভাতে গেল না। এই দেখে তিনিও গেলেন ক্ষেপে। পুলিসকে আদেশ দিলেন, জঙ্গলের মধ্যে যারা গোপনে আশ্রয় নিয়েছে, বেছে বেছে সেই বাড়ির লোকগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য। উদ্দেশ্য হল, পরিবারবর্গকে এইভাবে অত্যাচারের যাঁতাকলে ফেলে সেই লোকগুলোকে গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করা, তারপর তাদের গ্রেপ্তার করা।

দমন-নীতি তার করাল নখদন্ত বিস্তার করল পালঘর তালুকের বিভিন্ন এলাকায়। আট দশ বছরের দু'টো নিষ্পাপ ছেলেকে পুলিশ দারুণভাবে প্রহার করল—কারণ তাদের বাবাকে পুলিস খুঁজে পাচ্ছিল না। একটি আদিবাসীকে দৈহিকভাবে একেবারে দলাই-মালাই করা হল। কমরেড নওহিয়া ওয়ারথা ও কমরেড জাটেবাবা মাসের পর মাস নওরা-নওরির পাহাড়ী এলাকায় আত্ম-গোপন করে রইল। [পাহাড় দুটিকে স্বামী-স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হত]। ধরা পড়ার পর তাদেরকে এমনভাবে প্রহার করা হল যে, গা-হাত-পা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। কমরেড দেওজী ট্যাণ্ডলের মাকে হুমকি দেওয়া হল ; যদি তার ছেলে ধরা না দেয়, তাহলে পুলিসকে আদেশ দেওয়া হবে—দেখা পেলেই যেন গুলি করে মেরে ফেলে, তারপর সেই মৃতদেহ তার মাকে উপহার দেওয়া হবে। কমরেড তানহু বলাবির কুঁড়েঘরটা পুড়িয়ে দেওয়া হল। বড় ছেলেটাকে নিয়ে সে জঙ্গলে পালিয়ে গেল, আর তার স্ত্রী ছোটটাকে নিয়ে অন্য একটা গ্রামে পালিয়ে গেল। কেউই জানতে পারল না তাদের তৃতীয় সন্তানটির কপালে কী ঘটল। তাদের পারিবারিক জীবন একেবারে বিধ্বস্ত

হয়ে গেল। দমন-পীড়নের এই বিভীষিকার সময় এমনতর দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়েছিল অনেককেই।

ঘরের মধ্যে কোন আদিবাসীকে দেখতে পেলেই, পুলিস তাকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে নানারকম বায়নাক্কা করতে লাগল—"খেতে দাও, সিধা দাও, মুরগী দাও, ডিম দাও ইত্যাদি ইত্যাদি।" কমরেড চন্দ্র দেওজী ও চম্প্রিয়া মহাদিয়াকে ভয় দেখানো হল যে প্রত্যেকে যদি কুড়ি টাকা করে না দেয়, তাহলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। নামধামসহ এমন ধরনের নানাবিধ অভিযোগ স্রোতের মতো আমাদের কাছে আসতে লাগল। নিষ্ঠুরতার শেষ সীমায় পেঁাছাল দৈহিক নির্যাতনের নিত্য-ঘটনা। কিন্তু তবুও সেই সমস্ত আদিবাসীরা—যারা এককালে পুলিস দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে যেত, তারাই এখন হাজার সংখ্যার বিশাল পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রস্তুত—যে পুলিস বাহিনী এখানে ওখানে এলাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল ও সর্বদাই টহল দিচ্ছিল।

জমিদার, মহাজন ও সরকার—এই ত্রি-শক্তির সম্মিলিত অভিযান আশা করেছিল যে আদিবাসীদের প্রতিরোধ আট দিনের মধ্যেই ভেঙে পড়বে। পরিকল্পনা প্রমাদ-প্রসূত বলে প্রমাণিত হল। পাহাড়ে, উপত্যকায় পালিয়ে গেল আদিবাসীরা, সেখানে তাদের শক্তি সংহত করলো এবং তারপর যুদ্ধের জন্য কোমর বেঁধে তৈরি হল।

আদিবাসীদের প্রতিরোধ

শত শত আদিবাসীকে গ্রেপ্তার করে যখন গারদে ভরা হল বাকীরা তখন ধরা না পড়ার জন্য জঙ্গলে, পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল ; শত শত পার্টি সভ্য আত্মগোপন করল ; অন্যান্য অনেক কৃষক তাদের অনুসঙ্গী হল। যে সমস্ত কমরেডরা আত্মগোপন করল, তারা পাহাড়ে, জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকেই অভিযান পরিচালনা করল। তাদের ধরার জন্য দমন প্রক্রিয়ার যন্ত্রগুলিকে আরও শাণিত করে তোলা হল। আদিবাসীরাও আপন আপন অভিজ্ঞতার আলোকে আত্মরক্ষার জন্য চাতুর্যপূর্ণ নানারকম কৌশল ও পদ্ধতির আশ্রয় নিল। তারা এটা লক্ষ্য করেছিল যে পুলিস কখনো একা একা বা দুজন একসংগে যাতায়াত করে না। সর্বদাই বেশ বড় সংখ্যায় দলবদ্ধ হয়ে ঘোরাফেরা করে। এর থেকে ওয়ারলিরা একটা শিক্ষা গ্রহণ করল। তারাও একা একা যাতায়াতের অভ্যাস পরিত্যাগ করল। পুলিসের থেকে বেশী বেশী সংখ্যায় তারা ঘেরাফেরা শুরু করল। ছোট ছোট দলের পরিবর্তে তারা একশ-দুশ এবং পাঁচশ সংখ্যার বড় বড় দল করল। তারা আমার

বলল, "দিদি, পুলিস সব সময় দলবদ্ধ ভাবে যায়, তাই আমরাও দলবদ্ধভাবে ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের দল তাদের থেকে সংখ্যায় অনেক ভারী"। তারা তাদের এই সব টহলদারি দলের মধ্যে কঠিনতম শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলত। প্রতি বাড়ি থেকে একজন করে যুবক দলে নেওয়া হত। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময়, বেশ কয়েকদিন বাইরে থাকার মতো বেশি করে খাদ্য বস্তু সংগে নিয়ে যেত। তার সংগের রেশন শেষ হয়ে গেলে সে বাড়ি ফিরে আসত, আর তার জায়গায় আরেকজন যুবক যোগ দিত, এই সব টহলদারি দল নিজ নিজ নেতার নেতৃত্বে জঙ্গলের মধ্যে টহল দিত, নেতাদের কাছ থেকে বিশ্রামের আদেশ পেলে তবেই বিশ্রাম নিত ও খাওয়া-দাওয়া করত। আবার নেতার নির্দেশ পেলে অভিযান শুরু হত। রাত্রিতে নেতার নির্দেশ ছাড়া আলো জ্বালা নিষিদ্ধ ছিল, এমন কি বিড়ি ধরানোর জন্যও নয়। কারণ জ্বলন্ত বিড়ির আগুনের আভায় তাদের নৈশ অবস্থান পুলিসের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই অত সতর্কতা। পুলিস, জমিদার বা মহাজনদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য বিশেষ লোককে দায়িত্ব দেওয়া হত। গতিবিধি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় খবরাখবর বিভিন্ন স্থানে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের। অপর কয়েকজনের উপর ভার ছিল, আমাদের কাছে সব ছবিটা তুলে ধরা। তাদের একমাত্র কাজ সর্বশেষ পরিস্থিতি ও ঘটনার অগ্রগতি সম্বন্ধে আমাদের সর্বদাই ওয়াকিবহাল রাখা। এইভাবে সরকারী অফিসার, জমিদার, মহাজনদের গতিবিধির উপর সদা সতর্ক নজর রাখা হত। আর অনুকূল পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ও সুযোগ বুঝে তাদের বিরুদ্ধে আদিবাসীরা অভিযান করত।

আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে সরকার, জমিদার ও মহাজনদের দমন-পীড়নের রথচক্র প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। কিন্তু তবুও হয়রানির আর শেষ নেই। এখন আদিবাসীরা সংখ্যায় অনেক। অনেক সহ্য করেছে তারা। ভাইয়ের উপর অত্যাচার আর তারা সহ্য করতে রাজী নয়। হামলার এক নতুন পন্থা তারা ধরল। শ্রীবরজোর নামের একজন পার্সি জমিদারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিশোধ নিল। এই জমিদার নানহু ঘরাট নামে একটি ওয়ারলির গায়ে কেরোসিন ঢেলে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল।

আদিবাসীরা একদিন দেখতে পেল, জমিদার-বাবু চলেছে পিম্পলশেট গ্রাম ছেড়ে একটা ট্রাকে চড়ে, সংগে আছে চৌকিদার চান্দু। তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক বলে মনে হল। তিন হাজার আদিবাসী ঘিরে ফেলল তাদের, ঘিরে গাড়িটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। কিন্তু মানুষগুলোর গায়ে কেউ-ই হাত দিল না, অক্ষত দেহে তাদের যেতে দেওয়া হল। এইটুকুই

তাদের শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আদিবাসীদের এই আক্রমণাত্মক কৌশল দেখে পুলিস, জমিদার-মহাজন ও তাদের চেলা-চামুণ্ডা, দালালদের মধ্যে বেশ ত্রাসের সঞ্চার হল। তারাও হামলার জবাব হামলা দিয়ে করার দিকে বেশি বেশি ঝুঁকে পড়ল।

আত্মরক্ষার জন্য আদিবাসীরা যখন বড় বড় দলে বিভক্ত হয়ে টহল দিতে শুরু করল, পুলিস ও জমিদারদেরও তখন হৃদ্‌কম্প শুরু হয়ে গেল। সম্মিলিত প্রতিরোধ ও প্রচারাভিযানের এই নতুন পন্থাটিকে ভেঙে ফেলার জন্য পুলিস গুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নিল। পালঘর তালুকের নানিবলি গ্রামে গুলি চলল। ৭।১।১৯৪৭ তারিখে পুলিস খবর পেল যে দু হাজারের এক আদিবাসী টহলদারি দল নানিবলির দিকে এগুচ্ছে। একজন সাব-ইন্সপেক্টর সংগে তার দলবল নিয়ে সেখানে বেরিয়ে পড়ল। ছত্রভংগ হওয়ার আদেশ দেওয়া হল তাদের। আদিবাসীরা সরতে চাইল না। ফলে পুলিস গুলি চালাল। পাঁচজন নিরপরাধ মানুষ নিহত হল। বহুলোক আহত হল। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির মুখ্য কার্যালয়ে ডাঃ কুলকার্ণি জনৈক আদিবাসীর কাঁধে ঢুকে যাওয়া একটা বুলেট বের করে এনেছিলেন। কিন্তু তাতেও আদিবাসীরা সন্ত্রস্ত হল না। যে সমস্ত ওয়ারলি আমার সংগে দেখা করতে আসত, তারা প্রায়ই বলত, "দিদি, আমাদের এই লড়াইয়ে আমরা মরব, তবুও পিছু হটব না। কত মানুষ আমাদের প্রাণ হারিয়েছে, কত অত্যাচার আমরা সহ্য [illegible], এখন কেন আমরা পরাজয়ের গ্লানি মেনে নেব? কেন পালিয়ে [illegible]।" অবাক হয়ে যেতাম তাদের এই মানসিক দৃঢ়তা দেখে, এক ধরনের হতাশার অনুভূতিতে দম বন্ধ হয়ে আসত আমার, কারণ কোন রকম সক্রিয় সাহায্য তাদের আমি করতে পারতাম না।

প্রায় ঐ সময়ের কাছাকাছিই কোশবাড় গ্রামেও গুলি চলেছিল। যারা দেখা করতে এসেছিল আমার সংগে, তারাই আমার কাছে ঐ সব ঘটনার বাস্তব কাহিনী বর্ণনা করেছিল:

"দিদি, কোশবাড় পাহাড়ের কাছে গুলি চলেছে। কমরেড গোবিন্দ আন্ধের এক সময় ফৌজে কাজ করত। সে তো আমাদের শুয়ে পড়তে বলল; আমরা মাটির উপর শুয়ে পড়লাম সব। তাই গুলি মাথার উপর দিয়ে চলে গেল—আমরা কেউই আঘাত পেলাম না, শুধু পাহাড়ের গায়ে গুলির আঘাতে ধুলো উড়তে লাগল।" সরকার পক্ষ তো এই গুলি চালানোর কাহিনী অস্বীকারই করেছে! তাই এই প্রসংগে আর কি বেশি বলা যেতে পারে?

নানিবলির গুলি-চালানোর ঘটনায়, অযথা কতগুলো নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। এই ঘটনা সম্বন্ধে আমরা তদন্তের দাবি জানালাম। কিন্তু

সরকার পক্ষ সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ৯৩ ধারা বলে সরকার যখন শাসন চালাচ্ছিল, তখনই এই গ‍ুলি-চালনার ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময়ে প্রয়াত বি. জি. খের ঘটনা প্রসংগে প্রকাশ্য তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেছিলেন, "মান‍ুষের জীবন পবিত্র। গ‍ুলি চালানোর ফলে সেই পবিত্র জীবন যদি বিনষ্ট হয়, সরকারের এটা অবশ্য কর্তব্য যে ঐ গ‍ুলি-চালানোর কারণ ও ঔচিত্য নির্ধারণের জন্য একটি প্রকাশ্য ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা।" ১৯৪৫ সালে যে খের সাহেব মান‍ুষের জীবন পবিত্র এই কথা বলে গ‍ুলি চালানোর জন্য তদন্ত দাবি করেছিলেন, সেই খের সাহেবই ১৯৪৭ সালের মধ্যে নিজের বলা কথাই ভুলে গিয়েছিলেন। যে আমলাতন্ত্র প্রকাশ্য দিবালোকে পাঁচ-পাঁচ জন নিষ্পাপ মান‍ুষকে হত্যা করেছিল, তিনি সেই আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিরই একজন প্রবক্তা ও ম‍ুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের প্রকাশ্য তদন্তের দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

আদিবাসীদের উপর অত্যাচার যত বেশী তীব্র হতে লাগল, তাদের প্রতিরোধও ততই দৃঢ় হয়ে উঠল। আর প্রতিরোধ বাড়ার সংগে সংগে, অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তা এমন চরম বিন্দ‍ুতে পেঁছাল যে আদিবাসীদের বিদ্রোহ ধ্বংস করার জন্য সৈন্যবাহিনী নামানো হল।

পাহাড়ে জংগলে গেরিলা য‍ুদ্ধ

শত শত আদিবাসীকে যারবদা, থানা, নাসিক এবং বিসাপ‍ুর জেলের মধ্যে ভরা হল। শেষ পর্যন্ত জেলের আর জায়গা হল না। যে কোন তুচ্ছ কারণে মান‍ুষগ‍ুলোকে ৬ মাস থেকে আরম্ভ করে ৭ বছর পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হল। অনেকেই গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করল—কেউ ৭ মাস, কেউ ৯ মাস, কেউ বা ১ বছর পর্যন্ত। দাবি প‍ুরণ হওয়ার পর, অনেকেই নিজেরা এসে কোর্টে আত্মসমর্পণ করল। অনেকেই শেষ পর্যন্ত ধরাও পড়ল না বা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণও করল না। আদিবাসী নেতারা তাদের গোপন আস্তানা থেকে বেশ সাফল্যের সংগে আন্দোলন পরিচালনা করল। মান‍ুষের মনে প্রেরণা দিল। এই সব দ‍ুরবর্তী ঘাঁটি থেকেই তারা দক্ষতার সংগে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করল। একজন তো মাঠের মধ্যে একটা চওড়া বাঁধের তলায় স‍ুড়ংগ কেটে তার মধ্যে একটা মাস কাটিয়ে দেন। সেখান থেকেই খ‍ুব সহজভাবে আরও ভালভাবে কাজ-কর্ম করা গেল।

আদিবাসীদের উপর এমন জঘন্যতম অত্যাচার চালানোর পর প‍ুলিসের আর একা একা গ্রামের মধ্যে যাওয়ার সাহস হল না। পাহাড়ে-জংগলে সমস্ত পথঘাট, যাতায়াতের প্রবেশ পথ, বাইরে আসার পথ আদিবাসীদের সম্প‍ূর্ণ

জানা। তাই সশস্ত্র অবস্থাতেও পুলিস তাদের সংগে পাল্লা দিতে পারল না। সারাদিন ধরে বড় বড় মিছিল ও প্রতিরোধ-অভিযানে অংশ নেওয়ার পর, রাত্রি নেমে আসার সংগে সংগে, কোথায় যে তারা জংগলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেত, পিছন থেকে তার কোন হদিশ পাওয়া যেত না। পুলিসের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার পথে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। পাথর আর কাঠের গুঁড়ি দিয়ে পাহাড়ী সংকীর্ণ রাস্তার উপর ব্যারিকেড তৈরি করল। অন্যান্য রাস্তাতেও একই কায়দায় প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলল। জংগলের মধ্যে পুলিসদের ঘোরাফেরা করা ক্রমে ক্রমে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। জংগল ঠিকাদাররা তাদের সচরাচর যাতায়াতের পথগুলো মাল পরিবহনের জন্য আর ব্যবহারই করতে পারল না, কারণ রাস্তাগুলোকে যাতায়াতের পক্ষে অযোগ্য করে দেওয়ার জন্য আদিবাসীরা তার উপর বড় বড় গর্ত খুড়ে রেখেছিল। সুকড়ুম্বা গ্রামটা একেবারে গভীর জংগলের মধ্যে। পাঁচজন সশস্ত্র পুলিস সেই গ্রামের পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সেখানে যাচ্ছিল। পাহাড়ী রাস্তার বাঁকে হাজার হাজার আদিবাসী তাদের আচমকা ঘিরে ফেলল। কয়েকজন পুলিস তো রাইফেল ফেলে দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাল। আদিবাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইফেলগুলো দখল করে নিল। কিন্তু আমরা তাদের বললাম যেখান থেকে তারা সেগুলো পেয়েছিল, সেখানেই যেন সেগুলো তারা রেখে আসে।

তবুও কিন্তু তাদের উপর নিষ্ঠুরভাবে নানান অত্যাচার ও মারধোর চলতে লাগল। এমন কি নারীর নারীত্ব ভূলুণ্ঠিত হল। জমিদার মহাজন তো চিরকাল ধরেই অত্যাচার চালিয়ে এসেছে, কিন্তু যখন দেখা গেল পুলিসও তাদের সংগে যোগ দিয়ে আক্রমণকে আরও তীব্র করে তুলেছে, সমগ্র আদিবাসী সম্প্রদায় যেন কেঁপে উঠল, ঘুম ভেঙে জেগে উঠল তারা। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল সব। তারা কখন যে কী করবে বা কী না করবে তা আগে থেকে অনুমান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। তাদেরকে শান্ত-সংযত রাখা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। পুরো আদিবাসী এলাকাটা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল। এমন কি খাওয়ার সময়ও তারা আর বাড়ি ফিরত না। কয়েকদিনের ভোজ্য সামগ্রী নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ত। কয়েকদিন পর পর তাদের বাড়ির মেয়েরা কোন এক পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায় তাদের জন্য ভকরি বা রুটি রেখে আসত আর তারা সেখান থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যেত। পুলিসগুলো খুব বে-ইজ্জত হতে লাগল। একবার সংবাদ এল, দু'শ আদিবাসীর এক টহলদারী দল তুম্বা গ্রামের দিকে এগুচ্ছে। সংগে সংগে এক শ' পুলিসের এক বাহিনী সব রকমের যুদ্ধোপকরণ নিয়ে সেখানে ছুটে গেল। গিয়ে দেখল সব ফাঁকা, কেউ নাই সেই গ্রামে, শূন্য হাতে সবার ফিরতে হল।

আর একবার তারা এমনিভাবেই বুনো হাঁসের পিছনে ছুটল জলওয়াল গ্রামের এক গিরিবর্ত্মে। কিন্তু সেখানেও একই ইতিহাস। এ ধরনের অনেক ঘটনা সে সময়ের খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যেত। আদিবাসীরা এইভাবে প্রায়ই গুজব ছড়িয়ে দিত ইচ্ছে করেই, তারপর মজা দেখত, খুব আনন্দ হত তাদের। পুলিসকে তখন আর তারা ভয়ই করত না।

একবার কয়েক শ' আদিবাসী অভিযান করল বোলওয়াড় স্টেশনের কাছে এক ঘাস-গুদামে। কারণ সেখানে অনেক ওয়ারলিকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তারা সব বন্দীকে মুক্ত করল। তারপর বিজয়ের আনন্দে চিৎকার করতে করতে তাদের বাড়ি ফিরিয়ে আনল।

সেই বিভীষিকার রাজত্বকালে একবার ১১ জন আদিবাসীকে পালঘর ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের কাছে ধরে এনে ফাটকে রেখে দেওয়া হল। যখনই ওয়ারলিদের কানে সে কথা গেল, হাজার হাজার আদিবাসী অফিস অবরোধ করে ধ্বনি দিতে লাগল, "বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে"। আদিবাসীরা পরে আমায় বলেছিল যে ক্রুদ্ধ জনতার সেই অগ্নিশর্মা রূপ দেখে অফিসের সমস্ত লোকেরা, এমন কি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। মামলাতদার সংগে সংগে ৫ জনকে ছেড়ে দিল। আরও প্রতিশ্রুতি দিল যে, পরের দিন বাকী ৬ জনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এইভাবে মুক্ত হয়ে তারা বাড়ি ফিরে গেল। সেই রাত্রিতেই মামলাতদার বাকী ৬ জনকে থানা জেলায় পাঠিয়ে দিল। কয়েকদিন পর বোম্বাইয়ে আসিবাসীরা আমার সংগে দেখা করতে এল। তাদের সহকর্মী ৬ জনকে এভাবে থানা জেলে নিয়ে আটকে রেখে দিয়ে মামলাতদার তাদের প্রতারিত করেছে—এ ঘটনায় তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তারা এসেছে আমাদের সাহায্য ও মতামত নিতে। তাদের পরিকল্পনা—হাজার হাজার আদিবাসী থানা জেলে অভিযান করবে এবং তাদের ৬ জন ভাইকে মুক্ত করে আনবে। যুক্তি তাদের বেশ পরিষ্কার—শখানেক আদিবাসী গিয়ে যদি পালঘর লক-আপ থেকে ৫ জন বন্দীকে ছাড়িয়ে আনতে পারে, তাহলে কয়েক হাজার আদিবাসী নিশ্চয়ই খুব সহজে থানা জেলখানা থেকে ৬ জনকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে। তাদের পরিকল্পনা যে সঠিক নয়, এবং তা পরিত্যাগ করা উচিত, একথাটা তাদের বোঝাতেই সারাটা দিন কেটে গেল। কমরেড পারুলেকর নানাভাবে সমস্যাটা তাদের কাছে বিশ্লেষণ করলেন। শেষ পর্যন্ত অসাধ্য সাধন করলেন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

একটা জিনিস সে সময় আমদের কাছে খুব রহস্যজনক বলে মনে হত। কীভাবে ওয়ারলিরা হঠাৎ করে, কোথাও কেউ নেই, অথচ শয়ে শয়ে এসে এক

জায়গায় সমবেত হত। পুরো সংগঠনটা এমন কার্যকরী রূপ নিয়েছিল যে একটা বাঁশীর শব্দেই হাজার হাজার আদিবাসী নানা দিক থেকে বন্যার ধারার মতো এসে হাজির হত। যাতে কোন রকম সন্দেহ জাগতে না পারে, তার জন্য তারা এমনই ভাব দেখাত যে কোথাও কিছু অঘটন ঘটছে না। বেশ নিরুপদ্রবভাবেই তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা কাটছে বলে মনে হবে। সন্দেহ এড়ানোর জন্য কেউ কেউ হয়তো "লাল ঝাণ্ডার" বিরুদ্ধেই নানা কথা বলতে লাগল, কিন্তু তাদের অন্তরের সত্যিকার চিন্তাধারা গোপনই থেকে গেল। তাদের চোখে চোখে নীরব ভাষায় কথা বলার ধরন, বাঁশী বাজানো এবং সংকেত-ইশারা—সমস্তই যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশ চমৎকারভাবে কার্যকরী হল। প্রথম প্রথম এটা খুব অস্বাভাবিক বলেই মনে হত আমাদের কাছে—আপাতদৃষ্টিতে কোথাও কোন গতিবিধি নাই, কোন হৈচৈ নাই, অথচ কোথা থেকে কেমন করে শত শত আদিবাসী হঠাৎ শূন্য থেকে যেন বাতাসে উড়ে এসে এক জায়গায় সমবেত হত।

বছরের পর বছর ধরে জমিদাররা তাদের গোলাবাড়িতে কাজ করতে আসা আদিবাসী মেয়েদের আপন জৈবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য উপভোগ করতে অভ্যস্ত ছিল। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে আরও নানারকম অত্যাচার-নিপীড়নের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে ঐ গোলাবাড়িগুলো। আন্দোলনের দিনগুলোতে সেগুলি পুলিসের মুখ্য কার্যালয়ে পরিণত হল। গোলাবাড়ি প্রাঙ্গণে চলল আদিবাসী অত্যাচারের নগ্ন উল্লাস। এইভাবে, যে গোলাবাড়ি-গুলোকে আদিবাসীরা, অত্যাচারের ক্রীড়াভূমি বলে আগের থেকেই ঘৃণা করত, যেহেতু পুলিস আবার সেখানে নিষ্ঠুরভাবে দমন-ক্রিয়ার প্রদর্শনী খুলে বসল, সেগুলি সম্পর্কে তাদের ধারণা আরও তিক্ত হয়ে উঠল। ক্রোধের আগুনে টগবগ্ করে ফুটতে লাগল তারা। একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়ল গোলা-বাড়িগুলোর উপর, ভেঙে তছনচ্ করে দিল সব। শুধু এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েকটি দেওয়াল। কতগুলো আবার এমনভাবে পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে গেল যে, তাদের এককালের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রমাণ-স্বরূপ এক টুকরো পাথরও আর সেখানে পড়ে থাকল না।

যে মুহূর্তে তাদের সুপ্ত শক্তি সম্বন্ধে তারা সজাগ হয়ে উঠল, সেই মুহূর্তেই আদিবাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সব গোলাবাড়িগুলো ধ্বংস করার কাজে—যেখানে তাদের মেয়েদের ইজ্জৎ ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। এমনতর ঘটনায় যে কোন শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে বিস্ময়ে হতবাক হওয়ার মতো তেমন কিছুই নাই। বাস্তিল-দুর্গ ধ্বংস করার জন্য ফরাসী জনগণকে ইতিহাস ক্ষমা করেছে। এমনকি তাদের অনুগামীরা তাদের এই কাজকে

২। কাঠ ও ঘাস পরিবহনের জন্য গরুর-গাড়ির ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।

৩। সমস্ত আদিবাসী বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

৪। নেতাদের উপর থেকে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে।

এই সমস্ত হ্যান্ডবিল তারা সেঁটে দিত জমিদার, মহাজন, জংগল ঠিকাদার সরকারী অফিসাররা প্রধানত যে সমস্ত বড় বড় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে থাকে, সেই রাস্তার বেশ সুবিধাজনক জায়গায়, গাছের উপর, তাদের বাস ভবনে এবং অন্যান্য প্রধান রাস্তার মূলে মূলে জায়গায়। তাই দেখে তাদের প্রতিপক্ষরা একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠত। কঠিন নিরাপত্তা-ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, কেমন করে সকলের নজর এড়িয়ে আদিবাসীরা এই সব ইশতেহার ছড়াচ্ছে তা ঐ সরকারী অফিসাররা বা তাদের অনুচরবর্গ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।

এই প্রচার পত্রের সংগে পুলিসের উদ্দেশ্যে তারা আরও একটা প্রচারপত্র সাঁটলো পুলিসও যে কৃষক পরিবার থেকেই এসেছে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। তারা সেই প্রচারপত্রে পুলিসের প্রতি আবেদন জানানো হলো তারা যেন আদিবাসীদের উপর অত্যাচার এবং তাদের উপর গুলি চালানো থেকে নিজেদের বিরত রাখে, কারণ কৃষক হয়ে সহধর্মী কৃষকের রক্ত ঝরানোটা সঠিক নয়। এই সব হ্যান্ডবিল এক রাত্রির মধ্যেই সারা এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হল। পরের দিন পুলিস-অফিসাররা তা দেখে অসহায়ের মতো ফলাফলের কথা ভেবে ভেবে শুধু হাই তুলতে লাগল, কিছুই করতে পারল না। কিন্তু কিছু সাধারণ পর্যায়ের পুলিস, যারা আদিবাসীদের মর্মন্তুদ অবস্থা দেখে কিছুটা অনুকম্পা বোধ করত, তারা পুলিসের এই হেনস্তা দেখে মনে মনে বেশ খুশীই হয়ে উঠল, ভাবটা যেন, "বেশ দিয়েছে, ঠিক করেছে"। এ ঘটনা অবশ্য উচ্চ-পদস্থ পুলিস অফিসারদের দৃষ্টি এড়াল না। শোনা যায় ৭ জন পুলিসকে সে সময় সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করার জন্য আরও অফিসার আনা হল। আদিবাসীদের সুদৃঢ় সংগঠন প্রসংগে বলতে গিয়ে পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট একটি সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন ঃ

"আদিবাসীরা নিজেদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে রেখেছে। দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে তাদের সংগঠন। সারা জেলার সর্বত্র এদের সংগঠনের শিকড় মাটির গভীরে চলে গিয়েছে। তাদের নিজস্ব সংবাদ সংগ্রহের বাহিনী রয়েছে—সমস্ত সংবাদ তাদের নখদর্পণে।"

সমস্ত গ্রামেই পার্টি সভ্যরা নিজ নিজ নিরাপত্তার কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সংগ্রাম পরিচালনা করছিল। অধিকাংশই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল ছিল। যদি তাদের কেউ গ্রেপ্তার হয়ে যায় বা কাউকে গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিতে হয়, তাহলে সংগে সংগেই অন্য একজনের উপর দায়িত্বভার এসে যায়। লড়াকুদের পরিচালনার গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। এমন দৃঢ়মূল সংগঠনের মোকাবিলায় পুলিস যখন একেবারে শক্তিহীন হয়ে পড়ল, তখন সরকার সৈন্য-বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

মারাঠা লাইট ইনফ্যানট্রির একটা রেজিমেণ্ট পাঠানো হল। তারা কল্যাণে তাঁবু গেড়ে বসল। রেজিমেণ্টের অগ্রগামী বাহিনী দহানুতে গিয়ে ঢুকল, কিন্তু প্রচণ্ড জনমতের চাপে সংগে সংগেই তাদের ফিরিয়ে আনতে হল। তারপর শ্রী মুর গিলবার্টকে এ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট পুলিস সুপারিন-টেনডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হল। ভদ্রলোক সাতারা জেলার কৃষক বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে তাঁর জাতীয়তা-বিরোধী ও জনবিরোধী ক্রিয়া-কলাপের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাকেও ফিরিয়ে আনতে হল প্রচণ্ড জনমতের চাপে।

সৈন্য-বাহিনী পাঠানোর সংবাদে আদিবাসীরা কিন্তু একটুও ভীত হল না। পক্ষান্তরে, লড়াইয়ের জন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দিতে তারা মনে প্রাণে সিদ্ধান্ত নিল। এই জরুরী-অবস্থার সময়, রাজ্যের সমগ্র সভ্য শিক্ষিত মানুষ আদিবাসীদের সমর্থন করল। "ফ্রি প্রেস জার্নাল", "দি বোম্বে ক্রনিক্ল", "দি সেণ্টিনেল", "নবযুগ" এবং "জয়হিন্দ" প্রভৃতি সংবাদপত্র আদিবাসীদের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠল। হ্যাঁ এটা ঘটনা যে এই সংবাদ-পত্রগুলিই কমিউনিস্ট পার্টির যে সব নীতির সংগে এক মত নয় বলে পার্টিকে তিক্তভাবে সমালোচনা করেছিল এবং পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধেও নানা রকম প্রচারে মেতেছিল, সেগুলিই কিন্তু এই কথা ঘোষণা করল যে, আদিবাসীদের দাবি এবং আন্দোলন সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। বংশ-পরম্পরা ধরে যারা দাসত্বের শৃঙ্খলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে, তাদের আন্দোলন বিধ্বস্ত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য-পাঠানো একটা গর্হিত কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহারাষ্ট্রের উদারমনা শ্রদ্ধেয় নেতারা—যেমন প্রয়াত এন. এম. যোশী, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রী দত্ত বামন পোতদার, প্রয়াত অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং আরও অনেকে, যাঁরা আদিবাসীদের সম্বন্ধে অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন, তাঁরা সবাই আদিবাসীদের ন্যায্য দাবিগুলি ও তাদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে

তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য-বাহিনী প্রয়োগের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। মহারাষ্ট্র কংগ্রেস কমিটি নিয়োজিত "অনুসন্ধান কমিটির"—কার্যনির্বাহী সদস্যারা যে কয়েকটি জরুরী সুপারিশ করেছিলেন, তাতেও প্রমাণিত হয় যে, আদিবাসীদের দাবিগুলি সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত।

মহাত্মা গান্ধীর অনুগামী ও সর্বোদয়ের প্রখ্যাত নেতা শ্রীনরহরি পারেখ "হরিজন" পত্রিকায় আন্দোলন প্রসংগে লিখতে গিয়ে আদিবাসীদের সপক্ষে যে ন্যায়নিষ্ঠ যুক্তি আছে—এই মতামত ব্যক্ত করলেন। শেষ পর্যন্ত সংবাদ-পত্র, স্বাধীনচেতা উদারমনা মহারাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ, কয়েকজন সর্বোদয়-কর্মী এবং সাধারণ মানুষ—প্রত্যেকের অনুরূপ মতামতের প্রচণ্ড চাপে সরকারপক্ষ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল। সৈন্য-বাহিনী ফিরিয়ে আনা হল। শ্রী মনুর গিলবার্টকেও ফেরত পাঠানো হল। ১৯৪৭ সালের ৫ই এপ্রিল প্রয়াত বি. জি. খের মন্ত্রী আদিবাসীদের মুক্তি ঘোষণা করলেন। তাদের কিছু সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হল।

জেল-ফেরত ওয়ারলিদের নিজ নিজ গ্রামে বীরের সম্মানে ভূষিত করা হল। ধানোরী গ্রামে প্রত্যাগত নেতাদের সম্মানে মধ্যাহ্ন-ভোজের আয়োজনের জন্য ৪৫ টাকার একটি তহবিল সংগ্রহ করা হল। মুক্তির পর থেকে প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে ওয়ারলিরা কেউই বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ পেল না। আশ-পাশের গ্রাম থেকেও অভিনন্দন ও মধ্যাহ্ন-ভোজের আমন্ত্রণের বন্যা আসতে লাগল। এক দিকে সাধারণ মানুষ তাদের বিজয়ী বীরের মতো সম্মান দেখাতে লাগল। আর অপরদিকে, শ্রীমোরারজী দেশাই ও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তাদের গুণ্ডা বলে অভিহিত করল। এই সব গরিব মানুষগুলোকে এইভাবে গুণ্ডা বলে অপমানিত করার মধ্য দিয়ে তাদের ঘৃণা, অজ্ঞতা, অনাস্থা এবং অন্ধ কুসংস্কারেরই আভাস মেলে।

আদিবাসীরা তো মুক্তি পেল, কিন্তু আমাদের উপর থেকে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করা হল না। সরকারপক্ষের আশা ছিল যে, নেতাদের মুক্তি দিয়ে এবং তার সংগে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আদিবাসীদের মন জয় করা সম্ভব হবে। কিন্তু আর একবার সরকার পক্ষের হিসাব ভুল বলে প্রমাণিত হল। থানা জেলায় আমরা আবার ফিরে গেলাম ১৯৫৩ সালে। ইতোমধ্যে আদিবাসীরা তাদের শান্ত-জীবন-যাত্রা শুরু করে দিয়েছে; নতুন পাওয়া সুযোগ-সুবিধার পুরো ফসল তারা ঘরে তুলছে। কিন্তু কোথায় যেন মনের গভীরে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তারা ছটফট করছিল। প্রতিমুহূর্তে মনে পড়ছিল আমাদের বহিষ্কারের কথা, তাদের জেল-জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী, যেন সব সময় কাঁটার মতো মনের গভীরে রক্ত ঝরছিল।

এই সময়টা জুড়ে আমাদের প্রতিপক্ষরা সংবাদপত্রের শিরোনামা করে বিজয়ী বীরের মতো নানা রকম সমালোচনা ও মন্তব্য করে যাচ্ছিল—"লাল ঝাণ্ডার মোহ ওয়ারলিদের ছুটে গেছে, এখন তারা সবাই কংগ্রেসী ঝাণ্ডার ছত্র-ছায়াতলে এসে সমবেত হয়েছে"—ইত্যাদি ইত্যাদি। ওয়ারলিরা বা আমরা কেউই এই ধরনের মন্তব্য গ্রাহ্য করলাম না। সাত বছর পরে, ১৯৫৩ সালে, কমরেড পারুলেকর ও আমি যখন বহিষ্কারের রাহু-মুক্তির পর ফিরে গেলাম—সেদিনই খুশির চমকে তাদের মুখগুলি ছিল সত্যিই দেখার মতো। মহালক্ষ্মীতে মার্চ মাসে প্রথম সভা করলাম আমরা। আর শত্রু-পক্ষ নির্নিমেষ নয়নে দেখতে লাগল—হাজার হাজার আদিবাসীর জনস্রোত—তাদের হাতে উড়ছে লাল-নিশান। কণ্ঠে জয়ধ্বনি। পিপাসার্ত মানুষ যেমন জলের সন্ধানে জলাশয়ের দিকে ছুটতে থাকে, ঠিক তেমনি যেন মানুষগুলো ছুটে আসছে সভার কেন্দ্রবিন্দুর দিকে।

সংগ্রামের সাফল্য : শ্রেণী-সচেতন কিসান

১৯৪৫ সাল থেকে আন্দোলনের যে পবিত্র আগুন জ্বলছিল, সেই অগ্নি-কুণ্ডে আদিবাসীরা একের পর এক আহুতি দিয়ে চলল তাদের যুগ-যুগ সঞ্চিত পাপের বোঝাগুলি। যেমন : ভূমিদাস-প্রথা, বিবাহিত-দাস-প্রথা, বেগার-প্রথা, দু-চার আনার পারিশ্রমিকে জংগল কাটাই ও ঘাস কাটাই-এর প্রথা, খন্দ বা খাজনার বকেয়া হিসাবের বিশাল পাহাড় এবং শোষণ-যন্ত্রের আরও অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এই প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে একদিকে জেগে উঠল আদিবাসীদের দুর্বার সাহস, অদম্য মনোবল, আর অপরদিকে সরকার, জমিদার ও মহাজন সম্প্রদায় ডুবে গেল তাদের অমানবিকতার অতি গভীর অতলে অত্যাচারের শাসনের মধ্যে। অসীম শক্তি-সামর্থ্য, অগাধ ধনরাশির মূলধন আর সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ও গুণ্ডা-মাস্তানের সহযোগী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে যারা লড়াইয়ের ময়দানে অভিযান করত, তারাই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হল দাঁত দিয়ে মাটি কাটতে, নতি স্বীকার করতে। কাদের সামনে ? না সেই সব অর্ধনগ্ন অর্ধ-ভুক্ত মানুষগুলোর কাছে—যাদের একমাত্র হাতিয়ার হলো আত্মোৎসর্গের মানসিক বল, দুর্ভেদ্য সংঘশক্তি আর সর্বস্ব উৎসর্গের অচল নিষ্ঠা। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জন্ম নিল এক একটি শ্রেণী সচেতন কিসান।

কমরেড রূপজী কড়ু, কমরেড গোবিন্দ আম্বের, শিড়বা সাপাট, দেবজী ট্যান্ডেল, নওসিয়া বার্থা, ঝাটেবাবা, তানহু বর্জাভ, মারিয়া, ইরীম, ফেল্যা ধ্যাংড়া, কাকড্যা সুতার, কমরেড ধাকড় সুতার প্রমুখের মতো অনেক

মানুষ পাওয়া গেল। আর কত নাম উল্লেখ করব? এমন শত শত আদিবাসী রয়েছে, যারা পাহাড়ে-জংগলে দিন কাটাত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, রাত দিন সহ্য করত যত রকমের দুঃখ-কষ্টের দুঃসহতম যন্ত্রণা। তারা বলত আমায়, "দিদি! আপনি একবার দেখে আসতে পারতেন, আমরা কেমন করে দিন কাটাতাম, কী রকম সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে। আমরা একজায়গায়, আর অন্য এক জায়গায় রয়েছে আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। যেদিন রুটি জুটত সেদিন তো নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করতাম। হাঁটতে হাঁটতে, পাহাড়ী পথে চড়াই-উৎরাই পের হতে পা-গুলো ফুলে উঠত। কখনো বা রক্ত ঝরে পড়ত। পুলিস সব-সময়ই পিছনে লেগে রয়েছে, প্রায়ই তাই ছুটতে হত আমাদের। আর একবার যদি ধরা পড়তাম, তাহলে অত্যাচারের আর সীমা থাকত না, বর্ণনারও তা অযোগ্য।" একটা জিনিস সব সময়েই আমার মনটাকে যেন কুরে কুরে খেত, একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কেমন কষ্ট হত—এই সাহসী মানুষগুলো তো কোনদিন পুরস্কারের প্রত্যাশায় সামনের দিকে তাকিয়ে থাকত না, কেউ তো তাদের কথা লিখত না বা কোনদিনও তাদের ছবি সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পেত না অথবা তাদের মালা পরিয়ে বরণও করত না কেউ। ভালো কাজের কোন আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতিও তো ছিল না সামনে। শুধু মাত্র একটি পুরস্কারই তারা প্রত্যাশা করত—তারা তাদের দিদির সংগে অর্থাৎ আমার সংগে দেখা করতে পারবে এবং কমরেড পারুলেকর তাদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাহসী সংগ্রামের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, তাদের অভিনন্দন জানাবে—শুধু এইটুকুই। একবার যদি তারা তার কাছে শুনতে পেত যে তারা সাহসী, তারা বীর সৈনিক, তাহলেই খুশির আলোকে তারা ডগমগিয়ে উঠত। আর কিছুই তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, আর কোন কিছুর ধারও তারা ধারত না। তারা যে দাসত্বের অবসান ঘটানোর জন্যই লড়াই করছে—এ বিষয়ে তারা সচেতন ছিল। আর এই কাজের জন্য লড়াই করাটা তারা কর্তব্য বলেই ধরে নিয়েছিল। আজও পর্যন্ত তাদের একমাত্র কামনা—দারিদ্র্যকে নির্মূল করার জন্য, গরিব মানুষগুলোর জীবনের মানোন্নয়নের জন্য শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িতদের ক্ষমতায় আসা অবশ্যই কর্তব্য। আর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য, যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তারা মনে প্রাণে উন্মুখ হয়ে আছে।

দহানু, উম্বরগাঁও ও পালঘর তালুকে ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে অভূতপূর্ব আদিবাসী কৃষক আন্দোলন চলেছিল, সেই কাহিনী মহারাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকার মর্যাদা রাখে। মহারাষ্ট্রের শোষিত কৃষক কম-বেশি যেটুকু সুযোগ-সুবিধা ১৯৪৫

সালের পর থেকে পেত, তার জন্য কৃতিত্ব ও সম্মানের সিংহভাগটুকু ঐ ওয়ারলিদেরই প্রাপ্য, নিম্নতম মজুরি আইন, ক্ষেত-খামারে নিযুক্ত কৃষি-শ্রমিকের বর্ধিত মজুরি, কৃষকদের দেয় খাজনা হ্রাস ইত্যাদি আরও অনেক রকম সুযোগ সুবিধা মহারাষ্ট্রের অন্যান্য কৃষকরাও আইনানুগভাবে ভোগ করতে লাগল। অবশ্য ঐ সব কৃষকদের মধ্যে সাংগঠনিক স্তরে দুর্বলতা থাকায় ঐ সব সুযোগ-সুবিধাগুলি শুধু কাগজে প্রতিশ্রুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল। কৃষক সংগঠনের সহায়তাই কেবল ঐ সুবিধাগুলি কার্যকরী রূপ লাভ করতে পারে, তবেই কৃষকরা কিছুটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। আর তা যখন হবে, তখনই মাত্র আদিবাসীরা অনুভব করতে পারবে যে তাদের সংগ্রাম সত্যিকারের সার্থকতা লাভ করেছে। মহারাষ্ট্রে অন্যান্য কৃষকরা যখন লড়াকু সংগঠন গড়ে তুলতে পারবে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে—তখনই মাত্র আদিবাসীরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সত্যিকারের আনন্দ পাবে, নিজেদের সংগ্রামের ফল ফলতে দেখে নিজেদের গর্বিত মনে করবে।

একাদশ অধ্যায়

নদীর অপর পারে

আমাদের বহিষ্কার করে এবং আরও অনেককে গ্রেপ্তার করে, জমিদার মহাজনের দল আমাদের অনুপস্থিতির পুরো ফয়দা ওঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত তারাই জিতবে। সপারিষদ জমিদার মহাজনবর্গ পালঘর, দহানু এবং উম্বরগাঁও প্রভৃতি ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের যে কোন প্লাট-ফর্মে যখনই কোন আদিবাসীকে দেখতে পেত, তখনই তাদের উদ্দেশ্যে নানা রকম চটুল মন্তব্য ও বিদ্রূপবাণী ছুঁড়ে মারত। আঙুল দেখিয়ে ঘৃণাভরে বলত, "কিরে? তোদের 'লাল ঝাণ্ডা' এখন গেল কোথায়? আর তোদের সেই দিদিমণি? আমাদের সরকার তাকে খেদিয়ে দিয়েছে। তাকে গরাদে পোরা হয়েছে। এমন কি তোদের সেই লাল-ফৌজ (লাল ঝাণ্ডার কর্মী) তারাও পালিয়ে গেছে। দিদিও গেছে, আর ঝাণ্ডাও গেছে। সুতরাং এখন তোরা আর আমরা একেবারে মুখোমুখি। এবার তোদের পালা। পালাবিটা কোথায়? যতই গলা ফাটিয়ে চিৎকার কর, কেউ তোদের রক্ষা করতে আসবে না। গাছের সংগে বাঁধবো, পায়ে বেঁধে ঝোলাবো, তারপর আচ্ছা করে দলাই-মলাই চালাবো। ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে লাঙল টানতে বাধ্য করবো।" আবার কেউ বা বলত। "যা ব্যাটা যা, তোদের সেই দিদিমণি আর লাল ঝাণ্ডার কাছে যা। তারা তোদের 'খাওটি' (Khawti) আর মজুরি দেবে। [প্রয়োজনে জমিদারের কাছ থেকে জিনিসপত্র ধার নেওয়া—যেটার দেড়গুণ, দুগুণ, কখনো বা তিন গুণ ফেরত দিতে হত তারই নাম 'খাওটি'] আমাদের কাছে এসেছিস কেন?" আদিবাসীদের উপর অত্যাচারের নেশায়, জমিদার কুসীদজীবীর দল খুশিতে একেবারে পাগল হয়ে গেল। ঘাটে, মাঠে-বাটে—যেখানেই হোক, কোন আদি-বাসীকে দেখতে পেলেই, তার উদ্দেশ্যে নানারকম নোংরা মন্তব্য ছুঁড়ে তাদের খুশির ঝিলিক ছড়াত, তাদের মুখের উপর নিষ্ঠুর হাসির ফোয়ারা ছোটাত, আদিবাসীরা আমাকে বলত, "জানেন দিদি, জমিদার-পুংগবরা প্লাটফর্মের উপরেই আমাদের দেখে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিত, নানারকম অংগভংগি করে খুব বিরক্ত করত"। আদিবাসীরা কিন্তু এ ধরনের নির্লজ্জ অপমানেও বিচলিত হত না। মুখ বুজে সব সহ্য করে তাদের স্বভাব-সিদ্ধ মৌনতায় কাজ করে

যেত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্রোধের আগুনে জ্বলত। তারা শুধু মনে প্রাণে চাইত—"একবার আমার সংগে দেখা হবে, প্রাণ খুলে জমিদার বাবুদের কীর্তিকাহিনী আমাকে বলবে, আমায় জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে—আমরা কি ভাবছি, কী আমাদের পরিকল্পনা, কি ঘটতে যাচ্ছে, আর তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থাই বা কী হবে এই সব।" তাদের মধ্যে যারা আবার চিন্তা-ভাবনায় একটু পিছিয়ে-পড়া, তারা তো এতদিন আমাকে দেখতে না পেয়ে খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তারা তো ভাবতেই শুরু করেছিল ; আর বুঝি কখনো আমার দেখা পাবে না! তখন কী হবে তাদের? কাজ কর্ম চলবে কি করে? তারা আমায় দেখতে চাইত, একবার শুধু দেখা করতে চাইত। আমার কাছে খবর পাঠাত। "দিদি, একবার অন্তত আসুন। তাতেই মানুষ সাহস পাবে। আমরা আপনাকে জীবন দিয়ে রক্ষা করব।" অবশ্য গ্রেপ্তারের পরোয়া আমি করতাম না। বহুবার আমি জেল খেটেছি, তাই ভয় আমার একটুও ছিল না। কিন্তু আমি যদি বাইরে থাকতে পারি, এবং প্রয়োজনে আমার সাক্ষাৎ, পরামর্শ পাওয়া যায়, তাতেই বরং সাধারণ মানুষের মনে সাহস বাড়বে, আত্মবিশ্বাস জাগবে। যদি একবার আমি থানা জেলায় যাই, আর দৈবাৎ সেখানে ধরা পড়ি, তাহলে তার ফলাফলটা কী দাঁড়াবে! আন্দোলনের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তখন! কাজেই যাওয়ার ব্যাপারটা খুব ভাল করে সব দিক থেকে ভেবে চিন্তে দেখা দরকার।

সমগ্র পরিস্থিতি, নানাদিক থেকে খুঁটিনাটি সব কিছু বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—একবার আমি সেখানে গিয়ে ঘুরে আসব। সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কমরেড পারুলেকর হাতটা রাখলেন আমার পিঠের উপর, বললেন, "এসো তবে, খুব সাবধানে থেকো। যা হবার তা হবেই, এর বেশি কীই বা আর করতে পারি।" জীবনে লক্ষ্য পূরণের পথে ভাবাবেগের কোন স্থান নেই, সব আবেগ-উচ্ছ্বাস দূরে সরিয়ে রাখতে হয়! এটা ঠিক যে, একবার যদি ধরা পড়ে গ্রেপ্তার হয়ে যাই, তাহলে চরমতম শাস্তি আমায় ভোগ করতেই হবে। আর তার অর্থ অন্ততঃ চার বছরের জন্য কমরেড পারুলেকরের সংগে সাক্ষাৎ না হওয়া। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত আমাদের আত্মগোপন করতে হয়েছিল। আমি যদি গ্রেপ্তার হয়ে যাই, তাহলে আমি চলে যাবো জেলে আর কমরেড পারুলেকর কাটাবেন গোপন আস্তানায়। ব্যাপারটা খুব দুর্ভাগ্যজনক হয়ে দাঁড়াবে তখন। তবে তেমন পরিস্থিতি অবশ্য কখনো আসেনি। গ্রেপ্তার আমি হইনি। আমার প্রতি আদিবাসীদের ভালবাসা, তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য এবং আমলাতন্ত্রের প্রথাসিদ্ধ অনবধানতায়, প্রায় পনের দিন ধরে উম্বরগাঁও,

দহানু তালুকের বিভিন্ন জায়গায় পায়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর নিরাপদে, অক্ষতদেহে বোম্বাই ফিরে এলাম।

"প্রথমে আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দাও"

মহালক্ষ্মী গ্রামে যাচ্ছি—এই অছিলায় বোম্বাই থেকে যাত্রা করলাম। গাড়িতে ছিলাম আমরা তিন চার জন। বোম্বাইবাসীদের কাছে মহালক্ষ্মী একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্র। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষভাবে দেবীর কাছে মানত করলে, দেবী প্রার্থনা পূরণ করে বর দেয়—এরকম একটি প্রসিদ্ধি মহালক্ষ্মীর আছে। পথে কেউ আমাদের আটকাল না। দহানু তালুকের চারোটী গ্রামের একটু আগে, একটা পথের মোড়ে গাড়ি থেকে আমি নেমে পড়লাম। আমায় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে গেল। এলাকাটা সম্বন্ধে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা খুব কাজে লাগল। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলাম গ্রামের পুলিস-পাটিলের (গ্রাম-প্রধান) বাড়িতে। তার সংগে আগেই আমার পরিচয় ছিল। ভদ্রলোকের স্ত্রী আমাকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল, "তুমিই আমার স্বামীকে জেলে পাঠিয়েছ। যাও আগে তাকে ফিরিয়ে আন।" ঐ একই সুরে আরও অনেক কথা বলে গেল; যা শুনলাম, তাতে তো গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। দমন-চক্র শুরু হওয়ার আগে আমি একবার চারোটী গ্রামে এসেছিলাম! পুলিস-পাটিল তখন খুব বড় বড় কথা বলেছিলেন। আমি তখন তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, "আপনি তো পুলিস-পাটিল, কাজেই খুব ভেবে চিন্তে কথা বলা দরকার"। ভদ্রলোক বেশ জোরের সংগেই উত্তর দিলেন, "আমি কাউকে ভয় করি না, কাউকে পরোয়াও করি না"। আমি যে বাড়িতে সেদিন ছিলাম, পাটিল সেই রাত্রিটা সেই বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। সে রাত্রিতে অনেক কথাবার্তা হলো দুজনের মধ্যে! ভদ্রলোক নিজেকে জনগণের নেতা মনে করে, তার সেই নতুন ভূমিকায় এমনই মেতে উঠেছিলেন যে, হঠাৎ করে তাকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য বা কর্মী বলেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আর তার ফলে গ্রেপ্তারও হয়ে গেলেন। যে মুহূর্তে দমন-চক্র শুরু হলো, সেই মুহূর্তেই ভদ্রলোকের সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা, একেবারে বেলুনের মতো চুপসে গেল। পাটিলগিরি ঘুচে যাবে—এই আশংকায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ ঘাবড়ে গেলেন। পরে পাটিল সাহেব মুচলেকা দিয়ে নিজের মুক্তি কিনেছিলেন। আমি যখন তাদের বাড়িতে গেলাম, তখন তার স্ত্রী তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য নানারকম তম্বির তদারকি করতে খুব ব্যস্ত ছিল। পাটিলের গ্রেপ্তারের পর থেকে কী কী ব্যবস্থা হয়েছে—সে বিষয়ে আমার

আদৌ কোন ধারণা ছিল না। ভদ্রমহিলার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে আমার তো কাহিল অবস্থা, মনে হল—এ কাকে দেখছি—এ যেন সম্পূর্ণ অচেনা। খুব হতাশ হয়ে পড়লাম, কেমন যেন সন্দেহ জাগল। শুরুতেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কপালে আরও কত কী রয়েছে।

ভদ্রমহিলা কোন যুক্তির ধার ধারতে রাজী নয়—একেবারে কানে তুলো দিয়ে রেখেছে। তার একমাত্র বক্তব্য "আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও"; সেখানে থাকাটাই খুব বিপজ্জনক ব্যাপার, তাই সংগে সংগে পিছু হঠলাম। কাছাকাছি একটা পাড়ায় চলে গেলাম, সেখানে একটা বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। খুব সৌভাগ্যের কথা—বেশীর ভাগ আদিবাসীরাই আমাকে চেনে, তা না হলে ব্যাপারটা খুব ঘোরালো হয়ে দাঁড়াত। যে বাড়িতে ঢুকলাম, সেখানে দেখি দুটি মেয়ে ধান ভানছে। আমায় দেখতে পেয়েই, তারা তক্ষুণি বাড়ির পুরুষদের ধরে নিয়ে আসতে চাইল। আমি তাদের বোঝালাম—ওতে সময় লাগবে অনেক। তাছাড়া ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে আটকে থাকাটাও বিপজ্জনক। ব্যাপারটা তারা বুঝতে পারলো সংগে সংগে। তাদের একজন, নোংরা কাপড়ে জড়ানো আমার জামা-কাপড়ের পুঁটলিটা মাথায় চাপিয়ে আমার সংগে বেরিয়ে পড়ল। পাহাড়ের উপর দিয়ে কিছুটা হেঁটে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে প্রধান সড়কটা পার হয়েই 'বধানা' গ্রামে পেঁছে গেলাম।

দূর থেকে আমাকে চিনতে পারার সংগে সংগেই, জায়গাটার হালচাল যেন বদলে গেল। আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল সব। ছেলেগুলো বাঁধের উপর উঠে এসে, গ্রামের মধ্যে খবর দেওয়ার জন্য ছুটে চলে গেল। গ্রামের একজন তার বাড়ির বারান্দাটা সংগে সংগে ঝাঁটা দিয়ে পরিস্কার করে একটা চাটাই বিছিয়ে দিল। মুখে একটা কথাও বলল না কেউ, কিন্তু সমস্ত পরিবেশটা যে হঠাৎ কেমন বদলে গেল—এটা, যে কোন মানুষেরই হোক চোখে না পড়ে যায় না। জায়গাটা যেন প্রাণ ফিরে পেল। ছেলেগুলো ছুটোছুটি ফেলে দিল এদিক ওদিক, আর প্রবীণদের সেই নীরব আনন্দ যেন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। এই সব দেখে শুনে আমার হৃত-মনোবল আবার ফিরে এল। যে বাড়িতে উঠেছিলাম, সেটা কসা-দহানু মূল সড়কের খুব কাছেই। কাজেই বেশিক্ষণ সেখানে থাকাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না, ঝটপট্ চা-ও তৈরি হয়ে গেল, বৈঠক কোথায় করা হবে তাও ঠিক করা হল। আশে-পাশের সব কর্মীদের খবর দিতে বলে আমরা আবার উঠে পড়লাম। পাহাড়ের কোল ধরে এগিয়ে চললাম। আড়াল না হওয়া পর্যন্ত তারা আমাদের দেখতে লাগল পাছে আমাদের গোপন বৈঠকের জায়গার কথা অন্য কোন অনুসরণকারীদের কাছে ফাঁস হয়ে যায় তাই সে সম্ভাবনা দূর করার জন্য আমরা অনেক এঁকে

বেঁকে, এদিক ওদিক ঘুরে পাহাড়ের মধ্যে একটা খাড়া উঁচু জায়গায় হাজির হলাম। তখন প্রায় এগারটা বেজে গেছে। সেখান থেকে খেয়ে আসা চায়ের গুণে এবং সেখানে আদিবাসীদের বেশ হর্ষোৎফুল্ল মনোভাব দেখে আমার সব দৈহিক ও মানসিক অবসাদ দূরে হয়ে গিয়েছিল। এই খাড়া পাহাড়ের একটা খাঁজেই আমরা বৈঠক করব। দুদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ী নদীও বয়ে গেছে। কয়েকজন আদিবাসী আগে থেকেই সেখানে বসেছিল, অপর কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখছিল। পেঁছানোর আধ ঘণ্টার মধ্যেই পঁচিশ-তিরিশ জন আদিবাসী নেতা হাজির হয়ে গেল। কেউ বা চা নিয়ে এসেছে, কেউ হাতে গড়া রুটি (ভকরি) নিয়ে এসেছে। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে চলল বৈঠক। যা সব ঘটেছে—সব কিছু নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হল। আমাকে একেবারে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়ে আদি-বাসীদের মনোবল আরও বেড়ে গেল, বহু আকাঙ্ক্ষিত দর্শনে আবার সব প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠল। আর বৈঠকও বেশ ফলপ্রসূ হল দেখে আমিও মনে মনে খুব খুশী হয়ে উঠলাম।

"দিদিমণি, চলা-ফেরার সময় খুব সামলে চলুন"

দুপুর প্রায় দুটোর পর সেখান থেকে আস্তানা গুটিয়ে পরবর্তী আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। অনেক দূরপথ, বেশ বিপদসংকুল। গাছের ছায়ার মধ্য দিয়ে হাঁটছি, বাতাসও দিচ্ছিল—তাই রোদের উত্তাপে তেমন কষ্ট হল না। পাহাড়ী পথটা বেশ খাড়াই এবং খুব সংকীর্ণ। একদিকে উঁচু পাহাড়, আর অপর পাশে একেবারে নীচু খাদ। চড়াইয়ের পথটা এমন কঠিন যে, ওয়ারলিরা বলল—ঐ পথে তারা গরু-ভেড়া চরাতে আসতেও ভরসা পায় না। একটা লাঠির উপর নিজের ভর রেখে ধীরে ধীরে আমি হাঁটতে লাগলাম। আগে-পিছে এগিয়ে চলেছে আদিবাসীরা, হাতে লাঠি, তীর-ধনুক আব পাথর ছোঁড়ার গুলতি। বার বার চিৎকার করে সাবধান করে দিতে লাগল, দিদি, সামলে চলুন, দরকার পড়লেই আমার হাত ধরে সাহায্য করতে লাগল।

পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি। গাছগুলো ছায়া দিয়ে রোদের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। আমার কিন্তু কেমন উদ্বেগ হতে লাগল, কোথায় নিয়ে চলেছে আমায়। জংগলের মধ্যে একটা সাধারণ পায়ে চলার পথও যে দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় হাজির হলাম একটা বেশ পরিষ্কার জায়গায়, প্রায় ১৫ বর্গফুট সমতল জায়গা—ঠিক পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। সংগে সংগে ওয়ারলিরা সেখানে কয়েকটা মোটা লাঠি মাটির মধ্যে

গেড়ে দিয়ে, মাথার উপর ডালপালা দিয়ে বেশ চমৎকার ছোট্ট একটা ছায়া-ঘেরা কুঞ্জবনের মতো তৈরি করে ফেলল, ভিতরে বিছিয়ে দিল একটা চাটাই। পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল, তারপর সংগে করে নিয়ে আসা চায়ের সাজ-সরঞ্জাম বের করে চা তৈরি করে ফেলল। রুটিও সংগে করে এনেছিল। চা আর রুটি খাচ্ছি। নানারকম কথাবার্তা হচেছ—শুনলাম—এই যে পরিষ্কার-করা জায়গায় আমরা বসে আছি—এগুলো বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে ময়ূর শিকারের জন্য। কয়েকটা নির্দিষ্ট পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে এ ধরনের বিশেষ জায়গা ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করা আছে। ধীরে ধীরে গোধূলি নেমে এল। অন্ধকার নেমে আসতে ওয়ারলিরা গরমের জন্য কাঠ-কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে গালগপ্প করতে লাগল। আমার ভয় হচ্ছিল—আগুনের আলো কয়েক মাইল দূর থেকেও চোখে পড়তে পারে। ওয়ারলিরা আশ্বস্ত করল—কিচ্ছু চিন্তা নেই। জংগলটা এত গভীর যে এতটুকু আলো গাছের ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে দেখাই যাবে না। আর তাছাড়া কাঠগুলো তেমন জোরে জ্বলছে না, আগুনের শিখাও তেমন বেশী নয়—ধিকি ধিকি জ্বলছে—এতে ভয়ের কিছু নেই।" সেই আগুনের উত্তাপের পাশে বসে বেশ আরাম করে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল। খোলাখুলি সব রকমের কথাবার্তা বলার বেশ আদর্শ স্থান। প্রাণভরে বৈঠক চলল, সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হল : আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা ; জমিদারদের কথা—কে মজুরি দিয়েছে, কে দেয়নি, কে কি বলেছে, কে বলপ্রয়োগ করেছে ; তারপর পুলিসের কথা—তাদের গতিবিধি, তাদের অবস্থান, শক্তি-সমাবেশ ও কার্যকলাপ ; কে কে ভয়ে স্বপক্ষ-ত্যাগ করে জমিদার-মহাজনদের সংগে হাত মিলিয়েছে ; নতুন নতুন সভ্যদের কথা—যারা দলভুক্ত হয়েছে, তাদের নাম-ধাম, সংখ্যা, কে কে আত্মগোপন অবস্থায় আছে—কোথায়, কিভাবে, সাধারণ মানুষের মনোভাব, যারা জেলের মধ্যে আছে তাদের পরিবারবর্গের ভালোমন্দ খবরাখবর ; অত্যাচারের মোকাবিলার জন্য ভবিষ্যৎ নীতি, কৌশল, পরিকল্পনা, কর্মসূচী ইত্যাদি ইত্যাদি কত কথা।

সেই ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছিলাম। সকাল সকাল ওঠার তাড়া ছিল না, তাই একটু বেলা পর্যন্তই ঘুমালাম। দুধ ছিল না, কাজেই দুধ-বিহীন চা খেলাম, গুড়ের চা। এমনিই একটু ঘুরতে বেরোলাম, আশে-পাশের অবস্থা দেখার জন্য। দেখলাম চার পাশে গভীর জংগল। জংগলের মধ্যে ঢোকার আগেই ওয়ারলিরা বাধা দিল আমায়, সাবধান করে দিয়ে বলল, "বনের মধ্যে ঢুকবেন না দিদি, বাইরে বেরিয়ে আসার পথই খুঁজে পাবেন না। পথ হারিয়ে ফেলবেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শুধু ঘুরেই মরতে হবে"। একেবারে খাঁটি কথা। সত্যিই বেরুনোর পথ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল, পথ নেই বলেই

মনে হয়। কী করে যে সেই জায়গায় এসে হাজির হয়েছি—তাও বুঝতে পারলাম না, পায়ে হাঁটা পাক-দণ্ডী পথই দেখা যায় না। কোন অপরিচিত লোকের পক্ষে যাতায়াতের পথ ঠিক রেখে ঘোরা-ফেরা করা শুধু কঠিনই নয়, একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। কেবল ওয়ারলিরাই জানে—কোন পথ দিয়ে যাওয়া যায়, পথ-ঘাটগুলো কোথায় শেষ, আর কোথায় শুরু—তা একমাত্র তারাই বলতে পারে।

সেদিন আমি আদিবাসীদের বুঝিয়ে বললাম যে, যতই সাবধানে ঘোরা-ফেরা করি না কেন। উম্বরগাঁও তালুকের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত পেঁছানোর আগেই হয় তো ধরাও পড়তে পারি। আর সত্যিই যদি তা হয়, তাহলে সেই বাধা সংকটের সামনে পড়ে আন্দোলন যেন ঝিমিয়ে না পড়ে, কোনমতেই পিছিয়ে আসা চলবে না। ঐক্য অটুট রেখে, এমন শত-সহস্র বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে। আর এইভাবে লড়াই চালিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত সাফল্য আসতে বাধ্য।

লাল-ঝাণ্ডা চমৎকার কাজ করেছে

প্রায় সন্ধের কাছাকাছি, পাহাড়ের উল্টো দিক দিয়ে নেমে, আবন্দানী নামে একটা গ্রামে গিয়ে ঢুকলাম। আমাকে দেখতে পেয়েই একটা ছোট্ট ছেলে একেবারে পাখির মতো যেন ফুরুত করে উড়ে চলে গেল গ্রামের সবাইকে বৈঠকের সংবাদ পেঁছে দেওয়ার জন্য। এক নৌসিয়ার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তার স্ত্রী ছিল আসন্ন-প্রসবা। সে রাত্রিতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে যখন উঠলাম, দেখি—সবাই আমার দিকে তাকিয়ে বেশ মজা করে হাসছে, বলছে, "দিদিমণি, রাত্রিতে বাড়িতে নবজাতকের আগমন ঘটল, অথচ আপনার ঘুম কিন্তু ভাঙল না"। সারারাত্রি ধরে তারা বসে বসে গল্প করেছে। নবজাত শিশু আর প্রসূতিকে দেখতে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। একটা চাটাইয়ের উপর পাতলা একটা কাপড় বিছিয়ে তার উপর বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিয়েছে। গায়ের উপর একটুকরো কাপড় দিয়ে ঢাকা। আর তার মা, একটা পাথরের উপর বসে গরম জলে সবে স্নান সেরে, আগুনের পাশে শুয়ে আছে। "কী খাবে প্রসূতি"—সে সব খোঁজ খবর করতে গিয়ে জানলাম—"সাধারণত ভাত [সম্ভব হলে ভালো সরু চালের ভাত], ভাতের মাড়, মুরগী পাওয়া গেলে কোন কোন দিন মুরগী, আর তাড়ির সময়ে তাড়ি'—এই হচ্ছে সদ্য-প্রসূতির আহার্য তালিকা। তৃতীয় দিনেই সচরাচর মা তার শিশু-সন্তানকে রেখে ক্ষেতে কাজ করতে যাওয়া শুরু করে। বাঁশের ছিটেবেড়া দেওয়া, ছোট্ট ঝুপড়ির ছোট্ট নির্জন জরাজীর্ণ কুঠুরির মধ্যে, পাতলা একটা

কাঁথায় জড়ানো জাতীয় সম্পদের ক্ষুদ্রতর সংস্করণটি দেখে, খুবই বিচলিত হয়ে পড়লাম। শহরে মধ্যবিত্তদের বাড়িতে, নবজাতকের শয্যা-সম্ভারের ভিন্নতর দৃশ্যের সংগে এই দৃশ্যের তুলনা না করে পারলাম না।

সে রাত্রিতে নৈশভোজনে রীতিমতো বিলম্ব ঘটল। আদিবাসীদের ধারণা—তাদের মেয়েদের শুচিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুরুষের থেকে কম। কোন বিশেষ অতিথিকে যথাবিহিত আদর-আপ্যায়ন করতে হলে, রন্ধনাদির কাজ পুরুষদের অবশ্য কর্তব্য। মেয়েরা শুধু ধান ভেনে চাল তৈরি করে দেবে, আনাজ কাটবে আর মশলা বেটে দেবে। আবন্দানীতে বৈঠক শেষ করে আমরা পরবর্তী গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে করে একটা চক্রাকার পথে অনেক ঘুরে গেলাম। আমাদের গন্তব্যস্থলে পেঁছাতে অনেক সময় লেগে গেল। রাস্তাটাও এমনই যে দ্রুত সেখান দিয়ে হাঁটা অসম্ভব ব্যাপার। বাঁশ ও অন্যান্য গাছের জংগলের মধ্য দিয়ে পথটা এগিয়েছে। শরীরের খোলা জায়গায় হাত, পা, মুখে মশা কামড়াতে লাগল। গোল গোল চাকার মতো ফুলে গেল সব, রক্তও পড়তে লাগল। শাড়িটা সারা শরীরে ভাল করে জঁড়িয়েও নিস্তার নেই। বাঁশ ও অন্যান্য গাছের কাঁটা ও ডালপালায় গা-হাত-পা ছড়ে যেতে লাগল। তার মধ্য দিয়ে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ল। আমি বেপরোয়া হয়ে উঠলাম এই সব মুহূর্তে, ওয়ারালিরা আমাদের বেশ মজাদার গল্প শোনাত। আমাদের সাহায্য করত। এইভাবে খোঁচা খেতে খেতে, ফুলে যাওয়া জায়গাগুলোয় হাত বুলোতে বুলোতে আর ঝরে-পড়া রক্তবিন্দু মুছতে মুছতে কোন প্রকারে যাত্রাপথের শেষ প্রান্তে হাজির হলাম। সারা শরীরটা তখন আগুনের মতো জ্বলছে।

কমরেড পাথারা নামে একজন পার্টি সভ্য তখন জেলে ছিল। তার মায়ের সংগে ক্ষেতের মাঝে গিয়ে দেখা করলাম। মা শুধু বলল, "আমি বিশেষ দুশ্চিন্তায় নেই। লাল নিশান নতুন দিনের আলো এনে দিয়েছে আমাদের। আমার ছেলে তার সভ্য। আমি তাকে লাল ঝাণ্ডার কাছেই সঁপে দিয়েছি।" কথাগুলো শুনে মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। কই, মা তো একবারও জিজ্ঞেস করল না—'কবে তার ছেলে ফিরে আসবে? বা কবে তার ছেলেকে আবার দেখতে পাবে'; বুড়ো মা শুধু সরল, অনাড়ম্বর গর্বের সংগে বলল, "আমার ছেলে লাল ঝাণ্ডার সভ্য"। ভুলে গেলাম, একদম ভুলে গেলাম আমার সেই অস্বস্তি, ক্লান্তি, মশার কামড়, কাপড় ছিঁড়ে যাওয়া, সারা দেহের জ্বালাযন্ত্রণা সব। কমরেড পারুলেকরের কথা ভাবতে ভাবতে চোখের পাতাটা ভারী হয়ে উঠল। যা কিছু দেখলাম, যা

কিছু শুনলাম তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্ত কাহিনী কি একবার বোম্বাই ফিরে গিয়ে তাঁকে বলার সুযোগ মিলবে না ? না, তার আগেই ধরা পড়ে যাব ? অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম এ সব কথা, আমার জীবনের কথা—যে জীবন প্রতি মুহূর্তেই নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

আমার পরবর্তী কর্মস্থল "বাপগাঁও" গ্রাম। সেখানের অবস্থান কিন্তু সুখকর হল না। যার বাড়িতে অতিথি হলাম, তার ভাই ও বৌমা খুব ঘাবড়ে গেল। এরা যেন মুহূর্ত গুণতে লাগল, কখন আমি সেখান থেকে চলে যাই। পাথারার বুড়ী মা আর এই ভীরু নওজোয়ানদের মানসিকতায় কত পার্থক্য। প্রথমে তো খুব রেগেই গিয়েছিলাম, কয়েকটা কথাও শুনিয়ে দিলাম তাদের। কিন্তু কোন ফলই হল না। খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে মেজাজটা ঠান্ডা হয়ে এল। এই সব কঠিন মুহূর্তে প্রায়ই মনে হত, কেন এমন কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম। বোম্বাইতে থেকে খুব আরাম করে সুখে শান্তিতেই তো কাজ করতে পারতাম। তখন আরার নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম—প্রতিটি সমাজে কিছু কিছু ভীরু লোক তো থাকবেই। যারা কেবল নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, তারাই বেশি ভয় পায়। ওয়ারলি সমাজের আত্মত্যাগ, লক্ষ্যের প্রতি তাদের একনিষ্ঠ আনুগত্য ইত্যাদি কথা ভাবতে ভাবতে তাদের প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আবার সচেতন হয়ে উঠতাম।

এই বাপগাঁওতেই জীবনে প্রথম একটি নতুন শব্দ শুনলাম, "ঘর সেলাই করা" (Sewing a house)। এতদিন তো কাপড় জামা সেলাইয়ের কথা জেনে এসেছি, ঘর সেলাই তো শুনিনি। কিন্তু আদিবাসীরা যা করত, সংক্ষেপে তাকে 'ঘর সেলাই'-ই বলা চলে। ছোট ছোট কাঁটা বা খাঁচি দিয়ে "পলাশ" পাতা জুড়ত তারা। তারপর সেই সেলাই করা পাতা দিয়ে ঘর ছাইত। কাজেই এও এক ধরনের "ঘর সেলাই"। এইভাবে বৃষ্টির জল চাল দিয়ে গড়িয়ে বাইরে পড়ত, ঘরের মধ্যে পড়ত না। টালি বা খোলার অভাবে পলাশ পাতা সেলাই করে, তাই দিয়ে চাল ছেয়ে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে তারা রক্ষা পেত।

সে রাত্রিতে বাপগাঁওতে এক নাচের আসর বসেছিল। "তারপা" (tarpa) বা মাদলের আওয়াজ কানে আসতে লাগল। নাচ দেখার জন্য গেলাম কিছুক্ষণ। এ নাচ তো শুধু দেখার জিনিস নয়, নিজেদেরই নাচতে ইচ্ছে করে। একবার নাচের আসরে মেতে গেলে শেষ পর্যন্ত একেবারে পাগলের মতো বিভোর করে দেবে। তারপার তাল আর লাঠিতে বাঁধা ঝুমুরের শব্দের সংগে তাল মিলিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নেচে যায় আদি-

বাসীরা। যুবক ছেলে-মেয়েরা একে অপরের একটু পিছনে অর্ধ-বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে নাচতে থাকে, নিজেদের যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। জীবনের নিষ্পাপ আনন্দ এরাই সত্যিকার ভোগ করতে জানে, কোন ফন্দি-ফিকির মাথায় নেই। বাপগাঁওতে আরও কয়েকজনের সংগে সাক্ষাৎ করে সংগে সংগে পরবর্তী ঘাঁটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

"কে আমায় ধরতে পারে?"

যখন গিয়ে পৌঁছালাম, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ওখানকার বৈঠক মোটামুটি ভালোই হল। অনেকদূর পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। অনেকদিন হল স্নানও হয়নি। তখন শীতকাল, তাই দীর্ঘ পদযাত্রার পর ঠাণ্ডা জলে স্নান করার যে আরাম, সে আশাও নেই। যাই হোক্, তবুও পরদিন 'সত্রকার' গ্রামে সকাল ৫টায় কাঠের আগুনে গরম-করা জলে কোনরকমে স্নান সেরে নিলাম। আমার 'স্নান-পর্বের' ব্যবস্থা পনায় গৃহস্বামীর বাড়িতে যেন হুলুস্থুলুস্ পড়ে গিয়েছিল। আগের রাতেই জল এনে রাখা হয়েছিল। পুরুষরা কাপড়-ঘেরা দিয়ে স্নানের জায়গা তৈরি করল, আর মেয়েরা সেই রাত্রি ১টা থেকেই বার বার তাড়া লাগাতে লাগল, "দিদি, এবার কি জল গরম করব, সময় হয়েছে?"

আমি যে গ্রামে গিয়েছি, তাদের মধ্যে আছি—এ-সংবাদ গ্রামের প্রত্যেকেই সব সময় জানতে পারত। আমাকে নিজের চোখে অনেকেই হয়তো দেখতে পেত না, তবুও "দিদিমণি এসেছিলেন"—এতেই তারা নিশ্চিন্ত বোধ করত। গ্রাম ছেড়ে চলে আসার সময় দেখতাম, গ্রামের নারী-পুরুষ, ছেলে, মেয়ে—সবাই নানান অছিলায় পথের ধারে এসে সারি দিয়ে দাঁড়াত। পুরুষ আর মেয়েরা ভাব দেখাত যেন সেখানেই তাদের কাজ রয়েছে, আর ছেলেরা ভাণ করত, তারা যেন গরু-ছাগল চরাতে এসেছে অথবা নদী থেকে জল আনতে এসেছে। কখনো দেখতাম পাহাড়ের মাথায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারা, দৃষ্টির আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সতৃষ্ণনয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সন্দেহের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত হারিয়ে যেত তখন। আপন মনেই বলতাম, "কে ধরবে আমায়? এত লোক যখন দৃঢ় সংঘবদ্ধভাবে আমার পিছনে রয়েছে কার সাধ্য আমায় ধরে? অসম্ভব।" একদিন একরাত্রির বেশি কোন জায়গায় আমি কখনো কাটাতাম না, তখনকার দিনে আদিবাসীদের পর্ণকুটীর ছিল যে কোন লোকের পক্ষে যে কোন সময়ে অবারিত দ্বার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তার কথা তাদের জানা ছিল না। ঘরে তাদের কোন শিকলও থাকত না, আর তালাও পড়ত না। কারণ

নিরাপদে সংরক্ষণ করার মতো তেমন কিছুই তাদের ছিল না। এ হেন পরিস্থিতিতে, কোন এক জায়গায় বেশিদিন বা বেশিক্ষণ থাকা খুবই বিপজ্জনক।

একের পর এক ঘাঁটিগুলি পার হয়ে যাচ্ছিলাম তাই এমনও হতে পারে, কেউ কেউ হয়তো, আমায় দেখে থাকতে পারে, যেমন কোন ফেরিওয়ালা কুমোর বা তাড়ির দোকানের ঠিকাদার। যদিও ছদ্মবেশে যাতায়াত করতাম, তবুও এইভাবে আমাকে কেউ চিনে ফেললে, খুব ঘাবড়ে যেতাম মনে মনে। মনে হত—আর বোধ হয় পরবর্তী ঘাঁটিতে পেঁছানো নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। এই সব পরিস্থিতিতে ছোট ছোট ছেলেরা খুব কাজে লাগত। মাঝপথে যে সব লোকজন পেরিয়ে আসতাম, ছেলেরা তাদের অনুসরণ করে, তাদের সম্পর্কে বিস্তৃত খবরাখবর নিয়ে ফিরে আসত। খবর নিয়ে যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিতে পারতাম।

সমস্ত ভ্রমণ সূচী পায়ে হেঁটেই সারতে হত আমায়। বিকল্প উপায় ছিল গরুর গাড়িতে যাওয়া কিন্তু তাও নিরাপদ নয়। পায়ে হেঁটে গেলে, কোন লোক সেপথে আসছে দেখলে বা আসছে বলে শুনলেই তাড়াতাড়ি পাশের ঝোপে ঢুকে পড়তে পারতাম। সেখানে আশ্রয় নিতে পারতাম। গরুর গাড়িতে গেলে এভাবে দ্রুত নেমে পড়ে, আত্মগোপন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। আর তাছাড়া, গরুর গাড়িতে গেলে, খুব সহজেই লোকের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

পরের গ্রামে গিয়ে দেখলাম—কয়েকজন লোক গোলাকার বৃত্ত করে বসে আছে, আর মধ্য বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন। গ্রাম্য প্রধানরা সেখানে ব্যক্তিগত কিছু অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করছে, বিচার করে রায় দেবে। কোন বাদ বিসম্বাদকে গ্রামের সামনে নিয়ে গিয়ে বিচার ব্যবস্থা করাটা হচ্ছে আদিবাসীদের একটা প্রথা। সব দিক বিচার বিবেচনা করে তারপর অভিযোগের রায় দেওয়া হত। বাদী-প্রতিবাদী প্রত্যেকেই গ্রাম্য সিদ্ধান্ত মেনে নিত। বিচারে নির্দেশ মাফিক জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দিত ও নিত। তারপর আদালতের মাননীয় সভ্যদের "তাড়ি" সহযোগে আদর আপ্যায়ন করা হত।

পনেরটা গ্রাম আমি ঘুরেছিলাম। কোন কোন গ্রামে বৈঠক করেছি, কোথাও বা নেতাদের সংগে শুধু দেখা-সাক্ষাৎ করেছি। আগেই পুলিসের গতিবিধি সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করতে হত, তারপর গ্রামের পরিস্থিতি বা পরিবেশের কথা ভাল করে বুঝে-সুঝে যাতায়াতের পরিকল্পনা করতে হত। দহানু তালুকে পনেরটি গ্রাম পরিক্রমা করে তারপর গিয়ে ঢুকলাম উম্বরগাঁও তালুকের আংকালাস গ্রামে।

আংকালাস গ্রামের চারপাশের এলাকায় কোন জংগল ছিল না। তালগাছ বা খেজুর গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছই ছিল না। প্রকাশ্য দিনের আলোয়, খোলা জায়গা দিয়ে এতদূর হেঁটে এসে, খুব নিরাপদ বোধ করছিলাম না। ঠিক হল, গ্রাম থেকে অনেক দূরে, কোন ক্ষেতের মধ্যে চালার তলায় থাকাটাই কম বিপজ্জনক হবে। তের দিন কেটে গেছে যাত্রা শুরুর পর থেকে। অধিকাংশ আদিবাসীই তখন জেনে গেছে আমি ঐ এলাকায় পরিক্রমা করছি। পুলিসও সে সংবাদ পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব অমূলক নয়। কারণ যদিও এটা সত্য যে, অধিকাংশ আদিবাসীই খুব নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন, তবুও তাদের মধ্যে দু একজন তেমন বিশ্বাসঘাতক থেকে যাওয়াটা খুব অসম্ভব বা অবাস্তব নয়। যেমন কোন জনযুদ্ধে বড় বড় নেতা ও কর্মীরা সামনের সারিতে এগিয়ে আসে। তাদের অভ্যুদয় ঘটে লড়ায়ের ময়দানে। তেমনি সেখানে দু একটা বিশ্বাসঘাতকেরও জন্ম হয়। ১৯৫১ সালে একবার সেই রকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ হয়েছিল আমার। আমাকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকেই পুরুস্কার দেওয়া হবে, এমন একটা ঘোষণা হয়েছিল। একজন আদিবাসী আমার সংগে দেখা করতে এসেছিল। সে বেচারা পুরস্কারের কঠিন লোভ আর সংবরণ করতে না পেরে, আমি যেখানে ছিলাম, সেদিকেই পুলিস-বাহিনীকে পথ দেখিয়ে এনেছিল। বাইরে উম্মুক্ত জায়গায় কোন গাছ বা পাহাড়ের ছত্রছায়া নেই। এমন অবস্থায় একটা চারপায়ার উপর একটা চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথার উপর চাটাই টাঙিয়ে একটা আস্তরণ। দেহ-মন এমনই ক্লান্ত, অবসন্ন যে সংগে সংগে আমি ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় আদিবাসীরা আমায় ঘুম থেকে ডেকে উঠাল। রাত্রির আহার্য তখন প্রস্তুত। মোটা চালের আটা দিয়ে তৈরী "ভকুরি" আর তার সংগে সদ্য তুলে আনা 'অড়হর' শুঁটির দানা, নুন দিয়ে কেবল সিদ্ধ করা। হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে, ভোজ্যবস্তুর উপর প্রচণ্ড ক্ষুধায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পেটভরে খেলাম। রান্নার কাজে তেল বা ঘি ব্যবহারের কথা তারা জানত না। আবার কেউ কেউ জানলেও, ব্যবহারের সঠিক কৌশল না জানার জন্য আস্বাদ বিস্বাদের রূপ নিত। কাজেই ডাল বা কড়াই তারা সিদ্ধ করেই খেত। বড় মিটিং করা সেখানে মোটেই সমীচীন নয়। আশ-পাশের গ্রাম থেকে কয়েকজন বাছা-বাছা আদিবাসী এসেছে। বসে বসে বিড়ি টানছে। তাদের একজন এদিক ওদিক খোঁজাখুজি করে গরুর দুধ কিছুটা সংগ্রহ করেছে। খোলাগুড়

সহযোগে গরম গরম চা তৈরি করে খেলাম আমরা। রাত্রির সেই ঠান্ডার মধ্যে চা-পানের পর সকলেই যেন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠল। রাত্রি ১টা পর্যন্ত চলল আমাদের বৈঠক। তারপর আগুনের উত্তাপের পাশে সবাই শুয়ে পড়লাম। সারা রাত্রির আগুন জ্বলল। কয়েকজন পাহারা দিল জেগে জেগে। ভোর প্রায় তিনটের সময় আদিবাসীরা আবার আমাকে ঘুম থেকে জাগাল। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে এবারের ভ্রমণ সূচীতে এই প্রথম একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠতেই পারলাম না। ভোর চারটে পর্যন্ত ঘুমালাম। আদিবাসীরা এবার জাগিয়ে দিল। যাত্রা সুরু করার জন্য তারা তাড়াহুড়া করছিল। রাত্রিতেই সব চা-টুকু শেষ করে ফেলা হয়েছে। তাই শুধু মাত্র চোখে মুখে একটু জল দিয়ে নিলাম। সেদিন নড়া-চড়া পর্যন্ত করতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু এও জানতাম যদি না যাই তাহলে গ্রেপ্তার অনিবার্য। নীরবে বেরিয়ে পড়লাম। ভীষণ কষ্টদায়ক সে যাত্রা। ভোর রাত্রির প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এক ফোটা চাও নেই শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নেওয়ার জন্য। অন্ধকার পথ যেন শেষই হয় না। পথটা ঘাসে ভর্তি। কাটা হয়নি। শীতের শিশিরে ভারী হয়ে নুয়ে যাওয়া ঘাসের উপর আমার পায়ের চপ্পল হড়কে যেতে লাগল। চপ্পল খুলে হাতে করে নিয়ে খালি পায়ে হাঁটলে আবার পাথরেব কাঁকর তখন পায়ে ফুটতে থাকে। কয়েকটা টুকরো আবার এমনই নরম আর চোস্ত যে তাদের ঠ্যালায় যন্ত্রণায় একেবারে ক'কিয়ে উঠতাম। পথের মধ্যে যাদের বাড়ি পড়ত, তাদের সংগে দেখা করার জন্য আদিবাসীরা আমায় অনুরোধ করতে লাগল—এটা অমুক লোকের বাড়ি, ওটা তমুক লোকের। একটু দেখা না করে গেলে কি হয়?" আর সেই সব অনুরোধ রাখতে গিয়ে, তার ফলশ্রুতি দাঁড়াল এই যে, সকাল ৭টা বেজে গেল ভিলাড় পেঁছাতে। দিনের আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে তখন। আমার অবহেলা আর শৈথিল্যের কথা ভাবতে গিয়ে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব দানা বাঁধতে লাগল। কিন্তু "দুধ মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর"—হাহুতাশ করেই বা লাভটা কি! চারদিক একেবারে খোলা মেলা, উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠেছে। কয়েকটা বুনো খেজুর গাছ ছাড়া গাছপালা বলতে আর কিছুই নেই। শেষ পর্যন্ত এই জায়গায়ই, ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটুকু একেবারে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। আমাকে রক্ষা করার মতো অন্ধকার বা বনজঙ্গল বলতে কিছুই নাই। আমার অনুসঙ্গীরাও যাতে আমার সংগে ধরা না পড়ে, তাই তাদের সবাইকে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। চোদ্দটা দিন সতর্কতার সংগে কাটানোর পর, আমারই একটু গাফিলতির ফলে, শেষ পর্যন্ত আমায় ধরা পড়তে হবে এই চিন্তাটা খুব পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার

উপক্রম হল। আমার সহকর্মীরাই বা কি বলবে তখন? কমরেড শান্তুলেকরের কত কষ্ট হবে! আর সব থেকে বড় কথা, আমি ধরা পড়ে গেলে সমগ্র আন্দোলনের উপর তার কী প্রচণ্ড প্রভাব পড়বে! এত সব চিন্তায় মাথাটা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে লাগল।

ভিলাড়ে যে আদিবাসীর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম, সে তো আমি যাওয়ার জন্য খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি যদি তার বাড়িতে থাকি, তাহলে তার ও আমার দুজনেরই যে কী বিপদ ঘটবে—এ সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না। বাড়িতে সে নিজের হাতে চা তৈরি করল বিশেষ চা-পাতা দিয়ে। চা খেয়ে পরিস্থিতিটা তাকে বুঝিয়ে বললাম। শুনে তো গম্ভীর হয়ে গেল, খুব ভাবনা চিন্তায় পড়ে গেল। অনেক ধোড়ী ও দুবলা সম্প্রদায়ের আদিবাসী সেখানে আমার সংগে দেখা করতে এল। ঐ পাড়াতেই খুব কাছাকাছি হচ্ছে ভিলাড় পুলিস স্টেশন। সেখানে আমার আগমন-বার্তা খুব দ্রুত পেঁছে যাওয়া মোটেই অসম্ভাবিক নয়, সময়ও বেশি লাগার কথা নয়। ওদিকে আবার দিনের বেলায় বেরিয়ে পড়াটাও বেশ বিপজ্জনক। তবুও এই উভয়সংকটে ওখানে থাকার থেকে চলে যাওয়াটাই কম বিপজ্জনক বলে মনে করলাম। কারণ আদিবাসীদের সহানুভূতি ছিল আমার সহায়, আর পালিয়ে যাওয়ারও অনেক রাস্তা আছে। ছদ্মবেশ ধরলাম, সংগে নিলাম একজন আদিবাসী যুবককে, তারপর বেরিয়ে পড়লাম বোরলাই গ্রামের উদ্দেশে। ক্ষেত-খামারে কর্মরত কিসান ও তাড়ির দোকানের ভীড় পরিহার করে, আর কাজকর্ম দেখাশুনোর কাজে ব্যস্ত চৌকিদারের নজরে ধুলো দিয়ে কখনো দ্রুত পায়ে, আবার কখনো শ্লথ গতিতে, সকাল প্রায় দশটার কাছাকাছি বোরলাই গিয়ে হাজির হলাম।

আমি যে বোরলাই যাচ্ছি—এ ব্যাপারটা কোন কোন কিসান নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল। কারণ পথিমধ্যেই তারা আমার সংগে দেখা করে নিল, খুব দ্রুত হঠাৎ কাছে এসে কয়েকটা কথাবার্তা সেরে নিল। সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তার সন্ধানও তারা আমায় দিল। ইচ্ছে ছিল, বোরালাইতে গিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নেব। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার যাত্রা শুরু করবো। সেখানে গিয়ে একটা বাগানে গাছের ছায়ায় চার পায়ার উপর শুয়ে পড়লাম। সেই সকালে এক কৌটা চা ছাড়া দানাপানি আর কিছুই পেটে পড়েনি। ওদিকে চা তৈরি হচ্ছে, আর এদিকে আমি শুয়ে শুয়ে যারা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে আছে তাদের পরিবারবর্গের খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম।

কে উনি ? একজন নববধূ তার বাপের বাড়ি যাচ্ছে।

কিন্তু বোরলাইতে চা-খাওয়া—এটা আমার কপালে বোধ হয় ছিল না। আমার অসতর্কতাই আমার বিপদ ডেকে আনল যেখানে চারপায়ার উপর আমি শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ সেখানে এক চৌকিদার এসে হাজির। দেখেই বুকটা ধড়াস করে উঠল, কিন্তু এটা আমি জানতাম আদিবাসীদের শক্ত ঘাঁটিতে এলে, এই সব দালাল-শ্রেণীর লোকগুলো ভিতরে ভিতরে এমনই দুর্বল হয়ে যায় যে, একটু জোরে ধমক দিয়ে কথা বললেই ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে পালাবার পথ খুঁজে পায় না। বেশ ডেঁটে জোর দিয়ে বললাম গুজরাটী ভাষায়—"তুমি এখানে এসেছ কেন?" সে বলল, "ঘাস কাটতে।" সংগে সংগে আমি চিৎকার করে বললাম, "এখানে কাটার মতো ঘাস-টাস নেই, যাও এখান থেকে।" সে চলে গেল। আমার কিন্তু সন্দেহ হল—নিশ্চয়ই সে সোজা থানায় গিয়ে উঠবে আর সব ঘটনা জানিয়ে দেবে। আমার আশংকা সঠিক। চা খাওয়া চুলোয় গেল। লোকটা চোখের আড়াল হতে না হতেই খাটিয়া থেকে লাফ দিয়ে উঠলাম। আমি যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে নগর হাভেলীর পর্তুগিজ এলাকার সীমানা মাত্র দু মাইল দূরে। সেদিকেই পালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিবাসীরা পরামর্শ দিল। যে সব জায়গায় পাড়া-টাড়া নেই, পুলিস সেখানে সচরাচর যায় না। আশপাশের এলাকা সম্পর্কে আদিবাসীদের জ্ঞান কিন্তু খুব চমৎকার। আমার জন্য পথের একটা নক্সা করে দিল। সে পথ দিয়ে গেলে চেনা-জানা কোন লোকের সংগে দেখা হবে না। তাদের বিচার বুদ্ধির উপর আস্থা রেখে বেরিয়ে পড়লাম। পরে নিলাম গুজরাটী রমণীর মতো পোসাক—লাল পাড় দেওয়া কালো রংএর শাড়ি। শাড়ির আঁচলটা মাথার উপর ঘোমটার মতো টেনে দিলাম—যাতে ঘোমটার আড়ালে মুখটা যেন কেউ দেখতে না পায়। একটা ময়লা কাপড়ে বেধে নেওয়া আমার কাপড়-চোপড়ের বোঁচকা নিয়ে আমার কয়েক পা আগে আগে এগিয়ে চলল একজন আদিবাসী। নীরবে আমি তাকে অনুসরণ করে চলেছি। ঘাস জমির মালিক ও তাদের চৌকিদারদের পার হয়ে চলে গেলাম আমরা, তারা তখন কাজের খবরদারি করতেই ব্যস্ত। খুব চুপিসাড়ে আমরা এগিয়ে চললাম।

ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—কেউ যদি কৌতূহলবশত আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তাহলে বলা হবে "আমি বাড়ির বধূ! স্বামীর ঘর থেকে ছুটি পেয়ে একটু বাপের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি"। এটা অবশ্য বেশ বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী। দেওয়ালির আগে ও পরে অনেক মেয়েরাই এমন

শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যায় আবার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি আসে। ডানদিক থেকে কাউকে আসতে দেখলেই আমি মুখ ঘুরিয়ে নেব বাঁদিকে। আর যদি বাঁদিক থেকে কিছু শুনতে পাই, তাহলে ডানদিকে মুখটা ঘুরিয়ে নেব। আদিবাসীদের বক্তব্যই সঠিক। সত্যিই রাস্তার মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করে বসল, "কে যায়?" আমার সংগী বলল, "বাড়ির বউ, বাপের বাড়ি যাচ্ছে।" এই বলেই আমরা পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। এই সব মুহূর্তে পথ যেন শেষই হতে চায় না। স্নায়ুগুলো এমনই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, কাছাকাছি কাউকে পথের মধ্যে দেখতে না পেলেই যেন ছুটতে শুরু করতাম, শেষ পর্যন্ত নগরহাভেলীর সীমানার মধ্যে গিয়ে পেঁছালাম। সমতল ভূমি, কিছু কাঁটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। দেখা যায় তেমন ছায়াও নেই, আর এদিক ওদিক জলও নেই। আমার হাত ঘড়িটা ছিল পুটলির মধ্যে। সময় কত হয়েছে তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করলাম না। আর দরকারই বা কি! কারণ সময় যতই হোক না কেন, হাঁটতে তো তখনো হবেই। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলাম। পার হলাম কাদা-ভরা নদী, ছোট্ট ঝর্ণা, কাঁকর-আর পাথরে পা ছড়ে গেল। যন্ত্রণা হতে লাগল।

প্রায় তখন বারটা-একটা বাজে, আমরা গিয়ে পেঁছালাম থানা জেলার সীমানায় বাণগঙ্গা নদীর ধারে। আমরা সেখানে হাজির হওয়ার আগেই, পনের-কুড়ি জন আদিবাসী নেতা সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা এসেছে বোরলাই এবং কাছাকাছি অন্য সব গ্রাম থেকে। শেষ পর্যন্ত আমি এসে লক্ষ্যে পেঁছাতে পারবো কি না—এই নিয়ে তাদের খুব দুশ্চিন্তা ছিল। আমার আসার অপেক্ষায় তারা অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। তাদের জিদ, উদ্দীপনা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা—এই সব দেখে মনটা অভিভূত হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে চা'য়ের চিন্তাও মাথায় এল না।

আমি যখন ঐ সব এলাকায় ঘুরছিলাম, ঠিক সেই সময় ম্যাজিস্ট্রেটও আদিবাসীদের বুঝিয়ে শান্ত করার জন্য সেই এলাকা সফরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আদিবাসীরা বেশ সাফল্যের সংগে সরকারী শান্তি অভিযানকে বয়কট করেছিল। এই সংবাদে আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। মনের জোর ও প্রত্যাশা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। পুলিস যে কখন দুম করে এসে যাবে আর আমাকে গ্রেপ্তার করে ফেলবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তাই বেশিক্ষণ থাকলাম না সেখানে। আদিবাসীদের শুধু কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েই আবার উঠে পড়লাম। বাণগঙ্গা নদী পার হয়ে তবে সুরাট জেলায় পেঁছানো যাবে। সবেমাত্র বর্ষা শেষ হয়েছে। নদী একেবারে কানায় কানায় ভরা। স্রোতও

খুব তীর। কারুর সাহায্য ছাড়া একা একা নদী পার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। পারাপার হওয়ার মতো একটা জায়গা খ‍ুঁজে নিয়ে, দুজন আদিবাসীর সহযোগিতায় নদীতে নেমে পড়লাম। নদীর গর্ভে অসংখ্য নুড়ি আর পাথর। পা পিছলে যেতে লাগল, রাখতে পারছিলাম না। দেহের ভারসাম্যও আদৌ রক্ষা করা যাচ্ছিল না। আদিবাসী দুজন দুদিকে ধরল আমাকে। একজনের মাথায় রয়েছে আমার কাপড়ের পুটলি। তারপর দুজনে ধরাধরি করে প্রায় এক-কোমর জল পার হয়ে নদীর অপর তীরে পার হতে সাহায্য করল। ওপাশেই লেবাচ্ছা গ্রাম। সেখানকার লোকেরা আমার সম্বন্ধে শুনেছিল। ভিজে কাপড় ছেড়ে নিলাম। তারপর বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে চললাম। ঐ সময়েই বাঁশি স্টেশনে যাওয়ার একটা বাস ছাড়ার কথা! বাঁশি স্টেশনে নেমেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। প্রায় পনের দিন এদিক ওদিক কেটেছে। স্টেশনে চায়ের দোকানে একেবারে লোভীর মতো পুরো দু-কাপ চা খেলাম একসংগে। কোন রকম অস্বস্থি বা ভয়টয় কিছুই হল না।

বোম্বাই যাওয়ার যাত্রী-গাড়িতে উঠে প্রায় সংগে সংগেই ঐ যে আট-দশ মাইল পথ হেঁটে এসেছি আর প্রায় চার ফার্লং দৌড়েছি তার প্রতিক্রিয়া এবার বুঝতে পারলাম। একদানা খাবারও পেটে যায়নি সকাল থেকে। পাদুটিও ফুলে উঠেছে। বাড়ি পেঁাছানোর জন্য মনটা ছটপট করতে লাগল।

থানেতে বাড়িতে গিয়ে পেঁাছালাম রাত্রি আটটায়। কমরেড পারুলেকর ও কমরেড গোদিওয়ালা আমার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কখন যে আমি ফিরবো তার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। আমাকে দেখতে পেয়েই কমরেড পারুলেকর চিৎকার করে উঠলেন, "তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি এসে পেঁাছাতে পারলে!" প্রচণ্ড উত্তেজনায় আর ক্লান্তিতে সে রাত্রিতে কিছু খেতেও পারলাম না, ঘুমোতেও পারলাম না। এই পনের দিনের সমস্ত কাহিনী—কোথায় কি ঘটেছে ইত্যাদি—এই সব নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল। কমরেড পারুলেকর খুব কম কথার মানুষ, কিন্তু চোখদুলো তার গর্বে ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরের দিন পুরোটা ঘুমিয়ে কাটালাম। স্বপ্ন দেখেছিলাম—গ্রেপ্তার, বাঘ, সিংহ, জঙ্গল ইত্যাদি নিয়ে। পা দুটো ফুলে উঠেছিল। চোখ দুটোও খুলতে পারছিলাম না। একেবারে তৃতীয় দিনে ক্লান্তিটা যেন কাটল এবং স্বাভাবিক বোধ করতে লাগলাম।

"এমন কি গাছ-পাথর, কাঁকর-পাথরও তোমাদের সপক্ষে"

আমার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য, আদিবাসীরা যে কী পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, সে সম্পর্কে আমার কোন সঠিক ধারণাই ছিল

না। দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা মনে-প্রাণে প্রস্তুত। যে ভাবে তারা নিজেদের সংগঠিত করে তুলেছে এবং যে সব কর্মসূচী তারা নিয়েছে বা নেবে—সেগুলো সঠিক অথবা ভুল, সে সম্পর্কে আমার সম্মতি বা মতামত জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। আমার যাওয়াতে তারা আশ্বস্ত হল, প্রয়োজনীয় আস্থা ফিরে পেল। আমি যে সেখানে গিয়েছি, তাদের সঙ্গে দেখা করেছি, খোঁজ-খবর নিয়েছি—এতেই তাদের বুকটা গর্বে ফুলে উঠল। "কিরে, তোদের দিদিমণি গেল কোথায়? সরকার তাকে জেলে পুরে রেখেছে"—ভূস্বামীরা এইভাবে বারবার তাদের উপহাস করত। তাই আমার যাওয়াতে, জমিদারদের মিথ্যা প্রচারের মুখের মতো জবাব পড়ল। আর তারা যে মিথ্যা কথা বলে এ সম্বন্ধে আদিবাসীদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। তারা কিন্তু নির্বুদ্ধির মতো এই সব উপহাসের জবাব দিতে গিয়ে দুম করে কিছু বলে ফেলত না—"না না দিদিমণি এখনো আশেপাশেই রয়েছেন, আমাদের সংগে দেখা হয়েছে।" ভূস্বামীদের প্রতি তাদের মনোভাবটা যেন নীরব প্রত্যয়নিষ্ঠতায় ভরা—"যা প্রাণ চায় বল এখন একদিন সত্যটা বুঝতে পারবে।"

আরও পিছিয়ে-পড়া কিছু কিছু আদিবাসী তাদের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারত না। জমিদাররা যখন বলত পরিহাস করে, "তোদের দিদি-মণিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে"—তারাও তখন চটপট জবাব দিত, "দিদিমণি বোম্বাইতেও থাকেন আর জঙ্গলেও থাকেন—একদিন জেলে, আর একদিন জঙ্গলে।" জমিদাররা সে কথা তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিত, বলত "কী বোকারে বাবা"। আদিবাসীরা যা বলেছিল—তার মর্মার্থ সত্যই যখন তারা বুঝতে পারল, তখন বলতে লাগল, "ওস্তাদ বটে ব্যাটারা, একেবারে পাত্তা দিল না। ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে দিচ্ছে না"। এক কথায় বলা যায়—তারা যা বলত বা করত—সব কিছুর প্রতিই জমিদারদের ঘৃণা-বিদ্বেষ আরও বেড়ে যেতে লাগল।

অত্যাচার-নিপীড়নের কোন রকম পরোয়া না করেই, প্রায় পনেরটা গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। আজ অবশ্য ঠিক মতো মনে করতে পারছি না, ঠিক কোন্ কোন্ গ্রামে গিয়েছিলাম। তবে এটা জানি, পনের দিন ধরে ঐ যে প্রায় শ' খানেক মাইল ঘুরেছিলাম, তার প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল প্রচণ্ড সাড়া জেগেছিল আদিবাসীদের মধ্যে। মনোবল বেড়ে গেল তাদের। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি ওদের আস্থা, তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠল সারা আদিবাসী সমাজ। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু নিষ্ঠার কি যাদুকরী প্রভাব"—ব্যাপারটা হাতে হাতে আর একবার প্রত্যক্ষ করলাম।

সেই এলাকায় আমার যাওয়ার সংবাদ একেবারে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। মেয়েরা, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা জিজ্ঞেস করতে লাগল, "হ্যাঁগো, দিদিমণি সত্যিই এসেছেন"? জমিদারের বাড়িতে, ক্ষেতে-খামারে, গ্রামে-গঞ্জে—সর্বত্রই তারা কান খাড়া করে রাখত। যখনই যা জানতে পারত, খুঁটিনাটি সব কিছু খবর এনে সরবরাহ করত। মাঠে গরু-ছাগল চরাতে যে সব ছেলেরা যেত—তারা এনে দিত সরকারী অফিসার মহলের গতিবিধির সংবাদ. বিপদের সংকেত বা বিপদমুক্তির সংবাদ খুব দ্রুত তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে দিত। কিন্তু পথে কোন আদিবাসীর সংগে কখনো দেখা হয়ে গেলে, তারা যে আমায় চেনে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন কখনো প্রকাশ করত না। রাত্রিতে কেউ কেউ এসে দেখা করে চলে যেত। যদিও আমার সংগে দেখা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না। তবুও আমি যে গিয়েছি, আমি যে তাদের মধ্যে আছি, এতেই প্রচণ্ড দুঃখকষ্টের মধ্যেও এক ধরনের নিরাপত্তার ভাব তাদের মনের মধ্যে জন্মাতো। তারা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত।

জমিদার ও মহাজনদের সামনে আদিবাসীদের ভূমিকা ছিল যেন একেবারে নিরীহ ও গোবেচারাটি এমন ভাণ করত, যেন লাল ঝাণ্ডার নাম তারা জীবনে কখনো শোনেনি, কি যে জিনিস তাও জানে না। সব সময় যেন ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। সরকারী অফিসাররা যখন চিৎকার করে প্রচণ্ড ধমকাত, গালি-গালাজ করত, তখন একটা নির্বিকার ও ভাবলেশহীন ভাব ফুটে উঠত তাদের চোখে-মুখে, যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। নানা রকম দৈহিক নির্যাতন করেও কোন রকম সংবাদ জমিদার-মহাজনরা তাদের কাছ থেকে বের করতে পারত না। এ ব্যাপারে তাদের সাফল্য খুব কদাচিৎই ঘটত।

নগরহাভেলীর মুক্তি সংগ্রামের সময়, আমি ছিলাম উম্বরগাঁও তালুকের উধোয়া গ্রামে। যেখানে থাকতাম তার পঞ্চাশ গজের মধ্যেই ছিল থানা জেলার পুলিস সুপারিনটেনডেন্টের আস্তানা। দলবল নিয়ে মহারাজ বিরাজ করতেন সেখানে। আমার আস্তানার চারিদিকে, প্রতি দশ ফুট অন্তর অন্তর ছিল সশস্ত্র পুলিসের অতন্দ্র পাহারা। প্রতিদিন সকালে আমার সংগে দেখা করতে আসার অছিলায়, সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব ঘরের মধ্যে তীক্ষ্ণ নজর ফেলে সব কিছু দেখে-শুনে যেতেন। একদিন যখন তাকে বললাম, আপনার এত নিচ্ছিদ্র প্রহরা থাকা সত্ত্বেও একুশ জন লোক নগরহাভেলীতে সবার নজর ফাঁকি দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে; তখন তিনি আমাকে বললেন, "এখানকার গাছপালা, ফুল-ফল, কাঁকর-পাথর, পশু-পাখী, গরু-ছাগল, ছেলে-মেয়ে—সবই আপনার নিয়ন্ত্রণে, সবই আপনার চেনা-জানা। সকলের নাড়ী-নক্ষত্র আপনার

নখদর্পণে। জনসাধারণ আপনার সংগে। আমাদের মতো লোক কতক্ষণ আর যুঝতে পারি এখানে। মাথা কুঁড়ে মরে গেলেও কিছু করা যাবে না। সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

যা বলেছিলেন বর্ণে বর্ণে সত্য। পনের দিনের ভ্রমণকালে একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। মাছ যেমন জলের মধ্যে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক তেমনি সারা জেলায় পনের দিন ধরে নিরাপদে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। পুলিস আর জমিদার-মহাজনদের দালালগুলোর সদা-সতর্ক নজর এড়িয়ে, সমস্ত আদিবাসীদের মন জয় করে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর অক্ষত দেহে বোম্বাই শহরে ফিরে এলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

অতীত, অতীতের গর্ভেই বিলীন হয়ে যাক

আদিবাসীদের সেই প্রচণ্ড সংগ্রামের পর থেকে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। আদিবাসীদের মনোভাব যেমন বদলে গেল, ঠিক তেমনি জমিদার, মহাজন ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যেও একটা পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেল।.

১৯৪৫ সালে আদিবাসীরা যেমন পিছিয়ে-পড়া ছিল সেরকম জমিদার সাহুকাররাও ছিল বেশ পিছিয়ে-পড়া। তাদের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য পুণা, বোম্বাই ইত্যাদি শহরে গেলেও তাদের জীবন-যাত্রার ধারা, চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস-সংস্কার—সব কিছুই কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—নাগরিক-জীবনের চাল-চলন, আব-ভাব, সভ্যতা-ভদ্রতা—এসব গ্রামের বুকে অচল। গ্রামীণ জীবনধারা পদ্ধতি চিরাচরিতভাবে যেমন চলে আসছে—ঠিক তেমনিই চলবে। তাই যুগ যুগান্তরের প্রাচীন ধারা অনুযায়ী সেই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল গ্রামের জীবন। যে ক'জন মানুষ তাদের মধ্যে গণ্ডীর বেড়াজাল ছিন্ন করে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল, তাদের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়।

ভূস্বামীবর্গ ছিল প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, মাড়োয়াড়ী ও উত্তর প্রদেশের ভূঁইঞ্যারা; আর পারসী, ইরানী ও মুসলমানরা। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল "খাতেদার সংঘের" (জমিদারদের সংগঠন) সদস্য। তাদের সকলের জীবনধারা ছিল একই ধরনের।

হিন্দু-মুসলমান ভূস্বামীরা বাস করত প্রাচীন-রীতির বড় বড় দালান-বাড়িতে। ঘরের মধ্যে দু-চারটে কাঠের চেয়ার আর পুরানো বেঞ্চি ছাড়া অন্যান্য আসবাবপত্রের কোন বাহুল্যই থাকত না। ঘরের বাকী অংশটার বিছানো থাকত মান্ধাতা-আমলের গদি, সতরঞ্চি, মোটা মোটা তাকিয়া বা মোটা সুতোর ঠাস বুনোট দেওয়া গালিচা ইত্যাদি। এই হচ্ছে বসার ব্যবস্থা। বাইরের দালান বা বারান্দার ছাদ থেকে ঝুলত বিরাট একটা দোলনা। মহারাজরা আরাম করে দোল খেত তাতে। হিন্দু বা মুসলমান ভূস্বামীর তুলনায় পারসী এবং ফুলের বাগানের মালিক ইরানীরা আরও বেশী আনন্দ-বিলাসী। তাদের কারুর কারুর জীবন-ধারায় পাশ্চাত্য প্রভাব পড়েছিল।

তাদের অনুকরণে চেয়ার, টেবিল, সোফা আর অসংখ্য প্রাচীন আমলের আসবাবপত্রে তাদের বাংলো বাড়িগুলো ঠাসা থাকতো। বাড়িগুলোও বেশ বড় এবং পুরানো ধাঁচের। কিন্তু বাইরের দিক থেকে যতই পার্থক্য থাকুক না না কেন, ভিতরে কিন্তু আদিবাসীদের শোষণের প্রশ্নে সবাই হরিহর আত্মা।

ডিমের দামে মুরগী কিনত এক পারসী জমিদার। তার যুক্তি অকাট্য, "প্রজার বাড়িতে ডিম রেখে এসেছি, তার থেকেই মুরগী হয়েছে, অতএব ডিমের যা দাম, মুরগীরও তাই দাম, এতে আশ্চর্যের কি আছে!" দুধ-ঘি, শাক্-শব্জী ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিনা পয়সাতেই মিলত, কাজেই অভাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভরণপোষণের কোন চিন্তা ছিল না। শারীরিক কোন পরিশ্রম কখনো করতে হত না। ক্ষেত-খামারের কাজ কর্ম দেখাশুনো করার জন্য তাদেরই পরিবারের কোন না কোন আশ্রিত লোক দ্বারাই সব করা হত। ভূস্বামীদের একমাত্র কাজ হল হিসাব-নিকাশ খুঁটিয়ে দেখা আর সাধারণভাবে খবরদারি করা। এ ছাড়া অন্য সময় কার্জবিহীন, তখন হাতে অফুরন্ত সময়। যত বড় ধনীই হোক না কেন, তাদের বাড়ির রান্নার সাজসরঞ্জামগুলো অন্যান্য সাধারণের মতোই যেন একেবারে কালিঝুলিতে ভরা; কারণ সকলের ক্ষেত্রেই রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে কাঠের আগুন আর কুয়োর জলের প্রতিক্রিয়া হতো একই রকমের। জ্বালানী এমনিতেই পাওয়া যেত না, তাই সব কিছু রান্নার কাজ কাঠের উনুনেই হত, মাঝে মধ্যে কেরোসিন স্টোভও ব্যবহৃত হত।

কথা-বার্তা, গল্প-সল্প বা আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু খুবই সীমিত। হিন্দুরা কাপের পর কাপ চা খেত আর বারান্দায় বসে বসে তামাক টানত বা পান চিবোত। পারসী আর ইরানীরা চেয়ার বা বেঞ্চে বসে আরাম করত, খোস গল্প চলত। দু-একটা সাধারণ মারাঠী বা গুজরাটী সংবাদপত্র পড়া ছাড়া পড়াশুনো বলতে আর কিছুই ছিল না।

অধিকাংশ সময়ই খাওয়া-দাওয়ার বিষয়বস্তু নিয়ে গাল-গল্প হত। গ্রামে কোন বাড়িতে শ্রাদ্ধ বা অন্য কোন উপলক্ষ্যে ভোজের আসর বসলে, সেখানে কেমন খাওয়াবে বা খাওয়াল—এই নিয়েই খুব রসালাপ চলত। তখন পরনের ধুতিটা একটু আলগা করে দিয়ে বৈঠকখানায় বসে বসে বা বারান্দায় ঝোলানো দোলার উপর একটা পা মুড়ে বসে, আর একটা পা মাটিতে ঠেকিয়ে রেখে ধীরে ধীরে চাপ দিতে দিতে দোলনায় বসে দোল খেত। এইসব লোকগুলো নেমন্তন্ন বাড়ির বেগুন ভাজা, সীমের তরকারি বা ডালের রসালো গল্প করতে করতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। কোন্ কিসানের ক্ষেতে ভালো অড়হর হয়েছে বা—আলু কুমড়ো, লাউ, হয়েছে বা কার বাগানে আম-জাম হয়েছে, কে কে

সে-সব বাবুর বাড়িতে পেলা সাজিয়ে দিয়ে গেল কি গেল না—এই সব হচ্ছে তাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। হোলির উৎসবের দিন হোলি উপলক্ষে যে চাঁচর হত, সে আগুনে আলুর বড়া আর কফি তৈরী করে তাই দিয়ে উৎসব পালন করা হত।

কালেক্টর, পুলিস সুপারিনটেনডেন্টের সফর, বা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস অফিসার ও ঐ বিভাগের অন্যান্য কর্মচারী এবং বন বিভাগের অফিসারদের গ্রামে অবস্থান—এগুলি তাদের আলোচনার আর এক ধরনের অন্যতম মজাদার বিষয়বস্তু ছিল। এই সব লোকগুলোকে সব সময় খুশী রাখতেই তাদের বেশীর ভাগ সময় কেটে যেত, তাতে চেষ্টার কোন ত্রুটি থাকত না।

আলোচনার তৃতীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে আদিবাসী রমণী। আদিবাসী মেয়েদের সংগে তাদের অবৈধ সম্পর্ক এবং সেই সূত্রে তাদের সন্তানাদি নিয়ে জমিদার-মহাজনরা নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি হাসি-ঠাট্টা করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করত না। তার জন্য আইন কানুনের কোন পরোয়াই করত না। আদিবাসী রমণীকে উপপত্নী রূপে রাখাকে একটা গর্ব বলে মনে করত, আমীরী জীবন ও বিলাস ব্যসনের অংগ বলেই ধরে নিত। এতে তাদের কোন রকম ঘৃণা বা লজ্জা বোধের বালাই ছিল না।

এ ছাড়া, আর যে সব বিষয়বস্তু ছিল, মধ্যে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে, ক্ষেতখামারে আদিবাসীদের কাজ করিয়ে নেওয়া, ঘাস ও জংগলে গাছ কাটাই ব্যবসায় মুনাফা লোটার গল্প, কেমন করে অবাধ্য আদিবাসীকে চাবুকের আঘাতে বশে রাখতে হয়—এই গবেষণায় গভীরভাবে তারা মগ্ন হয়ে পড়ত। অবসর বিনোদনের আর এক চমৎকার মাধ্যম হল—খোসমেজাজে দোলনায় দুলতে দুলতে আদিবাসীদের যতরকম নোংরা বিশেষণে অলংকৃত করা, আর মাঝে মাঝে চাবুক চালিয়ে ধমক দেওয়া, সব সময় তাদের সন্ত্রস্ত রাখা। এই সব উচ্চ বিত্তদের মধ্যে যেন একটা গোপন চুক্তি ছিল, গরিব হতভাগ্য আদিবাসীদের সংগে কথা বলতে হলেই বা তাদের প্রতি যে বাক্যবাণ বর্ষিত হবে, তার ভাষা বা শব্দগুলোকে অবশ্যই অশ্লীল এবং গালি গালাজের দ্যোতক হতেই হবে। কোন মানুষকে প্রহার করলে যে প্রহারকারীর সভ্যতা-জ্ঞানের অভাব বা রুচি-বিকৃতির প্রতিফলন ঘটে, এ ধারণাই এই সব সভ্য-ভব্য মহাপুরুষদের বিন্দুমাত্র ছিল না। জ্ঞানের পক্বতা তাদের এমনই।

আমার সব থেকে আশ্চর্য লাগত এই দেখে যে এই সব লোকদের অধিকাংশই আইনজ্ঞ, কেউ আইন-ব্যবসা করছে বা ব্যারিস্টারী করছে, কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ খেতাবধারী। কিন্তু তাদের রুচি-সংস্কৃতির সবটাই তাদের শ্রেণী স্বার্থ গ্রাস করে ফেলেছিল। তাদের ছেলেরা

কেউ ডাক্তার হয়েছে, কেউ উকিল বা অন্যান্য বিষয়ে স্নাতক, শহরে চাকরি-বাকরি করছে; তারাও যখন গ্রামের বাড়িতে আসত সেই বাপ ঠাকুর্দার ঐতিহ্য অনুযায়ী আদিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত এবং শহরে ফেরার সময় মুফতে তাদের কাছ থেকে লাউটা, কুমড়োটা বা অন্যান্য ফলমূল বাগিয়ে নিয়ে যেত। অবাক হয়ে ভাবতাম, এ ধরনের আচরণ বোধ হয় এ জায়গার মাটিরই দোষ। কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এই শিক্ষাই দেয় যে শোষকশ্রেণী নিজেদের মানবিক সৌজন্য-বোধটুকুও হারিয়ে ফেলে।

সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাদের সেই পুরোনো মান্ধাতা আমলের ধারণাই থেকে গিয়েছিল। নতুন গড়ে উঠা সমাজ, পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক পরিবেশ, বাইরের দুনিয়া, তার রাজনীতি, দেশের মানুষের দারিদ্র্য, দেশের অগ্রগতি ইত্যাদি কোন কিছুর সংগেই তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। সাংস্কৃতিক জীবন ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে তাদের সামগ্রিক ধ্যানধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাদের সামাজিক জীবন ও সামগ্রিক জীবন একটা বদ্ধ জলাশয়ের মতো গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ টিটোয়ালা থেকে আদিবাসীরা এলো লাল ঝান্ডা উড়িয়ে এবং একটা প্রচন্ড ধাক্কায় তাদের অবসরভোগী ফূর্তিময় জীবনের শান্ত অবস্থা ভেঙে চুরমার করে দিল।

প্রথম প্রথম এই বিত্তশালী সম্প্রদায় বাইরে কোথায় কি ঘটছে—সে সম্বন্ধে কোন খেয়ালই করল না, কিন্তু পরে খুব শীঘ্রই লাল ঝান্ডা, কমিউনিস্ট পার্টি, প্রগতিশীল গণতন্ত্রী ও উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমর্থনপুষ্ট হয়ে আদিবাসীরা যখন একের পর এক বিজয় অর্জন করতে লাগল, তখন সেই আলোর ঝলসানিতে সমগ্র পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়ণ করতে তারা বাধ্য হল। বদ্ধ চোখ খুলে তাদের আপন সংকীর্ণ জগৎটার বাইরে তাকানো ছাড়া আর কোন উপায়ই রইল না।

জমিদার ও খাতক মহাজনদের পেছু হটা

জেলা কালেকটর শ্রী বেড়েকর জমিদার মহাজনদের প্রথম শিক্ষা দিলেন। ১৯৪৫ সালের ১০ই অক্টোবর, শ্রী হোমি দবিয়ারওয়ালার সজনস্থিত বাংলোয় শ্রী বেড়েকর খাতেদারদের এক বৈঠক আহ্বান করলেন। সেই বৈঠকে আলোচনাকালে তিনি বক্তব্য রাখলেন—"১৯৪৫ সাল শেষ হতে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শেষ। সারা দুনিয়ায় যে নতুন বাতাস বইতে শুরু করেছে সে দিকে লক্ষ্য রেখে খাতেদারদের অবশ্যই এটা বুঝতে চেষ্টা করা উচিত—

কোনদিকে বাতাস বইছে এবং সেই বিবেচনায় আদিবাসীদের প্রতি তাদের মনোভাবেরও পরিবর্তন করা উচিত।

ভাষণের পর কালেক্টর সাহেব উঠে চলে গেলেন। তাঁর মন্তব্যে খাতেদাররা তাঁর প্রতি বেশ রুষ্ট হয়ে উঠল। কারণ তাদের বিশ্বাস বা মনোভাব হচ্ছে—আদিবাসীরাই রীতিমত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, কাজেই কালেক্টার সাহেব কেন অযথা তাদের প্রতি উপদেশামৃত বর্ষণ করবেন? তিনি তো উল্টো-পাল্টা বলছেন। ঘটনাচক্রে ঐদিনই আবার শ্রী বেড়েকর আমাদেরও কথা-বার্তা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি গিয়ে উপরতলায় উঠে গেলাম। আর কমরেড পারুলেকর দেরি করে এসেছিলেন বলে নীচেই থেকে গিয়েছিলেন। খাতেদাররা কেউ তাঁকে চিনতো না। তাছাড়া তারা এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে কেউই তার প্রতি দৃক্‌পাত করল না। শ্রী বেড়েকর তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন তা নিয়েই তারা মত্ত—উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলছে, আর ওদিকে কাছেই কমরেড পারুলেকর একটা চেয়ারে বসে বসে সব শুনেছেন। তাদের নানারকম মন্তব্য থেকেই কালেক্টরের বক্তব্যের সারমর্ম আমরা বুঝে নিয়েছিলাম। অবশ্য আদিবাসীদের প্রতি তাদের যে ব্যবহার তার মধ্যে কোথাও তারা কোন রকম ত্রুটি বা নিন্দনীয় তেমন কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না।

খাতেদাররা দুদিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়েছিল। একদিকে, আমাকে হয়রানি করে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করা, আর অপর-দিকে আদিবাসীদের "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" করে বশে রাখা। তারা পয়সা দিয়ে কয়েকজন লাঠিয়াল ভাড়া করে আদিবাসীদের উত্তম-মধ্যম দেওয়ার ব্যবস্থা করল। আর সেই সংগে সরকার পক্ষকেও অনুরোধ করল যাতে তারা সেই "আদিবাসী-পিটন-যজ্ঞে" কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে; সারা জেলায় যা কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে সে দিকে চোখ-কান বন্ধ রেখে সরকারকে অন্ধ ও বধিরের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। লোকগুলো এমনই প্রতিক্রিয়াশীল যে সত্যিই তারা বিশ্বাস করত—নতুন গদীয়ান সরকার প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ ও গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের ধ্যান-ধারণার প্রতি কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে খোলা-খুলিভাবে তাদের পরিকল্পনা মতো তাদের সংগেই সমান তালে তাল মেলাবে।

ভূস্বামীবর্গের এহেন পরিকল্পনার কথা সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলনের সূত্রে উম্বর গাঁওতে অনুষ্ঠিত জমিদারদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আমি জানতে পেরেছিলাম। জমিদাররা যখন দেখল যে সরকার ঐ সময় তাদের পরিকল্পনা একেবারে হুবহু মেনে নিল না তখন তারা সবাই হতাশ হয়ে পড়েছিল।

একদিন বেলা দশটার কাছাকাছি সস্তন স্টেশনে প্রতীক্ষালয়ে বসে আছি, অপেক্ষা করছি, বোম্বাই প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসবে, এমন সময় এক পারসী জমিদার গৃহিণী হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি তো একেবারে আমায় জড়িয়ে ধরেই বলতে লাগলেন, "আমি এক গরিব ভদ্রমহিলা। দয়া করে আমার বেগার-শ্রমিকগুলোকে বন্ধ করবেন না। আপনিও তো একজন ভদ্রমহিলা। এটা আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, আমার প্রতি আপনি সদয় হবেন"। আমি জবাব দিলাম তাঁকে, "নিজে মহিলা বলেই তো সর্বাগ্রে আমার ভাবতে হচ্ছে অজস্র ক্ষুধার্ত আদিবাসী মেয়েদের কথা, তাদের ছেলেমেয়েদের কথা, এটা আমার কর্তব্য। আর আপনারও তো তাই-ই ভাবা উচিত। আমার অনুরোধ, আপনি তাদের উচিত মজুরি দিন আর তাদের কাছ থেকে কাজ নিন"। আমি যা বললাম তা তিনি বুঝতেই পারলেন না প্রথমে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর যখন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হল, তখন ভদ্রমহিলা ও সঙ্গীসাথীরা সকলেই একযোগে প্রচণ্ড রোষে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে বিশ্রী ভাষায় আপত্তিকর মন্তব্য ছুঁড়ে মারতে লাগল আমার দিকে। আমিও যে একজন মহিলা—একথা বোধ হয় হঠাৎ একেবারে বেমালুম ভুলেই মেরে দিল।

যখনই কোন রেলওয়ে স্টেশনে, কোন জমিদার বা তার দালালরা আমায় দেখতে পেত, সংগে সংগে তাদের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠত, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বিশ্রী কর্কশ স্বরে উপহাস করত। অঙ্গভঙ্গি করে বুনো জানোয়ারের মতো গোলমাল শুরু করে দিত, গান গেয়ে উঠত। একদিন একটা লোককে খুব মদ খাইয়ে—আমায় ভয় দেখানোর জন্য তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমার কাছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল তারা, যাতে গ্রামের মধ্যে কেউ যেন কোনরকম সাহায্য আমাদের না করে। আমাদের অফিসের ঘরের জন্য কেউ যেন না ঘর ভাড়া দেয়, এক ফোঁটা জল পর্যন্তও যেন কেউ না দেয় আমাদের। একজন তো তাদের প্রতিনিধি বৈঠকে এমন প্রস্তাবও রেখেছিল যে, কমরেড দলভি ও আমাকে হত্যা করা উচিত। এ কথা আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম।

জমিদার-পুঙ্গবদের একটা ধারণাই ছিল যে, একবার যদি আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে আসি অথবা যে কোন উপায়ে দৃশ্যপট থেকে আমাকে সরিয়ে ফেলতে পারা যায় তাহলেই তাদের কাজটা খুব সহজ হয়ে উঠবে। কমিউনিস্ট পার্টি কি, কিভাবে তারা কাজ করে, তাদের রাজনীতি কি, আদর্শ কি, এ সব বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। একথা তারা মোটেই জানত না যে, এটা

এমনই একটা আদর্শ—যে আদর্শকে এইভাবে এত সহজে উৎখাত করা যায় না।

১৯৪৫ সালের গুলি চালানোর ঘটনার পর থেকেই জমিদাররা ক্রমশই পিছু হঠতে লাগল। একের পর এক দাবি-দাওয়া আদায় করে চলল আদিবাসীরা। ফসলের মাধ্যমে খাজনা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। 'প্রজাসত্ব আইনে' একটা বিধি-ব্যবস্থ করা হল যে, নগদ পয়সায় খাজনা দেওয়া হবে—ভূমি-রাজস্বের পাঁচগুণ অথবা সর্বাধিক একর পিছু কুড়ি টাকা। নব-জাগ্রত আদিবাসী সম্প্রদায় কিসান সভা ও তার কর্মীদের সহায়তায় এইসব সুযোগ-সুবিধাগুলি কার্যকরী করে তুলতে লাগল। জমিদার ও মহাজনকুল তাদের আত্ম-প্রসাদের সমাধি থেকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠল, চোখ খুলে গেল তাদের। দেখতে পেল স্বয়ং সরকার বাহাদুরকেই বাধ্য হতে হয়েছে আদিবাসীদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে কিছু না কিছু করতে। তারা বুঝতে পারল, হাওয়া কোনদিকে বইছে, সময় সত্যিই বদলাচ্ছে। শক্তি থাকলেই সব কিছু দমন করা যায়—নিজেদের সম্বন্ধে তাদের এই যে উচ্চ ধারণা, দৃঢ়বিশ্বাস, গ্রামের বুকে তাদের প্রচণ্ড দাপট, মান সম্মান—সমস্ত কিছুই যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ডুবতে লাগল। যখন আদিবাসীরা ধীরে ধীরে তাদের আইনলব্ধ অধিকারগুলো একে একে দাবি করতে শুরু করল ও আদায় করতে লাগল, তখন শোষণযন্ত্রের পুরো কাঠামোটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল।

আদিবাসীদের শ্রেণী-সচেতন সংঘবদ্ধ রূপের সামনে দাঁড়িয়ে জমিদারদের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুতে চাইল না, তাদের অভ্যস্ত গালিগালাজগুলো গলায় এসে আটকে গেল। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগত তাদের চাবুক-চালানো হাতগুলো। আর এক্ষুণি আদিবাসীদের সব ঠাণ্ডা করে দেব, পিটিয়ে ছাল ছাড়িয়ে দেব, লাশ ফেলে দেব—ইত্যাদি বাগাড়ম্বরের ফানুসগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ভূস্বামীদের এই পরিবর্তিত আচার-আচরণের কাহিনী আদিবাসীরা বেশ মজা করে রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করত। মহারাজরা সবাই একেবারে ঢিলে হয়ে গেছে। যারা গালি-গালাজ ছাড়া কথাই বলত না, "পবিত্র শব্দ" ছাড়া আহ্বান, আপ্যায়ণ একেবারে কল্পনা করতেই পারত না, তারাই এখন নরম সুরে মিষ্টি করে বলছে, "রাম রাম, নোসায়া ভাই, রাম রাম"। সরকারী কর্মচারীদের আচার-ব্যবহারেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে গেল। স্থানীয় ক্ষুদে সরকারী অফিসাররা এবং পুলিস কনস্টেবলগুলোও আদিবাসীদের সংগে বেশ খাতির করেই কথাবার্তা বলতে লাগল। আর একটা গালি-গালাজও শোনা গেল না।

নিজেদের কাজে বা জমিদারদের কাজে আদিবাসীরা তাদের বাড়ি গেলে, হয় তারা বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকত অথবা এককোণে জবুথবু হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত। নব-জাগরণের পর থেকেই সেই সব আদিবাসীকেই জমিদাররা সাদর আহ্বান জানিয়ে বলতে লাগল, "এসো দেওজী, এখানে এসো, বসো এখানে, ওখনে বসে রয়েছো কেন ?" আদিবাসীরা উত্তরে বলত, "না, না শেঠজী, আমরা ঠিকই আছি এখানে"। যে সমস্ত মানুষ বুক ফুলিয়ে লাল-ঝাণ্ডাকে সমূলে উৎখাত করার কথা বলত, তাদেরকেই লালঝাণ্ডা কেমন ঢিট্ করে সোজা পথে এনেছে—তাই দেখে আদিবাসীরা মনে মনে খুব কৌতুক বোধ করত। কেন তাদেরকে এমন বিনীতভাবে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে, কেন এমন মোলায়েম সুরে কথাবার্তা বলছে—তার নিগূঢ় কারণ আদিবাসীরা জানত। বেশ বিজয়ীর মনোভাব নিয়েই এই সব কথা আদিবাসীরা এসে আমার কাছে বলত। পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে পড়ে কয়েকটা ব্যাপারে জমিদাররা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু এটা তাদের হৃদয় পরিবর্তনের চিহ্ন নয়। শক্তিশালী আদিবাসী সংগঠনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই পরাজয় তারা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ভূস্বামীদের যে সব আত্মীয়-পরিজন অবস্থার চাপে পড়ে জমিদার-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করত, সেসব আশ্রিতদেরই তারা শোষণ ও নিপীড়নের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। শোষণের বনিয়াদ একবার যেই ভেঙে পড়ল, সংগে সংগে এই সব আশ্রিত দালালগুলো একেবারে ফালতু গলগ্রহ হয়ে দাঁড়াল। ১৯৪৫ সালের আগে, বহু বছর ধরে তারা যে একান্ত অনুগতের মতো প্রভুদের সেবা করে এসেছে, প্রতিটি নির্দেশ নিষ্ঠাভরে দ্রুততার সংগে পালন করে এসেছে—দীর্ঘকালের সেই সব আনুগত্যের কথা ভুলে যেতে তাদের প্রভুরা মোটেই বেশি সময় নিল না। প্রভুদের কাছে এখন তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, পরগাছা দালালগুলো যখন আশ্রয়চ্যুত হয়ে একেবারে অসহায়তার গভীর গাড্ডায় গিয়ে পড়ল, তাদের সুরও তখন ধীরে ধীরে বদলাতে লাগল।

আমাদের ক্ষমা করুন—এর থেকে ভালো অন্য কিছু আমরা জানতাম না

উম্বরগাঁও তালুকের খাত্তালওয়াড়ে পিম্পুটকরদের (পাতিল) জমিদারী দেখাশুনা করত শ্রী বীরকর। আঙুলে আঙুলে আংটি পরে, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সে গ্রামের পথে ঘুরে বেড়াত আর চাষীদের সব সময় ধমক দিত। গ্রামের মধ্যে কেউ যাতে আমাকে কোন রকম আশ্রয় না দেয়—তার জন্য সময়ে-অসময়ে গ্রামবাসীদের উপর গিয়ে চড়াও হত। ১৯৫৩ সালের পর, যখন তার সংগে আমাদের দেখা হল দেখি পিম্পুটকরদের দালানবাড়ির বাইরের

দিকে একটা ঘরের মধ্যে বেচারা একেবারে অনাথের মতো শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে রয়েছে, যেন অনাকাঙ্ক্ষিত গলগ্রহ! তার শেষ অবস্থায় কমরেড পারুলেকর ও আমি আবার তার সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। চোখ দুটো তার জলে ভরে গেল। সে বলতে লাগল "আপনাদের আমরা বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। জানতাম না তখন কী করছি আমরা। কিছুই বুঝিনি তখন। দয়া করে ক্ষমা করুন আমাদের। যদি আবার এই রোগশয্যা থেকে বেঁচে উঠি, তখন আপনাদের এই পার্টির জন্যই আপনাদের সংগে কাজ করব"। কমরেড পারুলেকরের প্রকৃতিটা এমনই নরম এবং উদার যে একবার যদি কেউ অসহায়-ভাবে ক্ষমা ভিক্ষা চায়, তিনি নিজেকেই যেন অপরাধী বলে মনে করতেন। বীরকরের হাত দুটি ধরে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তারপর আমরা ফিরে এলাম। এই দৃশ্যের পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমরা উভয়েই নীরবে হাঁটতে লাগলাম।

থাপড়ে নামে এক জমিদারের এক মামা ছিল—শ্রী মামা মুকাদাম। জমিদারের জমিজমা তার হয়ে মামাজী দেখাশুনা করত। এই ভদ্রলোকই ১৯৫২ সালে এমনই বদলে গেল যে, কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জয়লাভ করল। জেলে বসেই এই খবর আমি পেয়েছিলাম। ঘটনার অগ্রগতি এমনই অভাবনীয় যে, প্রথমটায় আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি। এই পরিবর্তন কিন্তু আমাকে হতচকিত করে দিয়েছিল। এমন অনেক ঘটনার উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে।

আদিবাসীদের বিজয় অভিযানে আমরাও সামিল হয়েছিলাম। তারা যখন জয়লাভ করল, তখন জমিদাররাও তাদের আশ্রিতদের সংগে ঘৃণাভরে মর্মান্তিক ব্যবহার শুরু করল। তখন তারা ধীরে ধীরে আমাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। অবশ্য তাদের সংগে কোনদিনই আমাদের ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। তাই তাদের পরিবর্তন শুরু হল এবং তারা ধীরে ধীরে আমাদের দিকে আসতে লাগল।

১৯৫২ সালের বিধান সভার নির্বাচনে, কমরেড শিড়ওয়া সপাটা ও আমি প্রার্থী ছিলাম। পুলিস প্রহরায় আমরা জেল থেকে দহানুতে গেলাম ভোট গণনার সময়। দহানুতে প্রতীক্ষাগারে আমরা বসে রয়েছি, আমাদের সংগে দেখা করতে এলেন শ্রী বারুজের তিনি ভদ্রলোক, পুলিসের সহযোগিতায় আদিবাসী নিগ্রহের ব্যাপারে আন্দোলনের সময় যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমার তো তার সংগে কথা বলতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু কমরেড শিড়ওয়া সপাটা আমায় বললেন, "দিদি এখন ওর সঙ্গে আপনি

কথা বলতে পারেন। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমার কাছে খবর আছে যে, ভদ্রলোকের পরিবর্তন হয়েছে।"

বহুলোকের মধ্যেই এই ধরনের পরিবর্তন এসেছিল। কোন এক সময় জেলা কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের জন্য খাস্তালওয়াড়ের শ্রী ধাপড়ের আবাস-গৃহে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই সময়ে অনেক ছোট-খাটো এবং মাঝারি পর্যায়ের জমিদারদেরও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে লাগল; কারণ, প্রজাস্বত্ব আইনের বলে প্রতিটি জমিদারই প্রায় সমান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। বিরাট বিরাট ধনী জমিদারদের অবশ্য তেমন ক্ষতি হল না। কিন্তু ছোট-খাটদের একেবারে ভাত-ঘরে গিয়ে টান পড়ল। জীবিকার মূলধনটিই যেন তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল। পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মতো শক্তি বা সংহতি তাদের ছিল না; তাদের অবস্থা সত্যিই করুণ হয়ে উঠল।

আদিবাসীদের উপর যখন নিগ্রহ চলছিল আর আমাদের সংগে যখন অচ্ছুৎ হরিজনদের মতো ব্যবহার করা হচ্ছিল, তখন কিন্তু এই ছোট ও মাঝারি জমিদাররা আমাদের বিরুদ্ধে সব সময়ই ধনী জমিদারদের পক্ষেই আশ্রয় নিয়েছে; কারণ, সময়ে অসময়ে বিপদের মুখে ধনী জমিদাররাই তাদের সাহায্য করে এসেছে। এর ফলে এদের উপর ধনীদের প্রচণ্ড প্রভাব কাজ করছিল।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে ধনী জমিদাররা যখন আর আগের মতো তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না, তখন অপেক্ষাকৃত কমজোরী জমিদাররা ধীরে ধীরে আমাদের সংগে কথা বার্তা চালানোর জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল। কিন্তু তাদের সাহস হচ্ছিল না মোটেই। তারা খুব সংকোচ করতে লাগল। আমরা যখন নিজেরাই প্রথম আগ্রহ দেখিয়ে এগিয়ে গেলাম, খোলা-মনে তাদের সংগে কথা-বার্তা বলতে লাগলাম, খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল তারা। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বাড়তে লাগল। ধীরে ধীরে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা, আমাদের আদর্শ, এলাকায় আমাদের ভাবিবাৎ কর্মপন্থা ইত্যাদি যখন বুঝতে পারল, দূরে দূরে থাকার লজ্জা-সংকোচের পর্দাটা তখন খসে পড়ল; আমাদের সংগে যোগ দিয়ে সত্যিকারের বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হয়ে উঠল। এমন কি অনেক ধনী জমিদাররাও আমাদের সম্পর্কে তাদের "অচ্ছুতের" ধারণাটা বদলাতে লাগল। মর্মে মর্মে অনুভব করল যে, আমরা একটা বিরাট শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছি, তাকে আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

১৯৫৩ সালের পরবর্তী কালে, কমিউনিস্ট পার্টি ঐ এলাকায় যে পদমর্যাদা

ও যে সম্মান লাভ করেছিল, তার মূল কৃতিত্বটুকু প্রাপ্য সমস্ত সাধারণ মানুষের এবং সেই সংগে কমরেড লক্ষ্মণ বাপু ধনগর, কমরেড বি. এম. নার্ভেকর, কমরেড ধাকুতে সুতার, কমরেড রক কার্ভালে, কমরেড জ্ঞানেশ্বর দেরে, কমরেড হরিভাউ বীরকর, কমরেড রমাকান্ত গুপ্তে, কমরেড রূপজী কাদু, কমরেড দহানু কোম এবং কমরেড বাধানা প্রমুখ কমিউনিস্ট-পার্টির সভ্যবৃন্দের এবং আরও অসংখ্য নিষ্ঠাবান আত্মত্যাগী, আদর্শ-বান সৎ কর্মীদের আত্মোৎসর্গের পবিত্র রক্তের মধ্য দিয়েই সেই সম্মান অর্জিত হয়েছিল।

এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের প্রচার অভিযান শুরু হল। ১৯৫৩ সালে, "সংযুক্ত মহারাষ্ট্র পরিষদ" আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য আহূত সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সম্মেলন কমিটির থানা জেলা সভায় হাজার হাজার আদিবাসী যোগদান করবে—এ কথা যখন আমি ঘোষণা করলাম, তখন দৃশ্যপটের সমস্ত রূপ-রং একেবারে বদলে গেল। কয়েকদিন পরে শিরগাঁওয়ের এক বৈঠকে ভূস্বামীরা বলতে লাগল, "অতীত, অতীতের গর্ভেই বিলীন হয়ে যাক্, যা হবার হয়ে গেছে, অতীতকে ভুলে যান"। এইভাবে আমাদের সংগে একটা বোঝা-পোড়ায় আসার আগ্রহ দেখাতে লাগল। বৈঠকের মধ্যে এই মানসিক অনুভূতিই কাজ করছিল যার ফলে প্রাণখুলে সবকিছু আলোচনা করা হয়।

আজ এই কাহিনী লেখার সময় একটি অবিচারের কথা মনে পড়ছে; এখনো পর্যন্ত তার কোন সংশোধন হয়নি। সে কথা ভাবতে গেলেই মনের ভেতরের কাঁটাটা খচ্ খচ্ করে ওঠে, উম্বরগাঁও তালুকের মারাঠী ভাষাভাষী লাগোয়া ষোলটি গ্রাম মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যতদিন না পর্যন্ত এই অবিচারের প্রতিকার হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই অবিচারের কাঁটাটি আমার মনের মধ্যে সবসময় রক্ত-ক্ষরণ ঘটিয়ে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে চলবে।

এই সময়ে থানা জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বিরাট জনসভা সংগঠিত হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ সেই সব সভায় যোগ দিত। সভায় ভাষণের সময় আমি আদিবাসী-আন্দোলনের ইতিহাস ও আমাদের কর্মনীতির সব কিছু খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতাম, জনসাধারণকে সুযোগ দিতাম—আন্দোলন ন্যায় সংগত কিনা, তা নিজেরাই বিচার-বিবেচনা করে দেখার জন্য। এইভাবে, আমাদের সম্বন্ধে অনেক চলতি ভুল ধারণা দূর করতে পেরেছিলাম; আমরা যে 'অচ্ছুত' তাদের এই ভুল ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করা হল। মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকের সংগেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল. কেউ বলল, "দেখ, ব্যাপারটা বোঝ, ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন, একেবারে রান্নাঘর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে আমাদের জয় করে

ফেলেছেন!" আবার কেউ বা বলত, "ভদ্রমহিলা এমন সহজ সরল! অথচ মানুষগুলো তার সম্বন্ধে উলটো-পালটা বকে মরেছে।" এই ভাবে আদিবাসী সমাজের বেশির ভাগ মানুষের জয়লাভের সংগে সংগে, অন্য সমাজের মানুষগুলোর সখ্যতাও আমরা আদায় করতে পেরেছিলাম।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য এখনো অপূর্ণ থেকে গিয়েছে। প্রতিটি মানুষের এখন খোলা মন নিয়ে বিগত কয়েক বছরের আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, শোষিত কৃষকদের কৃষি-মজুরদের সংগে সংঘবদ্ধ হতে হবে। তারপর হাতে হাত মেলাতে হবে মধ্যবিত্তদের সংগে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দারিদ্র্য দূর করতে হবে এবং শোষিত শ্রেণীর রাজত্ব কায়েম করতে হবে। এই কাজ করে যেতে হবে। বেঁচে থাকতে থাকতে সেই লক্ষ্য-পূরণ নিজের চোখে দেখে যাওয়ার সুযোগ আমার হবে কি না জানি না, তবে শোষিত শ্রেণীর যে জয় হবেই এবং ইতিহাস যে তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবেই, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। এটা ঐতিহাসিক সত্য। লক্ষ্য-পূরণের পথে হাজারো বাধা, বিপত্তি নিশ্চয়ই থাকতে পারে, অনেক গর্ত, খাদ ও কাঁটার আঁচড়ে রক্ত ঝরতে পারে, কিন্তু আন্দোলন সামনের দিকে ক্রমশঃই এগিয়ে চলবেই, নদী কখনো পিছনের দিক যায় না। "গঙ্গা কখনো পিছনে বহে না।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

খুলে গেল পৃথিবীর দ্বার

বাইরের দুনিয়ার সংগে কোন রকম সম্পর্ক ছিল না আদিবাসীদের, তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। কেউ তাদের কখনো একথা বলেনি যে, তারাও বৃহত্তর পূর্ণতার একটি ক্ষুদ্রতর অংশ, একদিন না একদিন সেই পূর্ণাংশের সংগে এক হয়ে মিলে যেতেই হবে। সমস্যা ও প্রয়োজনগুলি তাদের একেবারে মৌলিক, তাদের ভাষা, শব্দভাণ্ডার নিজেদের প্রয়োজনের মোকাবিলায় খুবই সীমিত। মাত্র গোটা তিরিশেক শব্দ আর বাক্যের সাহায্যে অনায়াসেই তারা কাজ চালিয়ে নিতে পারত। নগরজীবনের নিয়মানুবর্তিতার ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। হয়তো কোন গ্রামে গিয়েছি, আর ফেরার সময় বাস ফেল করে ফেলেছি, সংগে সংগে জবাব দিত, "তাতে আর কী হয়েছে? কাল আবার একটা বাস পাওয়া যাবে। আজ চলে গেছে তো কি আছে?" যেন আজ আর কাল একই কথা, এর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য আছে বলে ধারণাই নেই তাদের। এমন অনেক সময় দেখা গেছে, শুনানীর নির্দিষ্ট তারিখের দু'তিন দিন পরে আদালতে এসে হাজির। এসে বলল—শুনানীর জন্য এসেছি। সময়ের মূল্য বা তার অগ্রগতি—এ ব্যাপারে কোন গুরুত্বই তারা দিত না। এ সব ব্যাপারে তাদের কোন সম্পর্ক রয়েছে বা সে বিষয়ে মাথা ঘামানো সত্যিই কোন প্রয়োজনবোধ করত না তারা। শুধু মাত্র কৃষিকার্যের বেলায়, সময় বা ঋতু সম্পর্কে তাদের নজর তীক্ষ্ণ। খুব সযত্নে ঋতুর সংগে তাল মিলিয়ে চলত। কারণ এটা যে খাস জীবনধারণের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যথা সময়ে কৃষিকার্য করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করত। কারণ ক্ষেতের কাজের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির আনন্দ তারা পেত। ধীরে ধীরে সময়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা বোধ তাদের মধ্যে জেগে উঠল, যখন বিভিন্ন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি বা কৃষক সভার বৈঠক বা সভায় তারা যোগ দিতে আরম্ভ করল। এখন তারা বোঝে নিয়মানুবর্তিতার অর্থ কি; ঠিক সময়ে কাজ করার গুরুত্ব যে কতখানি, এখন সব বোঝে।

এমন শান্ত, নিথর, নিরুদ্বিগ্ন, গড্ডালিকা প্রবাহে তাদের জীবনের স্রোত বইত বলে, তাদের কথাবার্তা, বোধশক্তি—সেও খুব মন্থর। আমরা যা বলতাম, সঠিকভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে অনেকক্ষণ সময় লাগত তাদের। অনেক সময় ঠাট্টা করে বলতাম—"কান থেকে মগজের দূরত্ব অনেকখানি, তাই না?"

জমিদার-মহাজনদের তীক্ষ্ন উচ্চ-নিনাদে তারা এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, সাধারণ মোলায়েম স্বরে তাদের কেউ কোন কথা বললে তারা মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারত না। নরম সুর কোন দাগই কাটত না মনের মধ্যে। তাই বক্তব্য সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য আমাদেরও চিৎকার করে বলতে হত। "এবার উঠতে হবে, সভার কাজ শেষ" এ রকম না বললে কেউই উঠত না। সারাটা জীবন ধরে ভয়-ভীতির মধ্যে থাকতে থাকতে ভাবনা, দুঃখ বা আনন্দ—কোন রকম আবেগের প্রকাশ তাদের চোখে মুখে কোনদিন ফুটে উঠত না। সব সময় যেন উদাস-উদাস ভাব।

এই সব কারণের জন্য, প্রথম প্রথম ওয়ারলি সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় কমরেড পারুলেকর বা আমার মারাত্মক অসুবিধা হত। প্রথম ছ'মাস ধরে অনেক সভায় ভাষণ দিয়েছিলাম। কিন্তু বোঝার কোন উপায়ই ছিল না—আমরা যা বলেছি, তার সত্যিকার কতটুকু বোধগম্য হয়েছে। জমিদার, মহাজন, তাদের শোষণ অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা—এ সব বিষয়ের সংগে তাদের জান-পয়চান আগের থেকেই ছিল বলে এ সব জিনিস তারা বুঝত। কিন্তু এর বাইরে অন্য কিছু তাদের বোধগম্যের আওতায় পড়ে না। ওয়ারলিদের রাজনীতি-সচেতন করে তোলার কাজে একটা ঘটনার কথা আমার আজও মনে আছে। একেবারে হুবহু যা ঘটেছিল তা হলো—জারি সম্মেলনে শেষ হয়ে যাওয়ার পর, অপেক্ষাকৃত চালাকচোস্ত দেখে-শুনে চার-পাঁচ জন ওয়ারলিকে রাত্রিতে থেকে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। ঠিক করেছিলাম—পরদিন সকালে মার্কসবাদের মৌলনীতি নিয়ে তাদের কিছু শেখাব।

"দিদিমণি, একেবারে হৃদয় দিয়ে বুঝে নিয়েছি"

পরদিন সকালে সেই চার-পাঁচ জন আদিবাসীকে পাঠদান-পর্ব শুরু করলাম। সমাজ কাকে বলে, তা বোঝালাম। চলে গেলাম শ্রেণী-সম্পর্ক, শ্রেণী সংগ্রাম এবং উৎপাদন-সম্পর্ক পর্যন্ত। এই সব তত্ত্ব বোঝাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, ওদিকে কমরেড রূপজী কাদু তখন ঢুলতে শুরু করে দিয়েছে। দেওয়ালে মাথাটা ঠেকিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছে। এমন বোধ-

শক্তিরহিত নৈর্ব্যক্তিক মুখের চেহারা দেখে আমার সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন ফুৎকারে নিভে গেল। শিক্ষাদানের সমস্ত কামনা-বাসনা হারিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বাকী সবাইও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। আমার মুখের উপর একটা শোকবিধ্বস্ত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল, পাততাড়ি গুটিয়ে ফেললাম। মাত্র দু তিন বছরের মধ্যেই কিন্তু, ঐ রূপজী কাদুই একজন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ পার্টিকর্মী হয়ে উঠল, গড়ে তুলল নিজেকে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে; স্বচ্ছ তার দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, সদা-সতর্ক তার মানসিক গতি-প্রকৃতি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সভাসমিতিতে সে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে লাগল, হাজাব হাজার মানুষ যোগ দিত সেই সব সভায়।

আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের ভাষণগুলি কেমন করে আদিবাসীদের এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেত তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখনো আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট আঁকা হয়ে আছে। বক্তব্যের মধ্যে প্রায়ই আমরা সাম্রাজ্যবাদ শব্দটা ব্যবহার করতাম। আমার সন্দেহ জাগল মনের মধ্যে—শব্দটার মধ্যে কী বোঝাতে চাইছি তা সত্যিই শ্রোতারা বুঝতে পারছে কি না। একজন আদিবাসী যুবককে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা বলতো, সাম্রাজ্যবাদ কি? সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝ?" সে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকল। তারপর অনেক ভাবনা-চিন্তা করে মুখ ফুটে বলে ফেলল, "ঐ সাওকারশাহীর মতো কিছু জিনিস হবে আর কী, যেটা আমাদের বিরুদ্ধে"। অন্ধকারে আন্দাজে ঢিল ছুড়তে দেখে আমার খুব মজা লাগল। বললাম, "আরে বাবা, সুরজী শব্দটা তো আমরা অহরহ ব্যবহার করছি। অথচ শব্দটার গূঢ় রহস্যটা যে কি, এখনো তোমাদের মাথায় তা ঢুকল না! কী করি বলতো! কী করে শেখাই তোমাদের?" আমার কথা শুনে তার যেন একটু খট্‌কা লাগল, কিন্তু চটপট জবাব দিল, "দিদিমণি, কী করে বুঝব বলুন তো, শব্দটা যে আমাদের কাছে একেবারে নতুন। জমিদার বা সুদখোরেরা তো কখনো বাড়িতে এই শব্দ ব্যবহার করে না। জন্মেও কখনো ও কথা শুনিনি, তা হলে কেমন করে বুঝব বলুন সাম্রাজ্যবাদ কি? কি তার তাৎপর্য?" উত্তরটা শুধু যে সঠিক তাই নয়, খুব চাতুর্যও আছে তার মধ্যে। জমিদার-মহাজনেরা এমনই পশ্চাদপদ যে, হয়তো সত্যি সত্যিই তারা সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে মাথা-টাথা ঘামায় না, তাই ঐ নিয়ে উচ্চবাচ্যও করে না। উত্তরটা শুনে সংগে সংগে সাম্রাজ্যবাদের চেহারা কী তা বোঝানো ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পেলাম না।

তারপর থেকে রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে যে সব শব্দ আমরা বারবার ব্যবহার করি, তার একটা তালিকা তৈরী করলাম। শব্দগুলো কী ভাবে

ব্যাখ্যা করা উচিত—তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা হল। প্রথমে নিজেদের মধ্যে তারপর আদিবাসীদের সংগে আলাপ-আলোচনা করলাম। রাজনীতির জগতে যে সব পরিভাষাগুলি হামেশাই উচ্চারিত হয়, তার সঠিক তাৎপর্য সহজতম ভাষায় কী ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব—সে সম্পর্কে আমরা একটা পরিকল্পনা রচনা করলাম। বিশেষ শিক্ষা ক্লাসের ব্যবস্থা করা হল পরিভাষা শেখানোর জন্য। তাছাড়াও যখনই কোন গ্রামে আমাদের রাত কাটাতে হত, সেখানেই আমরা তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। বারবার শুনতে শুনতে শব্দগুলোর সংগে তারা পরিচিত হয়ে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে সেগুলোর তাৎপর্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠল। এখন তারা ঠিক উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজেরাই সেগুলো প্রয়োগ করতে পারে।

কমরেড পারুলেকর, আমি এবং আরও অনেক সহকর্মী এই এলাকায় ছোট বড় অগণিত বৈঠক ও সভা-সমিতি করেছিলাম। অধিকাংশ গ্রামেই আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি, কাটিয়েছি রাতের পর রাত। এই সব গরিব মানুষগুলোর সংগে তাদের সহজবোধ্য ভাষায় রাজনীতির আলোচনায় প্রহরের পর প্রহর কেটে গেছে। আমাদের সতত সাহচর্য, সচেতন প্রচেষ্টায় আদিবাসীরা শুধু যে রাজনীতির ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল তাই নয়, রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেও শিখল। এ যেন ঠিক ইংরাজী অক্ষর-জ্ঞানহীন কোন লোক কোন ইংরেজ পরিবারের সংগে সব সময় থাকার ফলে কিছু ইংরাজী শব্দ, ভাষা যেমন শিখে যায়, ঠিক সেই ব্যাপার। নতুন নতুন জিনিস শিখতে, বুঝতে এমন তাদের আগ্রহ, আর আমরাও শেখানোর জন্য এমনই দৃঢ়প্রচেষ্ট যে খুব দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে লাগল।

এই সব পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর মধ্যে মানবিক-অধিকারবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য, তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য কমরেড পারুলেকর ও আমি দৃঢ়পণ করেছিলাম। কিছুদিন পরে দেখা গেল—তাদের মানসিক জগতে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। যখন দেখতাম—কোন ওয়ারলি মঞ্চে উঠে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছে, অথবা কোন সভায় কোন আদিবাসী সঠিক রণকৌশলের প্রস্তাব দিচ্ছে—আমাদের মন অপূর্ব আনন্দানুভূতিতে ভরে উঠত। বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে এমন অসংখ্য কর্মী এইভাবে রাজনৈতিক শিক্ষায় শ্রেণী-সচেতন হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

আমরা যা বলছি তা বুঝতে পারলেও, কি তারা বুঝল, তা বোঝাতে গিয়ে কিন্তু খুব মুশকিলে পড়ত, বুঝেছে কি বোঝেনি—তাই বোঝার জন্য আমরা তাদের প্রশ্ন করতে লাগলাম। প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিতে পারল না, এতে মনে খুব কষ্ট পেল। তারপর একজন উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বোঝানোর

অসুবিধার কথা জানাল। বলল, "দিদিমণি মনে বুঝেছি, কিন্তু আমরা কি বুঝলাম তা বুঝিয়ে বলতে পারছি না। এর দ্বারা যা সে বলতে চাইল—তা হচ্ছে—আমরা যা শেখাচ্ছি তা তারা বুঝতে পারছে, আয়ত্তও করছে—কিন্তু ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারছে না। পরে পরে অবশ্য কয়েকজন আদিবাসী নিয়মিত অভ্যাস করতে করতে সঠিকভাবে উত্তর দিতে শিখেছিল।

১৯৫৫ সালে তিনশ' জন আদিবাসীর জন্য আমরা একটা রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেছিলাম। বাছাই করা কমরেডদের নিয়ে এই সব ক্লাস সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল কমরেড নারবেকর ও কমরেড ধনগরের উপর।

কোন গ্রামে জনসভা করতে যাওয়ার সময় কমরেড পারুলেকর ও আমি হিসেব করে সকালের দিকেই সেখানে গিয়ে হাজির হতাম। আশ-পাশের গ্রাম থেকে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের ডেকে আনিয়ে তাদের শিক্ষা-ক্লাস নিতাম। এইভাবে আদিবাসীরা রাজনৈতিক জ্ঞানলাভ করত। ভাষণের পর, কমরেড পারুলেকর তাদেরকে প্রশ্ন জিগ্যেস করতেন। উত্তর দিতে গিয়ে তারা অসুবিধেয় পড়ত, কেউ হয়তো বলত, "আমার গলা খুব খারাপ, দারুণ ব্যথা, কথা বলতে পারছিনা, কেউ বা ধূমপানের অছিলায় বাইরে চলে যেত। আবার কেউ বা জল খাওয়ার নাম করে উঠে পড়ত। বুড়ো বুড়ো লোকেদের এধরনের স্কুলের ছেলেদের মতো ফন্দী-ফিকির দেখে আমাদের বেশ মজা লাগত। শেষ পর্যন্ত কঠিন পরীক্ষা আর এড়াতে না পেরে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করত। না পারার প্রথম লজ্জাটুকু কেটে যাওয়ার পর, তারা নিজেদের মধ্যেই প্রশ্নটা আলোচনা শুরু করে দিত। তারপর একটা সর্ববাদীসম্মত উত্তর ঠিক করে একজনকে প্রতিনিধি হিসেবে উত্তর দেওয়ার জন্য দাঁড় করিয়ে দিত। শিক্ষণ-ক্লাস চলাকালীন, এক দেড় ঘন্টা ছাড়া ছাড়া, পনর-কুড়ি মিনিটের জন্য বিড়ি খাওয়ার ছুটি দিতে হত। দুতিন ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে বসিয়ে রাখলে তারা কোনোমতেই মনসংযোগ করতে পারত না। এখনো পর্যন্ত, এক ঘণ্টা থেকে বড় জোর দেড় ঘণ্টা—এই হচ্ছে সব থেকে দীর্ঘ সময়—এই সময়টুকু কোন রকমে তাদের কোন বিষয়ে মনটা আটকে থাকতে পারে। তার বাইরে আর নয়। অবশ্যই এর পর কিছু সময়ের জন্য আরাম করার সুযোগ দেওয়া দরকার। কারণ কোন জিনিস গ্রহণ করা বা আয়ত্ত করার মতো তাদের বুদ্ধির ক্ষমতা তার বেশী নয়। এর বেশী মানসিক পরিশ্রম করার শক্তি তাদের থাকত না। হাই উঠতে শুরু হত। মুখ-চোখের চেহারা দেখলেই বোঝা যেত—আর নয়, এবার থাক, মগজে আর ঢুকবে না।

আদিবাসীদের দুনিয়া আরও বিস্তৃতি লাভ করল

দহানু তালুকের মহালক্ষ্মী গ্রামে কমরেড পারুলেকর একবার প্রায় তিন হাজার আদিবাসীর এক পার্টি-ক্লাস নিয়েছিলেন। দু-দিন ধরে চলেছিল সেই ক্লাস। আদিবাসীরা সংগে নিয়ে এসেছিল তাদের রুটি (ভকরি)। দু দিন ধরে বিদ্যালাভের পর, তাদের যেন মনে হল, একটা নতুন কিছু তারা আবিষ্কার করে ফেলেছে। অন্তরের খুব কাছাকাছি সমস্যাগুলোর উপর যেন নতুন আলোর ঝলক গিয়ে পড়েছে। খুশীতে এমন ভরপুর হয়ে গিয়েছিল যে, বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে সবাই মিলে কমরেড পারুলেকরকে ঘিরে দাঁড়াল। উদ্দেশ্য—তাদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা, আনন্দ সবটুকু উজাড় করে তাঁকে নিবেদন করা। কিন্তু কী ভাবে তা অর্পণ করবে, তা তাদের জানা নেই, শুধু চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। চোখে মুখে ফুটে উঠল খুশীর জোয়ার ভরা প্রত্যাশার দৃপ্ত আবেগ।

নতুন ক্লাসে প্রথম পাঠনের দায়িত্ব আমার ঘাড়েই পড়ত। ভূমিকা স্বরূপ আমার পাঠ-দানের পর কমরেড পারুলেকর সেখান থেকেই শুরু করতেন। প্রস্তাবনার পথ মসৃণ হওয়ার পর, তাঁর বক্তব্য অনায়াসেই গতিলাভ করত। কিন্তু নিজে প্রথমে শুরু করতেন না, প্রচণ্ড জেদ ধরতেন—আমি যেন প্রথম পদক্ষেপে বলটা গড়িয়ে দিই। তাঁর সেই জেদ পূরণ না হলে কথা বলতেই চাইতেন না। শুধু শান্তভাবে পিছনে বসে থেকে বলতেন, "আমি কিছু বলব না"। অনড় জেদের কাছে হার মানা ছাড়া আমার আর উপায় থাকত না। আমাকেই মুখবন্ধ করতে হত।

কোন কোন জমিদার, মহাজন বা তাদের দালাল আদিবাসীদের জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করত, "আরে, লালঝাণ্ডার লোকেরা তোদের বোকা বানাচ্ছে! সরকারের হাতে যন্ত্র আছে, ক্ষমতা আছে, আছে সৈন্যবাহিনী। তোরা জমি আদায় করবি কি করে?" আদিবাসীরাও সংগে সংগে মুখের উপর জবাব দিত, "সরকারের তো ক্ষমতা ছিল, পুলিস ছিল, সৈন্য-সামন্ত ছিল। তা সত্ত্বেও তো বেগার প্রথার জোয়াল্ থেকে মুক্তি পেয়েছি, খাজনা কমাতে পেরেছি, ঠিক তেমনি করেই জমিও আদায় করে ছাড়ব।" উত্তর শুনে তো জমিদার মহাজনদের নাড়ীর গতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। মুখে শুধু বিড়বিড় করে বলত "আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে ঠিক আছে"। তখন আর কোন রকম তর্ক-বিতর্কের জালে না জড়িয়ে পালিয়ে বাঁচত।

আদিবাসীদের কাছে, সহজে কোন জিনিস ব্যাখ্যা করা সম্ভব হত না। কারণ, তালুক, জেলা, রাজ্য, জাতি বা পৃথিবী—এসব শব্দগুলোর অর্থ কি,

কি তার তাৎপর্য—এ সব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও তাদের ছিল না। "আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে তাদের একটা ধারণা সৃষ্টি করা এক দুরূহ কাজ। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হত এই সব কাজ করতে গিয়ে। দশ ফুট লম্বা আর ছ ফুট চওড়া পৃথিবীর একটা মানচিত্র তৈরী করেছিলাম। তার উপর নানা রংয়ের বৈচিত্র্য এনে দুটি পৃথক দুনিয়ার রাষ্ট্রকাঠামোর চিত্ররূপ দেওয়া হয়। ছোট বড় সমস্ত সভায়, গ্রুপ বৈঠকে ঐ মানচিত্র খুলে দেখিয়ে সমস্ত বোঝানো হত। এইভাবে তারা প্রথম বুঝতে পারল—পৃথিবী বলে শব্দটা কি, কি তার অর্থ! পৃথিবীর কল্পনা তাদের কাছে ধীরে ধীরে রূপ পেল। আমাদের অফিস-ঘরে ভারতবর্ষ, মহারাষ্ট্র এবং অন্যান্য জেলারও মানচিত্র টাঙানো ছিল। সেগুলো বারবার দেখাতাম, বোঝাতাম, এইভাবে ধীরে ধীরে দেশ বলতে কি বোঝায়, ভারতবর্ষ যে একটা দেশ—এ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাল তাদের।

নানান জায়গায় ঘুরলে-ফিরলে নানান অভিজ্ঞতা বাড়ে। আদিবাসীদেরও অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল, ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা ঘটল, অভিজ্ঞতায়, বুদ্ধিবৃত্তিতে, বোধশক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। ১৯৪৭ সালে থানা জেলায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল এবং জেলা সীমানার বাইরে আমাদের বহিষ্কার করা হল। তার ফলে থানা জেলার পার্টি সম্মেলন করতে হয়েছিল বোম্বাইয়ের প্লাভাৎস্কী লজে। দুশ'জন আদিবাসী এই প্রথম বোম্বাই শহরে পা দিল সেই সম্মেলনে যোগ দিতে এসে। অনুরূপভাবে মহারাষ্ট্র রাজ্য সম্মেলন ও অন্যান্য জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রতিনিধি এবং দর্শক হিসেবে অনেক আদিবাসী ধুলিয়া, জলগাঁও, নাগর, নাসিক, পুণা প্রভৃতি নানা জায়গায় ঘুরল। জেলার প্রতিটি পার্টি সভ্য পরস্পর পরস্পরকে ভালভাবে চিনতে পারল। আদিবাসীরা, যারা কোনদিন নিজেদের গ্রামের বাইরে পা দেয়নি, তারাই এখন অন্য জেলার অন্য তালুকের আদিবাসীদের প্রশংসা করতে লাগল। জন্ম নিল পরস্পরের মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধন, ক্রমে ক্রমে তা দৃঢ় হয়ে উঠল। নিজেদের সমাজকে একটা অখণ্ড সত্তারূপে তারা চিনতে পারল, দেখতে পেল তার পূর্ণ রূপ। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য কৃষক, যারা আদিবাসী নয়, তাদের সংগেও হল পরিচয়, ঘটল পরম আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ বন্ধন। সারা ভারত কিসান পরিষদের সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে গাজীপুর, মোহা, মায়াভরম্, ত্রিচুর প্রভৃতি দূরে দূরে অনেক জায়গায় তারা বেড়িয়ে এল। এই-ভাবে নানান জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে অনেক আদিবাসী তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণ খোলসটা ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। প্রসারিত হল তাদের দৃষ্টি-শক্তি, কল্পনার বাঁধন গেল খুলে, বিশাল ব্যাপ্তি পেল ঐক্যের পরিধি।

তারা হাজার, লক্ষ, কোটি প্রভৃতি সংখ্যাগুলোর কোন অর্থই জানত না। তাদের সংখ্যা গণনার অভিজ্ঞতা কয়েক বোঝা ঘাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঁচ বোঝা ঘাসে হয় একটা ছোট গাদা (Ganji), আর পাঁচশ' বোঝায় "বড়-গাদা" (Ganj)। এই হচ্ছে সাধারণভাবে সংখ্যা গণনার বিস্তার। কেউ কেউ হয়তো এক লাখ ঘাসের বোঝা বলতে কি বোঝায়, তা জানত, কিন্তু কোটি সংখ্যাটা জ্ঞানের বাইরে। দৈনন্দিন লেনদেনের সীমানা থেকে সংখ্যাটা নির্বাসিত। আমরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানান দৃষ্টান্ত থেকে সংখ্যা-তত্ত্ব শেখাতাম। নতুন কোন কিছু শেখানোর সময়ই, আমরা সব সময় খেয়াল রাখতাম তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, তাদের অভিজ্ঞতার দিকে; তার ভিত্তিতেই লেখা ও শেখানো সহজতর হয়ে উঠত।

তারাও যে সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ পার্টি সভ্য সমন্বিত বিশাল এক আন্তর্জাতিক পার্টির একটা অংশ—এই কথা ভেবে আদিবাসীরা গর্ববোধ করতে লাগল। সারা দুনিয়ার শোষণের শৃংখল ভেংগে চুরমার করার পবিত্র কাজে অংশগ্রহণের আনন্দে গর্বিত হয়ে হয়ে উঠল প্রতিটি আদিবাসী। তারা যখন শুনল যে, তাদের কমিউনিস্ট পার্টিতে কোটি কোটি সভ্য রয়েছে, তখন তাদের একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগল কোটি বলতে কি বোঝায়, কত হলে কোটি হয়—এসব জানতেই হবে। কোটি সংখ্যা সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা আনার জন্য, এনে হাজির করল দু' ঝুড়ি মটরশুটির খোসা, এনে গুণতে শুরু করে দিল। প্রচণ্ড উৎসাহে কিছুক্ষণ ধরে চলল গণনাপর্ব, তারপর হতোদ্যম হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সংখ্যাটা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট হওয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, যে অমূল্য অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আদিবাসীরা লাভ করেছিল, তার মূলে যে রয়েছে তাদের অনবদ্য সংগ্রাম, যার মধ্যে তারা আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিল—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর তার সংগে যুক্ত হয়েছিল পার্টি কর্মীদের নিরন্তর সংগ ও সহযোগিতা। পার্টি কর্মীদের অনলস প্রচেষ্টার বলেই গড়ে উঠেছিল আজকের রাজনৈতিক সচেতন আদিবাসী সমাজ আর তাদের সুদৃঢ় সংগঠন। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্য। অবদান ঐ পার্টি কর্মীদের। শুধুমাত্র জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়ে, ভাষণ দিয়ে, মাঝে মধ্যে চকিত পরিদর্শন করে বা ছ' মাস বা ঐ রকম কয়েক মাস অন্তর কয়েকটা পার্টিক্লাসের মাধ্যমে ঐ রকম বিরাট কাজ কোনদিন সম্ভব নয়। এমনতর একটি সংগঠন শুধুমাত্র সেই সব কর্মীদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল, যারা জনসাধারণের সংগে

সত্যিসত্যিই বাস করত, তাদের জীবনযাত্রার সংগে নিগূঢ় সম্পর্ক রেখে তাদের সংগে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যে সব শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা নিজেদের বেশি বেশি প্রগতিশীল এবং সুসভ্য বলে মনে করেন, তাদের থেকেও আজ এই সব কৃষকদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের।

আর জমিদার-মহাজনদের থেকে আরও বেশী জ্ঞানলাভ করার একটা অদম্য স্পৃহা আদিবাসীরা সবসময়ই অনুভব করত। যাদেরকে অশিক্ষিত বলে মনে করা হয়, সেই সব কৃষকরা প্রায়ই এমনভাবে কথা-বার্তা বলত, যুক্তি-জাল বিস্তার করত যে, তাই দেখে জমিদারপুংগবরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত।

জমিদার-মহাজনদের নৃশংস নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আদিবাসীরা ভুলেই গিয়েছিল যে তারাও মানুষ। নিরন্তর প্রহার ছাড়া আর কিছুই কপালে জোটেনি, উপবাসে উপবাসে নির্জীব ও হতোদ্যম হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল সব। আজ যখন গ্রামের সেই সংকীর্ণ গণ্ডীর বেড়াজাল থেকে তাদের টেনে বাইরে বের করে আনা হল, দৃষ্টিশক্তি ছড়িয়ে পড়ল আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে—হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে কেশর ফুলিয়ে জেগে উঠল পশুরাজ। সাংগঠনিক বোধ আর প্রতিরোধ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠল। জেগে উঠল প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ। যে তীব্র সংঘর্ষের মধ্যে তারা জড়িয়ে পড়েছিল সেই সংঘর্ষে দলিত মথিত হয়ে রূপ নিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতের এক নতুন মানুষ, যেন একেবারে পুনর্জন্ম ঘটে গেল। সেই পুরানো ওয়ারলি আর নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নতুন শ্রেণী-সচেতন একজন ওয়ারলি—সংগ্রামের আগুনে পোড় খাওয়া ইস্পাত-কঠিন একজন মানুষ। সাধারণ কালপ্রভাবে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বছরের পর বছর কেটে যেত, সেই জ্ঞানই অতি অল্প সময়ের ব্যবধানেই এনে দিল তার সংগ্রামী সচেতনতা, তার নবজাগ্রত বিপ্লবী সত্তা। সে আবিষ্কার করল যারা এতদিন তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে উপবাসে পিষ্ট করছিল, তারা তাদেরই শ্রমের ফসল দিয়ে তাদের বিলাস বহুল-জীবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছে। সে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল—"আমি ভুখা মরতে চাই না, মরবো না"।

"সত্যি, কী যাদুবিদ্যাই না আপনি দেখাচ্ছেন!"

আন্দোলনের সময় প্রচুর আদিবাসীকে পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে হাজতে আটকে রেখেছিল। ১৯৪৫ সালের গুলি চালনার ঘটনার পর, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে অনেকের উপর অত্যাচারের করাল চক্র নেমে এল। তাদেরকে নৈতিক সমর্থন জানানোর জন্য অথবা তাদের মুক্তির জামিন হিসাবে

প্রায়ই তখন আদালতে নিজে উপস্থিত থাকতাম। থানায় থানায় ঘুরে ঘুরে বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ঘুরতে ঘুরতে কেটে যেত দিনের পর দিন। সেখানে দেখতাম আদিবাসীরা দলে দলে এসেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অটুট ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। সেই সুযোগে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের আদিবাসীদের সংগে আমি দেখা করতাম। তারা যে কত বদলে গেছে—তার নানান দৃষ্টান্ত ঐ সময়ে আমি আবিষ্কার করেছিলাম।

একদিন বিকেলে উম্বরগাঁও শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের দিকে আমি হেঁটে চলেছি। অফিসটা শ্রী মুলে নামক এক ভদ্রলোকের বাড়ির কাছাকাছি। উম্বরগাঁও শহরে, তখনকার দিনে স্থানীয় কোন অভিজাত সন্তান আমাদের সংগে কথাবার্তা বলত না। তাদের মতে আমরা হচ্ছি অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ভুক্ত।

সেদিন আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ চশমাপরা মধ্য বয়সী একজন অভিজাত পুরুষ আমার সামনে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "আচ্ছা বলুন তো, কী ধরনের অদ্ভুত জাদুবিদ্যা আপনি দেখাচ্ছেন? জানেন, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে হবে এই চিন্তাতেই এককালে এই সব আদিবাসীরা ভয়ে থরথর করে কাঁপত। মুখ দিয়ে তখন একটা কথা পর্যন্ত বেরোত না। বছরের পর বছর ধরে আমরা এ সব দেখে আসছি। আর এখন তারা আদালতে দাঁড়িয়ে নিভীকভাবে উত্তর দেয়! সাধারণ পুলিসের কথা না হয় ছেড়েই দিন। এখন এরা ম্যাজিস্ট্রেটকেও ভয় করে না? জানেন, এই সব ম্যাজিস্ট্রেটরা সবাই জমিদার কুলোদ্ভব। কিন্তু তাতে কি ভাবছেন যে লোকেরা ঘাবড়ে গেছে মোটেই না! তাদের উত্তরগুলো যেন এক একটা বুলেট। সত্যিই, কী মায়াজাল বিস্তার করে তাদের এমন করে তুলেছেন বলুন তো?" এই ভদ্রলোক ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে কাজ করেন। জানি না—কেন তিনি এমনতর মন্তব্য করলেন। পরে অবশ্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি আনুপূর্বিক সব ঘটনা বললেন।

বহু ওয়ারলিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে, উম্বরগাঁওতে পুলিসের হাওলাখানায় রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল এক তেজী সাহসী ওয়ারলি যুবক। লক-আপের মধ্যে ওয়ারলিরা রয়েছে, একদিন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সেখানে পরিদর্শন করতে। লক-আপের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশামৃত বর্ষণ করতে লাগলেন। জেঠিরা নামে এক ওয়ারলিকে তিনি লালঝাণ্ডার সংগে তার সংশ্রব ও আনুগত্য ছিন্ন করার কথা বললেন। তাকে ভালো চাকরীর প্রতিশ্রুতি দিলেন। বললেন—লালঝাণ্ডার প্রতি আনুগত্যের জন্যে জেলের মধ্যে পচে মরার থেকে বরং চাকরি নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করা শতগুণে ভাল। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেব এসে তাদের সামনে বাণী বিতরণ করছেন—এ এক নতুন ঘটনা তাদের কাছে। অসীম ধৈর্য নিয়ে জেঠিয়া শুনল সব কথা, তারপর মুখের উপর জবাব দিল, "সরকার আমাদের কতদিন ধরে রাখবে লক-আপে? এক বছর কি দু বছর? তারপর একদিন না একদিন তো ছাড়তেই হবে; কিন্তু জমানা যখন বদলাবে, আমরা যখন ক্ষমতায় আসবো, সেদিনের জন্য তো এই সব ঘরগুলো আপনাদের মতো ভদ্রলোকদের জন্য আমাদের সুরক্ষিত করে রাখতে হবে।"

ঐ অর্ধ-উলংগ নিরক্ষর মানুষটার কাছ থেকে এই ধরনের জবাব পেয়ে শেঠ মহারাজের চক্ষু একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল। বুঝতেই পারলেন না কি উত্তর দেবেন তার। লোকটা যে শুধু তাকে হতবাক্ করে দিয়েছে, তাই নয়, উপরন্তু চরম অপমানও করল। সংগে সংগে ভদ্রলোক একেবারে "পিছু মোড়, দৌড়কে চল্"।

যিনি আমাকে এই কাহিনী বললেন তিনি মন্তব্য করলেন যে, একজন সাধারণ ওয়ারলির এই রকম বলিষ্ঠ উত্তর শুনে ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের প্রতিটি মানুষ একেবারে থ হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক আরও বলেই চললেন, "আপনি এখান দিয়ে যাচ্ছেন দেখে, আর কোনক্রমেই লোভ সামলাতে পারলাম না। যা নিজের চোখে দেখলাম, নিজের কানে শুনলাল—সব বৃত্তান্ত আপনাকে ছুটে বলতে এলাম। যদি নিজেরা না দেখতাম বা শুনতাম, অন্য কেউ এসে একথা বললে কখনো বিশ্বাসই করতাম না। তাই তো জানতে ইচ্ছে হচ্ছে—"কী মোহিনী মায়ায় ওদের বেঁধেছেন বলুন তো?" এ যদি সত্যিই জাদুবিদ্যার প্রভাব হয়, তাহলে সে জাদু আমার নয়। এ জাদুশক্তি মার্কসবাদের, এ জাদু কমিউনিস্ট পার্টির। বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ারে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটা সমাজের মধ্যে যে কী রকম গুণগত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে—এ সম্পর্কে ঐ ভদ্রলোকের কোন ধারণাই ছিল না। তাই এই বিস্ময়। ঘটনাটা এখনো আমার স্মৃতিপটে গভীরভাবে অংকিত হয়ে আছে।

সাহস-সৌকর্যে ভরা প্রতিরোধ সংগ্রামের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

আদিবাসীরা জানত যে, সরকারী অফিসাররা, বিশেষ করে পুলিস অফিসাররাই সমস্ত স্বৈরাচারী শক্তির মূল নিয়ামক। তা সত্ত্বেও, ঐ আন্দোলনের সময়েই পুলিসের এক সাব-ইন্সপেক্টরকে তার "পঞ্চনামা" (Panchanama) প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল ঐ আদিবাসীরা।

রায়তলীর বেশ কয়েকজন আদিবাসী একদিন দহানুতে তাড়ি খেয়ে

গ্রামে ফিরছিল। নেশা বেশ ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। আসার সময় রাস্তার মধ্যখান দিয়ে আসছিল তারা। এমন সময় পিছন দিক থেকে আসছিল এক জমিদারের টাংগা। ওয়ারলিদের রাস্তার মধ্যখান দিয়ে হাটতে দেখে ভদ্রলোকতো একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। পুরানো অভ্যাস মতো চিৎকার করে নোংরা গালি-গালাজের তুবড়ী ছোটাল। টাংগা নিয়ে যাওয়ার জন্য পথ করে দিতে বলল, ধীরে ধীরে টাংগা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করল। গালি-গালাজের বহর দেখে ওয়ারলিদের নেশা ছুটে গেল, ধৈর্য হারিয়ে ফেলে টাংগাটা থামিয়ে ফেলল। বলল তাকে, "আমরাও তোমাকে যা ভাবি, তা শুনতে হবে। যতক্ষণ না আমাদের কথা শেষ হয়, টাংগা আমরা ছাড়ছি না"। অনেক ক্ষণ ধরে গরম-গরম কথা-কাটাকাটির পর টাংগা ছাড়ল তারা।

জমিদার, আর তার এক পরমাত্মীয় ঠিক করল এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। পুলিসের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল—আদিবাসীরা তাদের কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা ছিনতাই করে নিয়েছে। একজন সাব্ ইন্সপেকটরকে সংগে নিয়ে শেঠজী চলল রায়তলী। গিয়ে ঢুকে পড়ল এক ওয়ারলির কুঁড়ে ঘরের মধ্যে, অনুসন্ধান চালাবে। আত্মীয়টি রইল বাইরে দাঁড়িয়ে। ইতিমধ্যে গ্রামের সবাই এসে জমায়েত হয়ে গেছে। আত্মীয়টি পাঁচটি দশ টাকার নোটের একটা গোছা দরজার চৌকাটের মাথার উপর চালের মধ্যে গোপনে গুঁজে রেখে দিল। জমিদার আর সাব ইন্সপেক্টর তল্লাসি সেরে বাইরে যখন বেরিয়ে এল, গুণধর আত্মীয় তখন নোটের গোছাটা টেনে বের করে এনে তাদের হাতে তুলে দিল। ব্যাস, বামাল ধরা পড়ে গেল। চুরির অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণও হয়ে গেল, সাব ইন্সপেক্টর তখন "পঞ্চনামা" তৈরী করে সবাইকে পড়ে শোনাল। ইতিমধ্যেই আরও অনেক আদিবাসী ঘটনাস্থলে এসে হাজির। পঞ্চনামা পড়া শেষ হওয়ার পর দেখা গেল তাদের নতুন রূপ, নতুন চেহারা। তাদের কেউ কেউ, আত্মীয়টির অপকর্ম, ঐ চালের বাতায় টাকা গুঁজে রাখার দৃশ্যটা দেখেছিল। চিৎকার করে উঠল তারা। পঞ্চনামা জাল, সব মিথ্যা। প্রতিবাদ এমনই সোচ্চার এবং তীব্র যে, শেষ পর্যন্ত দারোগা সাহেব সেই ভিত্তিহীন, ভুয়া পঞ্চনামা ওয়ারলিদের হাতেই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল। তারপর শূন্যহস্তে প্রস্থান।

ওয়ারলিরা চাইল, ঐ পঞ্চনামা পার্টি অফিসে নিয়ে আসতে, জমিদার মহাজনদের অসাধু-কীর্তির জাজ্বল্য প্রমাণ স্বরূপ সবাইকে সেটা দেখাতে।

ওদিকে জমিদার বা সরকার—কেউই এই অপমান হজম করে চুপ করে বসে থাকতে রাজী নয়। এবার তারা আনল ডাকাতির অভিযোগ। পরদিন

খুব ভোরে, তখনো কাক-কোকিল ডাকেনি, পুলিস-সুপারিনটেনডেণ্ট মিঃ শরিফখান্ তার বাহিনী নিয়ে রায়তলী গিয়ে হাজির। এলাকার জমিদারদের কাছে যে সমস্ত আদিবাসীরা একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত, যাদের ছায়া দেখলে তারা কাঁপে সেই রকম পঞ্চান্ন জনকে গ্রেপ্তার করে তিনি দহানুতে নিয়ে এলেন। পঞ্চান্নজন আদিবাসীর এই গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল—এতগুলো লোককে জামিনে ছাড় করানোর জন্য প্রচুর টাকার দরকার, কি ভাবে তা সংগ্রহ করা যাবে। জামিনে যদি ছাড় করিয়ে নিয়ে আসা না যায়, তাহলে বিনা কারণে সাজা পেয়ে বন্দী থাকার কী প্রচণ্ড ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে আদিবাসীদের মধ্যে! আর ওদিকে তখন, এই পরিস্থিতির সুযোগ জমিদাররা কেমন কাজে লাগাবে! কমরেড পারুলেকর ও আমি দারুণ ভাবনায় পড়ে গেলাম। সমস্যাটা নিয়ে কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওদিকে উকিলরা টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন এক্ষুনি জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিকে আদিবাসীরা আশা করে বসে আছে, দিদিমণি যখন রয়েছেন, ব্যবস্থা একটা কিছু হবেই। অবিলম্বে জামিনদার দরকার। শেষ পর্যন্ত অন্য কোন পথ আর খুঁজে না পেয়ে হাজির হলাম কমরেড চন্দ্রকান্ত বৈদ্যর বাড়িতে, সে থাকত থানা-শহরে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, কমরেড বৈদ্যের বাবা প্রয়াত শ্রীধরপন্থ বৈদ্য সকলের জন্য জামিনদার হয়ে দাঁড়ানে'র প্রস্তাব দিলেন। সব আদিবাসীকেই জামিনে ছাড় করিয়ে আনা হল। আন্দোলনের উপর এর ভাল প্রভাব পড়ল। বৈদ্য-জীকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমরা। উত্তর কালে, যখনই রায়তলীর প্রসংগ উঠত, কমরেড পারুলেকর সর্বদাই গভীরতম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় প্রয়াত শ্রীযুক্ত বৈদ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। কয়েকমাস পরেই সেই পঞ্চান্ন জন আদিবাসীই নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেল। লাল-ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ,—ধ্বনি দিতে দিতে তারা বাড়ি ফিরে গেল।

আদিবাসীরা যখন তাদের অধিকার বোধ নেয়ে জেগে উঠল, সরকারী অফিসাররাও তাদের শোষণের জাল গুটিয়ে নিতে বাধ্য হল। সাতের বার ভাগ (৭/১২) রেকড করানোর জন্য কিসানদের প্রায়ই দরখাস্ত করতে হত স্থানীয় সরকারী প্রতিনিধির কাছে। আইন-অনুযায়ী রেকর্ডের কপির জন্য ফি লাগত মাত্র ন' পয়সা। পাটোয়ারী (Talathi) হচ্ছে এই কপির নকল দেওয়ার মালিক। এই সব রেকর্ড খুব জরুরী। কৃষকদের এই জরুরী প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে একজন বিশেষ পাটোয়ারী নকলের জন্য দশ-বার টাকা করে দাবি করে বসল এবং এইভাবে তিনশ' টাকা বাগিয়ে নিল। আদি-বাসীরা গিয়ে ধরল তাকে। লালঝাণ্ডার কাছে নিয়ে গিয়ে ক্ষমা-প্রার্থনা

করতে বাধ্য করল। জোর-জুলুম করে আদায় করা টাকাও সে ফেরৎ দিতে বাধ্য হল এইভাবে, একবার তাদের সচেতনতা জন্মানোর পর তারাই শোষণ বন্ধ করতে উদ্যোগী হল, বে-আইনী ঘুষ-ঘাসের পথ তারা বন্ধ করতে শুরুল।

আমি যখন থানা-জেলা থেকে বহিষ্কৃত ছিলাম, সেই সময় আদিবাসীরা কয়েকজন জমিদারকে তাদের নিজেদের তৈরি দাওয়াই-এর আস্বাদ তাদেরই গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল, নিজের জালে নিজেরাই বন্ধ হয়ে তাদের নিপীড়নের রথ থামালো। একজন জমিদারকে তারা ঘিরে ফেলল, তার পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়িয়ে তাকে একটা লাঙোটি পরিয়ে ছাড়ল, মাথায় চাপাল একটা বোঝা, তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পড়ল সব। তারপর কুকুরকে যেমন মানুষ মুখে এক ধরনের শব্দ করে ডাকে—সেই রকম শব্দ করে একজন তাকে ডাকতে থাকল, আহ্বান শুনে জমিদার মহাপ্রভুকে মাথায় মোট নিয়ে তার দিকে যেতে হবে। আবার, তার কাছে গিয়ে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে ওদিক থেকে আরেকজন অনুরূপ শব্দ করে ডাকতে থাকল, তখন আবার তার কাছে যেতে হবে। এইভাবে চলল অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না পরিশ্রান্ত হয়ে মুক্তি পাওয়ার জন্য নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাল। তখন তারাও উপদেশ দিয়ে ছাড়ল, "কি, খুব কষ্ট হল তো, হাঁপিয়ে উঠেছো একেবারে। এ আর তেমন কি বোঝা। এর থেকে অনেক ভারী বোঝা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে যখন মাইলের পর মাইল বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করতে, তখন কেমন লাগত আমাদের, এখন নিজে একটু বুঝলে তো"? এইভাবে জ্ঞান দিয়ে তবে ছাড়ল তাকে, গায়ে কিন্তু হাত দিল না মোটেই, বেচারা কাপড়-জামা নিয়ে মুখ লুকিয়ে পালাল।

আজ-পর্যন্তও এই কাহিনী আদিবাসীরা আমার কাছে গোপন করে রেখেছে। আমি এটা শুনেছিলাম ঐ জমিদারের এক সর্দারের কাছ থেকে। আমাকে এ কথা কখনো বলেনি, তার কারণ এটা তারা নিশ্চিতই জানত যে আমি কোনদিন এ ধরনের নির্যাতন বরদাস্ত করব না। কোন বিবেকবান মানুষই তা করতে পারে না। কিন্তু আদিবাসীদেরকে যে নিষ্ঠুর নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, এ ধরনের ছোট্ট খাটো বিছিন্ন ঘটনা ক্ষমার যোগ্য বলে নিশ্চয়ই বিবেচিত হবে। সম্মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখে পৃথিবীতে কোন অশুভ শক্তিই যে টিকে থাকতে পারে না, ঐক্যবদ্ধ সংঘশক্তির কাছে তাকে যে নতজানু হতেই হবে, এই অভিজ্ঞতা, ওই দৃষ্টান্তের বিচারেও অনুরূপ ঘটনা ক্ষমা করে দেওয়া উচিত।

এটা অবশ্য সত্য যে, আমরা সকলেই বহিষ্কৃত হওয়ার পর কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? দায়ী

কি ঐ জমিদাররাই নয়, যাদের নিষ্ঠুর নিপীড়নে পিষ্ঠ হয়ে হয়ে আদিবাসী-দেরও শেষ পর্যন্ত একটু প্রতিহিংসা চরিতার্থের বাসনা জেগেছিল ? মূলে দায়ভাগ তো তাদেরই।

দেশে যে আইন কানুন আছে, আমরা সেকথা তাদের শেখানোর আগে পর্যন্ত সে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের দু' ধরনের সুবিধে হল। লড়াই করে যে সব সুখ-সুবিধা তারা আদায় করল, তার ফলে আর্থিক দিক থেকেও উপকৃত হল, আর সরকার ও জমিদার চক্রের যৌথ আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা যে রাজনৈতিক সচেতনতার অধিকারী হল, তারও মূল্য অনেক। রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন বোধশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠল। ১৯৫৫ সালের নির্বাচনের সময়, যাদের বয়সের বিচারে ভোটদানের অধিকার পাওয়া উচিত, তাদের সবাইকে সেই অধিকার দেওয়া হল না। তাসত্ত্বেও, সরকারী এই নিয়মের প্রতিবাদের চেষ্টায় শত শত আদিবাসী নির্বাচনের আগের দিন ভোট কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়ে তাবু গেড়ে বসল। সকলের সমান অধিকার নেই, সকলের যে ভোটাধিকার নেই, এই ধরনের আইন-কানুনের জন্য তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। আমরা যে সব সভা-সমিতি করতাম তার থেকে ও তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তারা তাদের রাজনীতির পাঠ নিয়েছিল। সামনে রয়েছে দুটি পতাকা, দুটো রাজনৈতিক দল। চিন্তা সমুদ্রে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হল, বুদ্ধি বিবেচনার ক্ষেত্রে একটা তীব্র অনুসন্ধিৎসা-বোধ জেগে উঠল।

"দিদিমণি রাশিয়া কে ?"

কোন গ্রামে কারুর বাড়িতে রাত্রি যাপন করার সময়, সেই গ্রামের এবং আশপাশের আরও গ্রাম থেকে নেতৃস্থানীয় আদিবাসীরা সেই রাত্রিতে ঐ বাড়িতে এসে জমায়েত হত। এসে বিড়ি-টিড়ি ধরিয়ে গল্পের আসর জমাত। এইরকম এক রাত্রিতে কয়েকজন সামনের দিকে এগিয়ে এল—চোখে মুখে একটা বিরাট কৌতূহলের ছাপ, একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তাদের জিজ্ঞাস্য রয়েছে! নীচু গলায়, একান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে বলল "আচ্ছা দিদিমণি, সত্যি সত্যি বেশ খোলসা করে বলুন তো, রাশিয়া লোকটা কে ? উনি কি আপনাকে পয়সা কড়ি দেন ?" প্রশ্নটা শুনে, বেশ কৌতুক বোধ করলাম। প্রচণ্ড কৌতূহল তাদের, কে এই রাশিয়া ? ভদ্রলোক নাকি তাদের দিদিমণিকে টাকা-পয়সা দেন! জিগ্যেস করলাম তাদের, "কে বলল তোমাদের, এ কথা" ? উত্তরে বলল, "বিশে মাস্টার তো এই কথাই বলে। ঐ জমিদাররাও ঐ রকম বলে।" তারা বলে, "আরে, লালঝাণ্ডা তো আমাদের নয় ; ওতো রাশিয়ার !

তোদের দিদি তো রাশিয়া থেকে মাল-কড়ি পায়, তবে তোদের কিন্তু একটা কাণা-কড়িও ঠেকায় না, সব নিজে হজম করে ফেলে।" উত্তরটা শুনে একটা সূত্র খুঁজে পেলাম, তাদের মনের মধ্যে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া কেন হচ্ছে ?

তখন সবিস্তারে সব বললাম, রাশিয়া কি, কোথায় কিভাবে সেখানকার শ্রমিক-কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষণের অবসান ঘটিয়েছে ; শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সরকার কায়েম করেছে। কিভাবে সেখানে আদিবাসীদের মতো গরিব মজুর, কৃষকদের নিয়ে তাদের দেশকে, জাতিকে রক্ষা করার জন্য এক অজেয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছে ; শ্রমিকশ্রেণীর প্রচন্ড শক্তি এবং এই ধরনের আরও অনেক কথা খুব সহজতম ভাষায় ব্যাখ্যা করলাম। যখন আমি এই সব কথা বলছি, অখন্ড মনোযোগ নিয়ে তারা যেন প্রতিটি শব্দ গিলতে লাগল। আমি যা বলছি, তার প্রতিটি জিনিস সঠিক বোঝার জন্য খুব মন দিয়ে শুনল। এই ভাবে, গভীর রাত্রির নিঃশব্দ প্রহরগুলিতে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তারা আমায় জ্বালিয়ে মারত। তাদের সহজবোধ্য ভাষায় এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মনটা যেন গোলকধাঁধায় পাক খেয়ে মরত। একেবারে ভোর পর্যন্ত চলত এই ধরনের আলাপ-আলোচনা। যখন ভোরের ঠান্ডা বাতাস খেলে যেত পরিশ্রান্ত দেহ মনের উপর, আমি বলতাম, "এবার আমি ঘুমাই, কাল সকালে আবার অনেক কাজ, সব সারতে হবে। আমিও ঘুমাই, আর তোমরাও এবার শুয়ে পড়, কেমন"। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই, খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তাম। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়ত। আবার কেউ কেউ সকাল পর্যন্ত গল্প চালিয়ে যেত। উম্বরগাঁও, দহানু, পালঘর, জওহর এবং অন্যান্য তালুকের গ্রামে গ্রামে এইভাবে আদিবাসীদের সাথে কত যে কথাবার্তা হত, তার আর ইয়ত্তা নেই। তাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের মধ্যে বসে বসে, তাদের শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টায় এমন কত অসংখ্য বিনিদ্র রজনী পার হয়ে গেছে।

আমাদের প্রতিপক্ষরা, অনবধানতাবশত প্রায়ই আমাদের প্রচারকার্যে পরোক্ষভাবে সাহায্য করত। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে হয়তো তারা আদিবাসীদের কিছু বলল। এতে তারা প্ররোচিত হয়ে, তারা যা শুনেছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কাছে প্রশ্ন রাখত। আমরাও তাদের সন্দেহ-নিরসনের জন্য যেন খুশী মনেই সব কথার উত্তর দিতাম। এই ভাবে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সংগে তারা ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠল, তাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পেল। একদিন রাত্রে, এই রকম বৈঠক চলছে, আদিবাসীরা একটা প্রশ্ন করল আমায়। প্রশ্নটার মধ্য দিয়ে বোঝা গেল তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জানার আগ্রহের উদ্যমান। কিসান-সভা ছিল

করেছে—বোম্বাই বিধানসভা অভিমুখে একটা প্রতিবাদ-অভিযান সংগঠিত করবে। উদ্দেশ্য খাজনার হার কমানোর জন্য তাদের যে দাবি, তার জন্য চাপ-সৃষ্টি করা। এই অভিযানে মোটামুটি পঁচিশ হাজার আদিবাসীকে মিছিলের সামিল করা হবে—এই ছিল আমাদের পরিকল্পনা। এই নিয়ে এক বৈঠকে আলোচনা করছি, এমন সময় বেশ উন্নত মানের পাঁচ-ছ'জন ওয়ারলি আমকে জিগ্যেস করল, "আচ্ছা, আমরা তো মাঝপথে থামতে থামতে পায়ে হেঁটে বোম্বাই চলেছি। সেখান থেকে রাশিয়া কতদূর হবে? আচ্ছা, বোম্বাই থেকে আমরা রাশিয়া যেতে পারি না?" বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই এরা অনেক দিন ধরেই নিজেদের মধ্যে বোম্বাই থেকে রাশিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। রাশিয়া এভাবে যাওয়া যায় না শুনেই তারা তো ভীষণ মুষড়ে পড়ল। এরপর থেকে, যখনই আদিবাসীদের সংগে আমার দেখা সাক্ষাৎ হত, তখনই তারা অনুরোধ করত, "বলুন দিদি বলুন, রাশিয়া সম্বন্ধে সব কথা আমাদের বলুন।"

আদিবাসীদের রাজনৈতিক চেতনার মান যে কি রকম পরিপক্কতা লাভ করেছিল, তা একটা ঘটনা থেকে বেশ সহজেই অনুমান করা যায়। ঘটনাটা ঘটেছিল জেলের মধ্যে। থানা, নাসিক, ইয়েরাওয়াড়া, বিশাপুর প্রভৃতি জেলে শত শত আদিবাসী তখন বন্দী। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা উৎসব। সমস্ত বন্দীদের খুশী হয়ে সুজির হালুয়া দিয়ে ভোজ দেওয়ার ব্যবস্থা হল। বন্দীরা তখন এক প্রচন্ড আত্মাভিমান বোধের পরিচয় দিল। কেউ তারা 'হালুয়া-উৎসবে' অংশগ্রহণ করল না। বাধ্য হয়ে জেল-কর্তৃপক্ষ তাদের অংশের হালুয়া জেলের পশু-পক্ষীগুলোকে খাওয়াল। ১৯৫১ সালে, থানা জেলের জনৈক অফিসারের কাছ থেকে আমি এই ঘটনা শুনেছিলাম। জেল অফিসাররা নানারকমভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। আদিবাসীদের হৃদয় পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। তারা বলেছিল, "আমরা তো চোর, ডাকাত, গুন্ডা, বদমাইস নই"। সত্যিই তো! ন্যায়-বিচারের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে সরকার তাদের বন্দী করেছে। তাদের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হালুয়ার প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না। পরে এরাই একবার মুক্তিলাভের জন্য অনশন-ধর্মঘট চালিয়ে ছিল। সরকারকে বেশ ফাঁপরে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু নানারকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পড়ে শেষ পর্যন্ত তারা অনশন ভঙ্গ করেছিল।

অনেক পরে, এই অনশন ধর্মঘটের কথা আমি শুনেছিলাম। হয়তো এটা আমাকে বলার মতো তেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনেই করেনি তারা।

আমি যখন এ সম্বন্ধে তাদের প্রশ্ন করেছিলাম, তারা বলল, "বিনা কারণে ওরা আমাদের বন্দী করে রেখেছিল। তাই আমরাও ঠিক করলাম—লড়াই করবো। লড়াই না করা ছাড়া উপায় ছিল না, তাই করেছিলাম। তা না হলে—সরকার আমাদের মুক্তি দিত বলে আপনি মনে করেন ?"

পরিবর্তন এল তাদের বাইরের জীবনেও

আগেকার দিনগুলিতে, এই আদিবাসীরাই জমিদার প্রভুদের সামনে সব সময়ে মাথা নত করে থাকত, ঠিক যেমন মেষশাবকগুলো এগিয়ে যায় বিনাপ্রতিবাদে তাদের ঘাতকের দিকে, প্রতিবাদ করার মতো শক্তি আর বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না তাদের মধ্যে। কিন্তু অনশন-ধর্মঘটের কথা কে শেখালো তাদের, এই সব অরণ্যবাসীরা কোথা থেকে সংগ্রহ করল তাদের এই রাজনৈতিক জ্ঞান ? তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাই তাদের জাগরণের বাণী শুনিয়েছে। তাদের শিশুসুলভ চেতনাই হঠাৎ পরিপক্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে উন্নীত হল—যখন বহু কষ্ট করে তাদের রাজনীতিগত ভাবে শিক্ষিত করে তোলা হল। একলাফে তারা অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে উঠে এল উপরে, অনেক পিছনে ফেলে রেখে এল সেই সব কৃষককে, যারা নাকি নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে অনেক উন্নত বলে দাবি করে থাকে।

লড়াই করে যে সব দাবিগুলো তারা জয় করে আনল তারই কল্যাণে তাদের আর্থিক অবস্থাও কিছুটা ভালোর দিকে এগুলো। অনুরূপভাবে তাদের সামাজিক জীবনেও এল একটা পরিবর্তন, ভিতরে-বাইরে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হল। জেল থেকে যে সব আদিবাসীরা মুক্তি পেয়ে ফিরে এল, তাদেরই মধ্যে পরিবর্তনটা দেখা গেল সবচেয়ে বেশী করে। তারা একটা নবজাগ্রত স্বাভিমানবোধে জ্বলজ্বল করতে লাগল।

তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনটাও বদলে গেল। অধিকাংশই কেটে ফেলল লম্বা লম্বা জট-পাকানো চুল, সাধারণ মাপে চুল রাখতে লাগল। বৃদ্ধ-যুবক-সকলেই লাংগোটি পরা ছেড়ে দিল। তার পরিবর্তে এল হাফ-প্যান্ট, সার্ট আর জ্যাকেট বা ফতুয়া। কেউ কেউ আবার ফুলপ্যান্ট বা পাজামাও পরতে লাগল। মেয়েদের পরিধেয় হিসেবে এল সঠিক মাপের শাড়ি। ঘরকন্নার জন্য মাঝে মধ্যে সুন্দর দেখে কলসীও দু'একটা কিনতে লাগল পয়সা খরচ করে। পিতল কাঁসার আবির্ভাবও ঘটল, এল চীনে মাটির কাপ, প্লেট, রেকাবি। আবার কোথাও কোথাও নারকেলের মালার হাতার পরিবর্তে এল চামচ।

নিজেদের নিরক্ষরতার জন্যই খুব বেশি লজ্জা পেত তারা। বড্ড আফশোষ ছিল তাদের। রাজনৈতিক জ্ঞান আহরণের পিপাসা-তাদের ক্রমেই

বাড়তে লাগল। আমরা যা বলতাম তার প্রতিটি কথাই হৃদয় দিয়ে বোঝার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। এত অসংখ্য জিনিস তাদের জানার, লেখার মতো ছিল যে তার মধ্যে তারা খেই হারিয়ে ফেলত, কোন হদিশ খুঁজে পেত না। যেখানেই তারা যেত, সর্বত্রই চোখ-কান খোলা রেখে চলত। নিজেদের সম্মান দিতে শিখেছিল তারা, আত্মমর্যাদার সংগে তারা জীবন-যাপন করতে লাগল। মাছকে জল থেকে তুলে আনলে যেমন উলটে পালটে আছড়ে পড়তে থাকে, ঠিক সেই রকম গভীর খাদ ও পাহাড়ী-উপত্যকার পরিবেশ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আদিবাসীরাও মনে মনে খুব কষ্ট পেতে লাগল। যারা কোনদিন তেলের ব্যবহার জানত না, খাদ্যের সংগে কোনদিন যারা দুধ, ঘি মাখনের আস্বাদ পায়নি, যারা জীবনে কোনদিন লালঝাণ্ডার নামও শোনেনি, তারাই এমনভাবে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল যে, লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে সারা দুনিয়ার রাজনীতি বোঝার আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠল।

নিজেদের এই পরিবর্তনের কাহিনী তারা অকপটেই স্বীকার করত। নিঃসংকোচে বলত, "দিদিমণি, একবার স্মরণ করুন তো সেই সেদিনের কথাগুলো, আমরা কী ছিলাম, কী নিয়ে থাকতাম? সেই জমিদার-মহাজন, তাদের প্রহার, ধার-দেনা, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ আর ক্ষেতের কাজ ছাড়া কিছুই জানতাম না আমরা। বাইরের দুনিয়াটা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আর আজ? এখন আমরা কমিউনিস্ট পার্টি, লালঝাণ্ডার সভা-সমিতি, পার্টির সভা-সমিতি, কংগ্রেস কি করেছে আর লাল ঝাণ্ডা কি করেছে, কংগ্রেসের কোন্ নেতা কি কি বলল, আর আমাদের নেতারা কি বলল, কেন আমি গরীব, কেনই বা আমাকে উপবাসে মরতে হয়, কী করা উচিত, কীভাবে আমাদের কাজের অগ্রগতি হবে—এই রকম কত বিষয় নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলি, আলাপ-আলোচনা করি। আমাদের যখন শিক্ষণ-ক্লাস হবে—সাধারণ মানুষকে কী বলব আমরা—এসবও আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমরা যখন শহরে যাই, দোকানদারেরা আর শেঠ মহাজনেরা আমাদের আসুন বসুন বলে আহ্বান জানায়। কত খাতির করে! কত খবর শোনায়, বলে রাশিয়ার কথা, চীনের কথা, আমেরিকার কথা। আজ মনে হয়, আমাদের সামনে পৃথিবীর দুয়ারটা যেন খুলে গেছে

চতুর্দশ অধ্যায়

আজকের আদিবাসী

নিজেদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য ও মজুরি বৃদ্ধির জন্য অনেক সংগ্রাম আদিবাসীদের করতে হয়েছিল। ফলে আগেকার তুলনায় আজ তাদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল। কিন্তু এটা ধারণা করা নিশ্চয়ই ভুল হবে যে, আর তাদের অনশনে-অর্ধাশনে মরতে হয় না। অবস্থার এমন কিছুই পরিবর্তন হয়নি যে তাদের আর গাছের শিকড় বা লতা-পাতা খেতে হয় না। আজও তাই করতে হয়, বছরের চারটে মাস অর্ধভুক্ত অবস্থায় কাটাতে হয়। খাদ্যের অভাবে তারা এখনও সত্যিই মাঝে মাঝে একেবারে পুরো উপবাসে কাটাতে বাধ্য হয়।

মূল সমস্যা হচ্ছে জমি। এটাই তাদের কষ্টের কারণ। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত, তাদের অবস্থার তেমন পরিবর্তন কখনও হতে পারে না। প্রজাস্বত্ব আইন চালু হওয়ার পর, চাষের জন্য যে জমি তাদের দেওয়া হয়েছিল, তার দরুন প্রদেয় খাজনা কিছুটা কমেছিল। কোন কোন আদিবাসী কিস্তিবন্দী করে জমির দাম শোধ করতে পেরেছিল। খাজনা তখন আর লাগত না। কারণ তাতে তারা জমির মালিকরূপে গণ্য হত। কিন্তু আদিবাসীদের অধিকৃত সম্পূর্ণ জমির পরিমাণ এতই কম যে, সেই জমির উৎপন্ন ফসলের দ্বারা নিজেদের পরিবারবর্গের উদরপূর্তি একেবারেই অসম্ভব।

আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি যদি করতে হয়, তাহলে অন্যতম কাজ হচ্ছে জমিদারদের অধিকার থেকে জমি সব নিয়ে নিতে হবে, তারপর সেগুলো তাদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। প্রজাস্বত্ব আইনে "নিজ-চাষ-ভুক্ত" জমির সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, যে সব জমি জমিদার কৃষি-মজুর দিয়ে চাষ করায়—তাকেও এই সংজ্ঞার আওতার মধ্যে ধরা হবে। আইনে 'নিজ-চাষের' এইরকম ব্যাখ্যা থাকার ফলে জমিদার-মহাজনের দল হাজার হাজার একর জমি দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছে। বহু জমিদার শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কাজ-কর্ম করে এবং গ্রামে মজুর দিয়ে চাষ-বাস করায়। বাস্তবিকপক্ষে সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য জমির উৎপাদন কিন্তু ওদের কাছে মোটেই অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। জমিতে যাদের কোনদিন পা

পা পড়ে না, জমির মালিকানা তাদের রাখতে দেওয়াটা এক ধরনের অযৌক্তিক ব্যাপার। একেবারে প্রকৃত অর্থে সত্যি সত্যিই, যারা নিজেরা পরিবারবর্গের সাহায্যে জমি চাষ করে, তাদেরকে মাত্র তাদের জীবনধারণের জন্য যতটা জমি প্রয়োজন ততটা রাখতে দেওয়া উচিত। বাকিটা বিনামূল্যে আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ হওয়া উচিত। এই হচ্ছে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটা প্রধান পন্থা। বিগত দশ বছরে, ঐ সব এলাকায় ফলের ও ফুলের বাগান দ্রুতগতিতে বেড়েছে। আদিবাসীরা যে সামান্য পরিমাণ জমি পেয়েছিল, তার ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করা একেবারে অসম্ভব। আর ফলের ও ফুলের ব্যবসা করতে গেলে যে মূলধন প্রয়োজন তাও তাদের নেই। তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, জমির বাজার-মূল্য যাই হোক না কেন, একরপিছু পাঁচ-সাতশ' টাকা দিয়ে তাদের ব জমি ঐ ফলের বাগিচাওয়ালারা কিনে নিয়েছে। নামমাত্র জমি যতটুকু ছিল —তা দিয়ে যখন পেট ভরছিল না, তখন তারাও হতাশ হয়ে পড়েছিল। একটু বেশি না থাকলে তো বাঁচা যায় না। তাই সেই অসম্ভবের সংগে নিরন্তর সংগ্রামের পরিবর্তে, জমির বিনিময়ে একসংগে পাঁচ-সাতশ' টাকার লোভ তারা সামলে উঠতে পারল না। এইভাবে জমির বাজার-দামের কথা নিয়ে একটুও খোঁজখবর না নিয়েই ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা না করে অধিকাংশ গরিব কৃষক ভূমিহারা হয়ে গিয়েছে। ভূস্বামীদের মধু-মাখা বচনামৃত এবং একসঙ্গে একগোছা টাকার তাৎক্ষণিক লোভ—উভয়েরই শিকার হয়েছিল তারা। ভূমিহীন হয়ে পড়ে তারা ক্ষেতমজুরে পরিণত হল। এই ধরনের সমস্যার হাত থেকে মুক্তির পথ হচ্ছে—আদিবাসীদের জমি, যারা আদিবাসী নয়, তারা যাতে কিনতে না পারে, তার আইনগত ব্যবস্থা ক আদিবাসীদের জমি রক্ষা করা।

আদিবাসীদের জীবনের মানোন্নয়নের আর একটি পথ হচ্ছে—ঐসব এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ-শিল্প-স্থাপন করে তাতে তাদের নিয়োগ করা। কারণ, বাঁচার মতো যথেষ্ট জমি তাদের হাতে নেই, আর এলাকায় কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানও নেই। ফলে কাজ পাওয়ার মতো কোন সুযোগও সেখানে থাকে না। তাই একান্ত বাধ্য হয়ে শুধু উদর-পূর্তির জন্য যা পাওয়া যায় তারই সন্ধানে তারা বাইরে পরের জমিতে ক্ষেত-মজুরি করতে যায়। কিন্তু সারা বছর তো কৃষি-কাজ পাওয়া যায় না। আবার যতটুকু পাওয়া যায় সেই মরসুমী কাজের মজুরিও খুবই কম। তুলনামূলক বিচারে ঘাস-কাটার মজুরি বরং অন্যান্য কাজের থেকে একটু বেশি কিন্তু সে কাজের পরমায়ুও তো বড়জোর দু মাস। সেখানে মজুরির হারটা ভাল, তার কারণ, কাজটা

সেখানে অন্য ধরনের, আর আদিবাসীরাও জোটবদ্ধ। প্রতি বছর, সরকার ঘাস কাটাই-এর জন্য ব্যবসায়ী, ঘাস জমির মালিক, কিসান-সভার প্রতিনিধি ও অন্যান্য দলের সংগে আলাপ-আলোচনা করে মজুরির হার ঠিক করে দেয়। কিন্তু যেহেতু সেখানে এই হার কার্যকরী করার জন্য আইনগত কোন বিধি-ব্যবস্থা নেই, তাই জমিদারও প্রতিবছরই সরকার অনুমোদিত মজুরির হার উপেক্ষা করে কম মজুরি দেওয়ার চেষ্টা করে। আর তার ফলে গোলমাল, বাদ-বিসংবাদ চলতেই থাকে। সেই জন্য একে রুখতে গেলে সরকার পক্ষের উচিত—নির্ধারিত হার কার্যকরী করার জন্য আইন-প্রণয়ন করা।

এই অনুমোদিত মজুরি ফাঁকি দেওয়ার জন্য জমিদাররা আজকাল একটা নতুন পথ আবিষ্কার করেছে। আদিবাসীর উৎপন্ন ফসলের সঞ্চয়টুকু কয়েক-দিনের মধ্যেই যখন শেষ হয়ে যায়, তখন খাদ্য-সংগ্রহের জন্য টাকার দরকার হয়ে পড়ে। জমিদার বাবুরা তখন তাদের কিছু কিছু টাকা ধার দেয়। তাও সামান্যই, ঐ বড় জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা। তবে শর্ত হচ্ছে জমিদাররা যা বলবে সেই হারে ঘাস কেটে দিতে হবে। এইভাবে, সরকার যে হারই ঠিক করে দিক না কেন, ঘাস কাটার সময় এলেই ভূস্বামীরা আদিবাসীদের স্মরণ করিয়ে দেয়—"আমি তোদের দাদন দিয়ে রেখেছি। কাজেই প্রতিশ্রুতি মতো, আমার ঘাস কাটতেই হবে"। ওই রকম ব্যবস্থার মাধ্যমে, বেশ কম মজুরি দিয়েই কাটাই-এর কাজ করিয়ে নেওয়া হয় আর পরিস্থিতির ফাঁদে পড়ে আদিবাসীরাও তখন প্রতিবাদের পথ খুঁজে পায় না।

দৈনিক রোজে কৃষি কাজও করা হয়। ন্যূনতম মজুরি আইনে সরকার যে মজুরির হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তা এত কম যে সে হারে কাজ করলে উপবাস ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য, যথো-পযুক্ত মজুরির হার নির্ধারণ করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য এবং সেই হার না দিলে সেটা আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত। ক্ষেত মজুরদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আয়ের সুযোগ এবং এইভাবে তাদের উপবাস-ক্লিষ্ট অবস্থার উন্নতির এই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

১৯৪৫ সালে ফল-ফুলের বাগানে কাজের জন্য মজুরদের মজুরি দেওয়া হত দৈনিক দু টাকা চার আনা করে। এখন দেওয়া হয় দৈনিক দু টাকা থেকে আড়াই টাকার মতো। তাদের যে ধরনের কাজ করতে হয় এবং তাদের যা প্রয়োজন তার তুলনায় তা খুবই কম। সারা বছরের জন্য মুষ্টিমেয় যে কজনকে কাছে লাগানো হয়, তারা ছাড়া অন্যান্যদের কাছে বাগানের কাজটা সরকারী কাজের মধ্যেই পড়ে।

আর এক ধরনের মরসুমী কাজ হচ্ছে জংগল কাটাই। বড়জোর পনের

থেকে একুশ দিন পর্যন্ত চলে এই কাজ। খুব কঠিন কাজ। ১৯৪৫ সালে, এই কাজের জন্য দৈনিক মজুরি ছিল খুব জোর চার থেকে আট আনা। তারা মজুরি বাড়ানোর জন্য লড়াই করেছিল। হরতাল চলেছিল। তার ফলে এক টাকা চার আনা পর্যন্ত উঠল। বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে দশগুণ। কিন্তু মজুরি তিন গুণের বেশী বাড়েনি। বেশীর ভাগ গাছ কাটাই-এর কাজ এখন সমবায় সংস্থার মাধ্যমে হয়। সংস্থাগুলো দৈনিক বার আনা থেকে আরম্ভ করে আড়াই টাকা পর্যন্ত মজুরি দেয়। আদিবাসীদের যেখানে শক্ত সংগঠন আছে, যাদের চেতনার মান একটু উন্নত, যারা সব সময় সজাগ-সতর্ক থাকে, সেখানেই মাত্র বেশী মজুরি দাবি করলে তা দেওয়া হয়। অন্য সব ক্ষেত্রে বার আনা, বড় জোর এক টাকা দিয়েই ভাগিয়ে দেওয়া হয়। অধিকাংশ জঙ্গল ঠিকাদার এবং সংস্থাই দৈনিক মজুরির থেকেও ঠিকা ভিত্তিতে মজুর লাগাতে বেশি পছন্দ করে।

এই ধরনের দু-এক মাসের মরসুমী কাজের যৎসামান্য উপায়ের মাধ্যমে কী ভাবেই বা আদিবাসীদের আর্থিক অবস্থায় পরিবর্তন আসতে পারে? চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন এতে হতে পারে না। আগেকার অবস্থা আর বর্তমানের অবস্থার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আগে বছরে আট-দশ মাস অনশনে-অর্ধাশনে কাটাতে হত, এখন কাটাতে হয় চার থেকে ছ-মাস। যতদিন না আদিবাসীদের বিনামূল্যে জমি দেওয়া হয় এবং চাষের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়, যতদিন সেখানে শিল্প কারখানা গড়ে না ওঠে এবং সেখান থেকে তারা বাঁচার মতো সংস্থান করতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তাদের আর্থিক অবস্থায় কোন রকম উন্নতি সম্ভব নয়।

পূর্বাপর ধারা অনুযায়ী আদিবাসীদের মধ্যে নাচ, শিকার ও মদ্যপানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। দেওয়ালীর কাছাকাছি সময়ে যখন মাঠ ভরা ধান শুধু কাটার অপেক্ষায়, সেই সময় নাচের খুব ধুম পড়ে যায়। পাড়ায় পাড়ায় আদিবাসী নারী-পুরুষ একসংগে জমায়েত হয়ে নাচ শুরু করে দেয়। দহানু থেকে ষোল-সতের মাইল দূরে মহালক্ষ্মী গ্রাম। সেখানে দেওয়ালীর কিছু আগে, মন্দিরে দেবীর সামনে পবিত্র আগুন জ্বালানো হয়। এই উৎসবের সময় সেখানে ছোট খাট একটা মেলাও বসে। মন্দিরের প্রাংগণে শত শত যুবক যুবতী এসে হাজির হয়, তারপর নাচতে নাচতে আত্মহারা হয়ে যায়। এই উৎসব অনুষ্ঠানের সময় অনেক যুবক-যুবতী তাদের জীবন-সাথী বেছে নেয়।

শত শত আদিবাসী মাদল [Tarpa] বাজিয়ে নাচতে নাচতে, তাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে, রেল লাইনের ধারে ধারে শহর গুলোতে এসে হাজির

হয়। দেওয়ালী উৎসব উপলক্ষ্যে নতুন কাপড়, অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস কেনার জন্য আসে তারা। শহরের দোকানগুলো তাদের ভিড়ে বেশ জমে ওঠে।

টকটকে লাল, সবুজ বা নীল রং এর শাড়ি পরে, হলুদে গাঁদা বা অন্য কোন রঙীন ফুলের মালা খোঁপায় জড়িয়ে মাদলের তালে তালে, ঘুঙুরের ছন্দে ছন্দে রাতের পর রাত ধরে মেয়েরা ছেলেদের সংগে নাচের আসর বসায়। অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর সেই দৃশ্য। এক ফালি চাঁদের মতো এক পাশে ছেলেরা অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়ায়, আর এক পাশে অনুরূপভাবে মেয়েরা। মাঝখানে দাঁড়ায় যে মাদল বাজায় আর যে ঘুঙুর বাজায়। তারপর পাশাপাশি একে অপরের হাতের নিচু দিয়ে পরস্পর পিঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করতে থাকে, বাজনার ইংগিত পাওয়ার সংগে সংগেই নাচ শুরু করে। নাচের মধ্যে দেখার মতো বৈচিত্র্য তেমন কিছুই নেই। বরং অনেকক্ষণ ধরে দেখলে নাচের একঘেয়েমিতে দর্শকবৃন্দের ক্লান্তি বা বিরক্তি আসার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু যারা দেখে, এতো তাদের জন্য নয়, যারা নাচে তাদের নিজেদের জন্যেই। নাচতে নাচতে তারা এক ধরনের তুরীয় অবস্থার মধ্যে হারিয়ে যায়।

অভিজাত শ্রেণী বা যারা উপজাতি শ্রেণীভুক্ত নয়, তারা যেমন রাম-সীতা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী শংকর-পার্বতী, গণেশ প্রভৃতি দেবতার পূজা করে, আদিবাসীরা কিন্তু ঐ সব দেব-দেবীর পূজো করে না। এদের প্রতি তাদের আস্থা বা বিশ্বাস নেই, তাদের দেবতা হচ্ছে নারায়ণ। আর দেবী হচ্ছে দু ইঞ্চি লম্বা আর দু ইঞ্চি চওড়া পিতলের উপর খোদাই করা একটা ছোট্ট মূর্তি [Tak]। আবার কয়েক গুচ্ছ ময়ূর পালক এক সংগে বেঁধে তাকেও দেবতার প্রতীক বলে মেনে নেয়। তার নাম 'হিরাওয়া' [Hirava]। একটা ঝুড়ির চারপাশে গোবর দিয়ে ভাল করে লেপে, তাতে ধান দিয়ে ভর্তি করে, তার উপর দেবতাকে আসনস্থ করে। দেওয়াল বা কোন খুঁটি থেকে ঝুলিয়ে দেয় সেই ঝুড়ির সিংহাসন। সব আদিবাসীর বাড়িতে এই সব অধিষ্ঠান নেই, শুধু বংশ পরম্পরায় যাদের বাড়িতে রয়েছে, তারাই বাড়িতে দেব-দেবীর মূর্তি রাখে। বাড়িতে কারুর কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ইচ্ছা হলে এই রকম কোন বাড়ি থেকে দেবতাকে নিয়ে যায়, তারপর উৎসব-শেষ হলে আবার যথাস্থানে রেখে আসে।

যখন ফসল কাটার সময় হয়, তখন সেগুলো এক জায়গায় জমা করে গাদা দেয়। তারপর একটা মুরগীর ছানা বলি দিয়ে ভোগ দেয়। নতুন উৎপন্ন শাক্-সব্জী, লাউ-কুমড়ো ও নতুন চালের ভাত সেই দিন থেকে খাওয়া শুরু করে। মটর, শিম, বরবটি প্রভৃতি নতুন ফসল তুলে এনে এক জায়গায়

রাশিকৃত করে, তার সামনে জেবলে দেয় তেলের প্রদীপ এবং 'ভগত' (Bhagat) তার পুজো করে। বিবাহ-অনুষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য সব আচার অনুষ্ঠানে ভগতের প্রয়োজন পড়ে, তাকে ডেকে আনা হয়। পুজোর সময় কী যে সে বলে বোঝা যায় না। শুধু দেখা যায়, মূর্চ্ছাগ্রস্তের মতো সব সময় কাঁপতে কাঁপতে সামনে পিছনে হেলছে দুলছে। ওয়ারলিদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন করায় মেয়েরা। এই উৎসবে তারা বিবাহ সংগীতও পরিবেশন করে। তাদের বলা হয় "ধবলেরী" [Dhawleris]। আদিবাসীদের রীতি-রেওয়াজ ও প্রথা-প্রকরণ সম্বন্ধে অনেকেই বিস্তারিত ভাবে নানা জিনিস লিখেছেন, কাজেই এখানে আরও বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক।

১৯৪৫ সালে প্রথম যখন ঐ জেলায় গিয়েছিলাম, তখন দেখেছি আদিবাসীরা খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ভূত-প্রেতে দারুণ বিশ্বাস। ভূতের রাজা 'বেতাল' কে খুশী করার জন্য তার পুজো করে মেয়েরা। এই বিশেষ মেয়েদের বলা হয় "ভূতালী"। এও প্রবাদ আছে যে, ভূতালী দেবতার ভোগের জন্য 'নরবলি' পর্যন্ত দিত। গ্রামে যখন কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব হত, লোকে তখন ধারণা করত যে, এর জন্য 'ভূতালী'ই দায়ী, এটাই তাদের অন্ধ বিশ্বাস। এর ফলে সমস্ত গ্রাম জুড়ে ডাইনী খ‍ুঁজে বেড়ানো হত। ডাইনী খ‍ুঁজতে গিয়ে মেয়েদের ধরে ধরে মারধোর করা হত। এইভাবে যখন ভূতালী-ডাইনীর সন্ধান মিলত, তখন তাকে প্রচণ্ড মারধোর করার পর হত্যা করা হত। আরও নানারকম অদ্ভুত ধরনের অন্ধ বিশ্বাস ছিল তাদের। কোথায় যেন এক পৌরাণিক লতা আছে। তার পাতাগুলো সব নাকি কালো রং-এর। ওয়ারলিরা একে বলত 'কালী মোহা' (কালী মোহিনী) বা 'কৃষ্ণ-মোহিনী'। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কেউ যদি কোনদিন ঐ কালী মোহিনীর সন্ধান পায়, আর তার একটা কালো পাতা যদি সংগে আনতে পারে, তাহলে টাকার বন্যা বয়ে যাবে। অনেককেই এমন দেখেছি, যারা আর কিছু করে না, শুধু লতার সন্ধানে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। অথচ যাকেই জিগ্যেস করেছি—'তোমরা কেউ সেই লতা দেখেছো' ? কেউ আর হ্যাঁ বলতে পারেনি। তবুও কিন্তু লোক পরম্পরায় ঐ কাহিনী এখনো চলে আসছে। আর একটা অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল যে, এক ধরনের গাছ আছে, তার পাতা যদি কেউ মুখের মধ্যে পুরে মুখেই রেখে দেয়, তাহলে তার প্রতিপক্ষ নাকি মতিভ্রষ্ট হয়ে, সব কিছু ভুলে গিয়ে আর কোন কথাই খ‍ুঁজে পাবে না। এই অন্ধ বিশ্বাসেই অনেক আদিবাসীকে দেখেছি—আদালতে আসার সময় মুখের মধ্যে পাতা নিয়ে এসেছে।

বিগত বিশ বছর ধরে, আমাদের সতত প্রয়াসের ফলে 'ডাইনী প্রথা' বর্তমানে অবলুপ্তির পথে। ডাইনী হওয়ার সূত্রে মেয়েদের যেভাবে খুব ঠাণ্ডা মাথায় অমানুষিক ভাবে হত্যা করা হত, এখন আর তেমন হয় না। ডাইনী-হত্যার ঘটনায় অংশ নেওয়ার জন্য, একবার এক পার্টি সদস্যকে পার্টি থেকে কিছুদিনের জন্য আমাদের বহিষ্কৃত করতে হয়েছিল। তার পর থেকে কোন পার্টি সদস্য এ ধরনের ডাইনী-হত্যার ঘটনায় অংশ-গ্রহণে সাহসী হয়নি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত, এই বীভৎস প্রথা যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে এমন দাবি আমরা করতে পারি না। এখনো কিছু কিছু ঘটনা দেখা যায়, যেখানে শুধু ডাইনী হওয়ার সন্দেহে মেয়েদের হত্যা করা হয়েছে। অবশ্য তেমন ঘটনা খুবই সীমিত।

প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ আদিবাসী এখন অসুখ বিসুখ হলে ওষুধ খায়। কলেরা, বসন্ত দেখা দিলে তারা সাবধানতা অবলম্বনের জন্য প্রতি-ষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অনেকেই অসুখ করলে ওষুধ খাওয়ার পক্ষপাতী এখন। 'কৃষ্ণ মোহিনী' প্রভৃতি প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস বর্তমানে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। 'ভগত্' প্রভৃতির বিশ্বাসও এখন কমে এসেছে।

ভগবান বা ভূতপ্রেত কোন কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস নেই—এ কথা যখন আমরা বেশ জোরের সংগেই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতাম, তখন প্রথম প্রথম আদিবাসীরা তাতে বিস্মিত হত। খট্‌কা লাগতো তাদের মনে। কিন্তু ধীরে ধীরে তার প্রভাব পড়তে লাগল তাদের উপর। অন্ধ বিশ্বাস আর যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত কুসংস্কারগুলি ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগল। এর জন্য প্রধানত কৃতিত্ব হচ্ছে আমাদের সেই সমস্ত আদিবাসী কর্মী ও সংগঠকদের যারা আমাদেরই মতো এই সব অকপট বিশ্বাসগুলির বিরুদ্ধে নিরলসভাবে প্রচার চালিয়ে যেত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি কিন্তু এখনো ঘটেনি। ১৯৪৭ সালের পর, "বাম্রেকর যোজনা" অনুযায়ী যে সমস্ত ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘরে পাঠশালা তৈরি হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই এখন মেরামতির অভাবে ভগ্নপ্রায়। কয়েকটা ঘর জোড়াতালি দিয়ে সারানো হয়েছে, নতুনও কয়েকটা তৈরি হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞ গাঁয়ে এই পাঠশালাগুলো ভালভাবে চলে না। জঙ্গলের মধ্যে শিক্ষক মশাইরা থাকতেই চান না, প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা তাদের। কারণ ওখানে খবরের কাগজ পাওয়া যায় না, চায়ের জন্য দুধ পাওয়াও খুবই মুস্কিল ব্যাপার। সেখানে তাদের কুঁড়ে ঘরে থাকতে হবে অথবা কাজ চালানো গোছের অস্থায়ী কোন ব্যবস্থা করে, হয় পাঠশালারই একটা অংশ পৃথক করে ঘিরে নিয়ে অথবা পাঠশালার সংগে অস্থায়ী কোন চালা বানিয়ে থাকতে হয়। পরিবারবর্গকেও

সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না, কারণ সেখানে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার কোনরকম সুযোগ সুবিধা নেই। এই সব নানা কারণে সকলেই তারা শহরমুখী—সেখানেই কাজ পাওয়ার জন্য উন্মুখ। মাসের পর মাস ধরে তাই পাঠশালাগুলোও বন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। তার জন্য কারুরই কোন রকম মাথাব্যথা নেই। শিক্ষকদের কেউ ঐ সব গ্রামের স্কুলে বদলি হলে, সেটা এক ধরনের শাস্তি বলেই মনে করে। সেখান থেকে আবার অন্যত্র বদলি হয়ে ফিরে এলে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। তাই এই রকম পরিস্থিতিতে আদিবাসীদের গ্রামে কীভাবে শিক্ষার অগ্রগতি ঘটতে পারে? অবশ্য, যে কয়েকটা আবাসিক পাঠশালা আছে [আশ্রমশালা], সেখানে কিছুটা লেখা-পড়া হয়, কয়েকজন আদিবাসী থাকে সেখানে। কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই কম যে, এই ভাবে শম্বুক গতিতে এগুলে, একটা জাতির শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রভাবই পড়তে পারে না। আর এই সব পাঠশালায় শিক্ষার মানও এতই নিচু যে, যে সব ছেলেরা সপ্তম মান পর্যন্ত পড়াশুনো করে বেরিয়ে আসে—তারা সঠিক ভাবে মারাঠী অক্ষর বা ভাষায় লিখতেও পারে না।

সপ্তম মান পর্যন্ত পড়েছে, এমন কয়েকজনকে আমরা ছ'মাস ধরে প্রতিদিন লেখানো শিখিয়ে তাদের কিছুটা উন্নতি ঘটিয়েছিলাম। যারা স্কুলে পড়াশোনা করতে যায়, তারা অধিকাংশই শিক্ষাকে ছোটখাট একটা চাকরি-বাকরি পাওয়ার পথে পা-রাখার মতো একটা ধাপ বলেই ধরে নেয়। বনবিভাগের কোন চাকরি, যেমন 'বিটগার্ড,' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ওয়েল ফেয়ার অফিসার [গ্রাম-সেবক] প্রভৃতি বড় জোর তাদের লক্ষ্যস্থল। লালঝাণ্ডা ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার চালানো হয় এই সব আবাসিক আশ্রমে। সেইজন্য এলাকার অধিকাংশেরই ঐ সব আশ্রমের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই। অন্য কোথাও পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা নেই বলেই বাধ্য হয়ে ছেলেমেয়েদের তারা ওখানে পাঠায়। বিগত কুড়ি বছর ধরে এই সব নানা কারণে এবং আদিবাসীদের ধারাবাহিক আর্থিক কৃচ্ছতার ফলে, তাদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে—গত কুড়ি বছর ধরে সত্যিই কি ফললাভ হয়েছে? মজুরি বৃদ্ধির মতো কয়েকটা ক্ষেত্রেই কি তাহলে প্রগতি সীমাবদ্ধ থেকে গেছে—যার ফলে শুধু তাদের পোশাক-পরিচ্ছদেই কিছুটা পরিবর্তন এসেছে? পুরুষের ক্ষেত্রে লাঙ্গোটির বদলে হাফ-প্যান্ট, পাজামা বা ফুল প্যান্ট, আর মেয়েদের বেলায় ছোট্ট আধখানা শাড়ির বদলে পুরো মাপের শাড়ি এসেছে—প্রগতি বলতে কি শুধু এই বোঝায়? যুবকরা

লম্বা লম্বা চুল কেটে ফেলেছে অথবা মেয়েদের চুলে তেল আর চিরুনি পড়েছে —সেই কি প্রগতি ? অথবা আদিবাসীদের ঘরে এখন কয়েকটা পিতল বা বা তামার কলসী, কয়েকটা কাপ-প্লেটের আবির্ভাব ঘটেছে—এরই নাম প্রগতি ? এই কি সব ? এই কি অগ্রগতি ? না, কখনোই তা নয়।

প্রধান পরিবর্তন বা অগ্রগতি হলো আদিবাসীদের মধ্যে, মানুষ হিসাবে তাদের স্বাভিমান, আত্মমর্যাদাবোধ এবং আত্ম-সচেতনতাবোধের জাগরণ। এটাই মৌল পরিবর্তন। তার আচার-আচরণ, তার চলা-ফেরার মধ্যে প্রতিফলিত হয় তার আত্মবিশ্বাস—যা সে লাভ করেছে সংগঠনের একজন সভ্য হিসাবে তার শক্তি সম্বন্ধে জাগ্রত বোধের ফলে। ভয় সে জয় করেছে, হারিয়েছে তার হীনমন্যতাবোধ। তার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগেছে। দুনিয়ার রাজনীতি জানার দুর্বার আগ্রহে সে অধীর হয়ে উঠেছে। মানুষের মতো বাঁচার অধিকার যে তারও রয়েছে একথা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সেও যে কিছু করতে পারে, তারও যে কিছু করার ক্ষমতা আছে—এ বিষয়ে সে আজ সজাগ। শোষণ-বঞ্চনার যন্ত্রণা সে আজ অনুভব করতে শিখেছে। নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন, আরও উন্নততর জীবন যাপনের কামনা-বাসনা জেগেছে তার মনে। আর তা পূর্ণ করে তোলার জন্য যে-কোনো মূল্যে সব রকমের প্রচেষ্টা চালাতে সে উন্মুখ, সে এখন ভিন্ন সুরে কথা বলে, স্বভাবভীরু আদিবাসী, যে একদিন দুটো শব্দকে পর পর একসংগে উচ্চারণও করতে পারত না, ভয়ে গলায় তা আটকে যেত, সেই আদিবাসীই এখন মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আশাব্যঞ্জক। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যে দৃঢ় পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে—সে কখনও ঐখানেই থেমে থাকবে না, থাকতে পারে না। এগিয়ে সে যাবেই। বছরের পর বছর ধরে নিজেকে সে ভালভাবে প্রস্তুত করে তুলেছে, বিশেষ করে ঐ আন্দোলনের বছরগুলিতে। এই প্রস্তুতি, এই পরিপক্কতা—এই হচ্ছে আমাদের ও তাদের—উভয়েরই সত্যিকারের সাফল্য।